বাংলা জাতীয় মাসিক

পরওয়ানা

www.parwana.net

জুলাই ◆ ২০২১

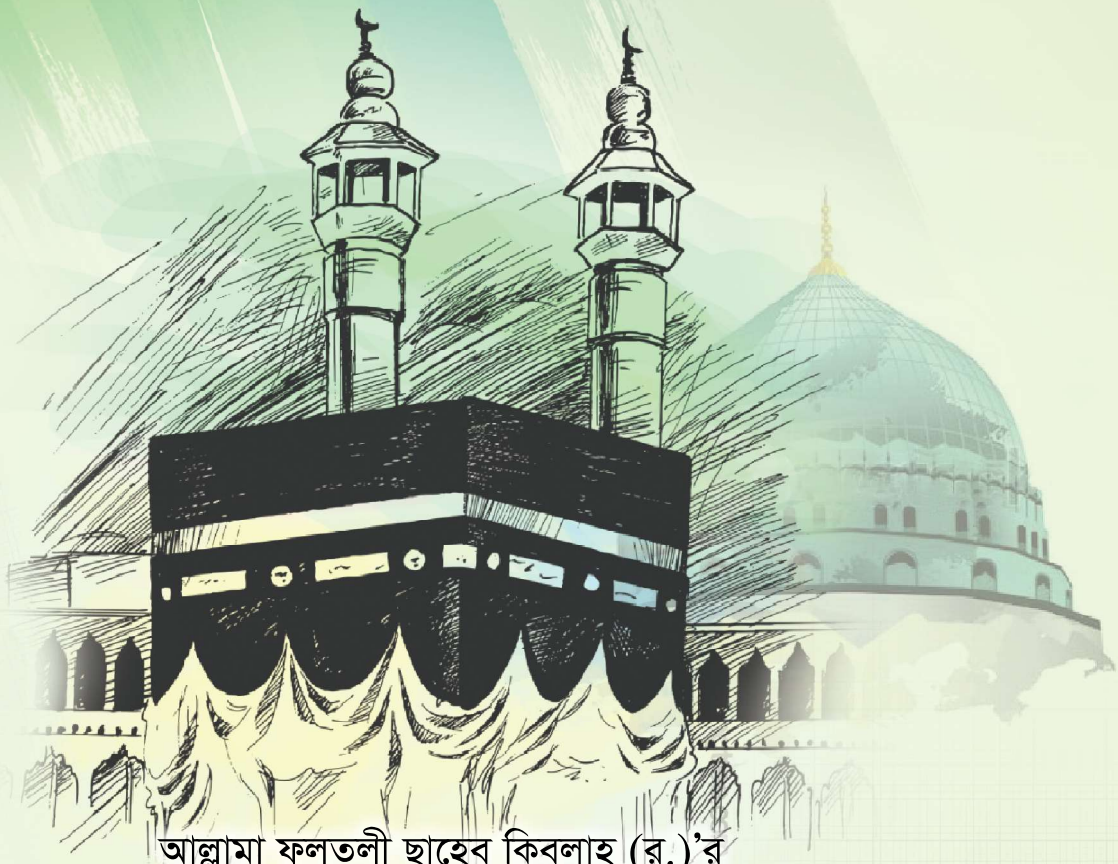

আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)'র

আত্‌তানভীর

[তাফসীরুল কুরআন]

এ সংখ্যায় রয়েছে...

মদীনা শরীফ সফরকারীর নিয়ত
যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকের ফদ্বীলত ও আমাল
কুরবানীর আহকাম ও জরুরি মাসাঈল
কুরবানীর ইতিহাস ও আমাদের শিক্ষা
রাফয়ে ইয়াদাইনের মাসআলা: কিছু বিভ্রান্তি ও এর সঠিক সমাধান
হযরত শাহজালাল (র.) : জীবন ও কর্ম
ইসরাঈলের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক অনৈতিক
যুদ্ধবাজ নাফতালি বেনেট এবং অনিশ্চিত স্বাধীন ফিলিস্তিন
ইসরায়েলের কাছে আরবদের পরাজয় নেপথ্য কারণ
আল্লামা ছালিক আহমদ (র.): ইলমে হাদীসের এক দীপ্তিমান তারকা
ইবনে বতুতার বাংলা সফর ও হযরত শাহজালালের সাক্ষাৎ

নিয়মিত

জীবন জিজ্ঞাসা ◆ একনজরে গত মাস
জানার আছে অনেক কিছু ◆ বিজ্ঞান
ক্যারিয়ার ◆ আবাবীল ফৌজ
কবিতা ◆ চিঠিপত্র

বাংলা জাতীয় মাসিক
পরওয়ানা
২৮তম বর্ষ ■ ৭ম সংখ্যা
জুলাই ২০২১ ♦ আষাঢ়-শ্রাবণ ১৪২৮ ♦ যিলকদ-যিলহজ্জ ১৪৪২

পৃষ্ঠপোষক
মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
আহমদ হাসান চৌধুরী

সম্পাদক
রেদওয়ান আহমদ চৌধুরী

সহকারী সম্পাদক
আখতার হোসাইন জাহেদ

নিয়মিত লেখক
আবু নছর মোহাম্মদ কুতুবুজ্জামান
রহমান মোখলেস
মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান
মারজান আহমদ চৌধুরী

সহ-সম্পাদক
মুহাম্মাদ উসমান গণি
মিফতাহুল ইসলাম তালহা

সার্কুলেশন ম্যানেজার
এস এম মনোয়ার হোসেন

কম্পোজ ও প্রচ্ছদ ডিজাইন
পরওয়ানা গ্রাফিক্স

যোগাযোগ
সম্পাদক, মাসিক পরওয়ানা
ফুলতলী কমপ্লেক্স
খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯
মোবাইল: ০১৭৯৩ ৮৭৭৭৮৮

সিলেট অফিস
পরওয়ানা ভবন
৭৪ শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ
সোবহানীঘাট, সিলেট-৩১০০
মোবাইল: ০১৭৯৯ ৬২৯০৯০

parwanabd@gmail.com
www.parwana.net

মূল্য: ২৫ টাকা

সূচিপত্র

তাফসীরুল কুরআন
আত-তানভীর/আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ্ (র.)
অনুবাদ: মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী ০৩

শারহুল হাদীস
দ্বীনের মধ্যে নতুন আবিষ্কারের মূলনীতি ও বিধান/মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান ০৬

প্রবন্ধ
মদীনা শরীফ সফরকারীর নিয়ত/ আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী ০৭
যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকের ফদ্বীলত ও আমাল/ মাওলানা আহমদ হাসান চৌধুরী ১০
কুরবানীর ইতিহাস ও আমাদের শিক্ষা/ খায়রুল হুদা খান ১২
ইসরাঈলের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক অনৈতিক/ মুহাম্মাদ ইবন নূর ১৪

ফিকহ
রাফয়ে ইয়াদাইনের মাসআলা: কিছু বিভ্রান্তি ও এর সঠিক সমাধান
মাওলানা ছালিক আহমদ (র.) ১৬
কুরবানীর আহকাম ও জরুরি মাসাঈল/ মো: কুতবুল আলম ২০

আউলিয়া
হযরত শাহজালাল (র.) : জীবন ও কর্ম/ সিদ্দীকুর রহমান চৌধুরী ২৪

আন্তর্জাতিক
যুদ্ধবাজ নাফতালি বেনেট এবং অনিশ্চিত স্বাধীন ফিলিস্তিন/ রহমান মোখলেস ২৮
ইসরায়েলের কাছে আরবদের পরাজয় নেপথ্য কারণ/ মারজান আহমদ চৌধুরী ৩৫

মসনবীর গল্প
আগে নফসের ইঁদুর দমন কর/ ড. মাওলানা মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী ৩৯

স্মরণ
আল্লামা ছালিক আহমদ (র.): ইলমে হাদীসের এক দ্বীপ্তিমান তারকা
আখতার হোসাইন জাহেদ ৪১

আলোকপাত
ইসলামের দৃষ্টিতে বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব/ আফতাব চৌধুরী ৪২

সফরনামা
ইবনে বতুতার বাংলা সফর ও হযরত শাহজালালের সাক্ষাৎ/ ইবনে বতুতা ৪৪

নিয়মিত
জীবন জিজ্ঞাসা ৪৬
এক নজরে গত মাস ৫০
জানার আছে অনেক কিছু ৫২
বিজ্ঞান ৫৩
ক্যারিয়ার ৫৪
কবিতা ৫৫
আবাবীল ফৌজ ৫৬
সম্পাদকীয় ০২

সম্পাদক কর্তৃক বি.এন টাওয়ার (৯ম তলা), ২৮/১ বি, দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল ঢাকা-১০০০ হতে প্রকাশিত এবং সানজানা প্রিন্টার্স, ৮১/১, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০ হতে মুদ্রিত।

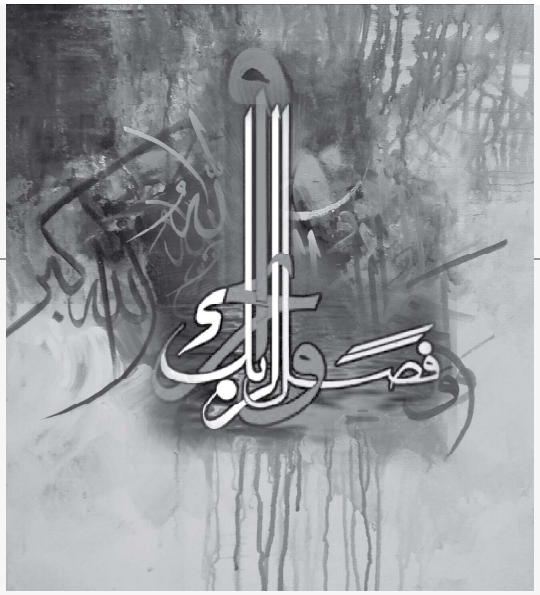

সম্পাদকীয়

نحمده ونصلى على رسوله الكريم– اما بعد

মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের নিমিত্তে বান্দার ত্যাগ স্বীকারের বার্তা নিয়ে পবিত্র ঈদুল আদহা আবারো আমাদের নিকট হাযির হয়েছে। আল্লাহর প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্য ও আত্মত্যাগের যে অতুলনীয় নযীর হযরত ইবরাহীম (আ.) ও ইসমাঈল (আ.) পেশ করেছিলেন, তার স্মৃতি ধরে রাখতে মুসলিম উম্মাহ আজ অবধি প্রতি বছর ইবরাহীম (আ.)-এর সুন্নাত হিসেবে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য পশু কুরবানী দিয়ে থাকে। ঈদুল আদহা আত্মত্যাগের পাশাপাশি আমাদেরকে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রতি সহানুভূতিশীল হতে শিক্ষা দেয়। ঈদুল আদহা ধনী-গরিব নির্বিশেষে সকল মুসলিমকে আল্লাহর আতিথেয়তা গ্রহণেরও সুযোগ করে দেয়। তাই আত্মত্যাগের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের উৎসব হিসেবে প্রতিবছর এ ঈদ উদযাপিত হয়ে থাকে। মুসলিম সমাজে আত্মত্যাগের আদর্শ ও পরস্পরের প্রতি সহানুভূতির বার্তা ছড়িয়ে দিক এ পবিত্র উৎসব।

...

বিশ্বজুড়ে ইসলাম প্রচারে সূফীগণের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। তাঁরা ইসলামের সুমহান বাণি প্রচারের জন্য মাতৃভূমি ছেড়ে বিশ্বের নানা প্রান্তে ভ্রমণ করেছেন। বাংলাদেশসহ পুরো পৃথিবীতে তাঁদের মাধ্যমেই ইসলাম প্রচারিত হয়েছে। বাংলাদেশে যেসকল সূফীগণ ইসলাম প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে হযরত শাহজালাল (রহ.) অন্যতম। হযরত শাহজালাল (রহ.) ইয়ামানের কুনিয়া শহরে কুরাইশ বংশে ৬৭১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে স্বীয় মুরশিদ ও মামা সৈয়দ আহমদ কবির সোহরাওয়ার্দি (রহ.)'র নির্দেশে ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে মাতৃভূমি ত্যাগ করে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশের সিলেট অঞ্চলে পৌঁছেন। সিলেটসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে হযরত শাহজালাল (রহ.) ও তাঁর সঙ্গী ৩৬০ জন আওলিয়ার মাধ্যমে ইসলাম প্রচারিত হয়। ১৩৪৬ হিজরীতে তিনি সিলেটে ইন্তিকাল করেন। বাংলাদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে হযরত শাহজালাল (রহ.) আজও অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে রয়েছেন।

...

চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চলে ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগকারী এক প্রচার বিমুখ দাঈ ওমর ফারুক ত্রিপুরা (রহ.) সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর গুলিতে শাহাদত বরণ করেছেন। ওমর ফারুক পাহাড়ের স্থানীয় ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের সদস্য ছিলেন, এবং ইসলামের দাওয়াত গ্রহণ করে তিনি নিজেকে ইসলামের একজন নিঃস্বার্থ সেবক হিসেবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর অনেক মানুষ ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। নিরীহ জীবন যাপনকারী ওমর ফারুক ত্রিপুরার প্রতি পাহাড়ে শান্তি-শৃঙ্খলা বিধ্বংসকারী সন্ত্রাসীদের ক্ষোভের মূল কারণ ছিল পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর মধ্যে ইসলাম প্রচারে তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টা। বাংলাদেশের মতো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রে ইসলাম প্রচারের অপরাধে এভাবে হত্যাকাণ্ড কোনভাবেই প্রত্যাশিত নয়। অবিলম্বে ওমর ফারুক ত্রিপুরার খুনিদের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। এ ঘটনার মধ্য দিয়ে পাহাড়ি অঞ্চলে মুসলিম জনগোষ্ঠীর জানমালের নিরাপত্তা নিয়ে সংশয় দেখা দিচ্ছে। সরকারকে অবশ্যই পাহাড়ি মুসলিম জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সর্বোচ্চ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং পাহাড়ি সন্ত্রাসীদের নিয়ন্ত্রণ করে পাহাড়ে সার্বিক শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আমরা ওমর ফারুক ত্রিপুরা (রহ.)-এর আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি এবং তাঁর রক্তের বিনিময়ে পাহাড়ি অঞ্চলে ইসলামের সুমহান আদর্শের প্রতিষ্ঠা হোক, এই কামনা করি।

আত্ তানভীর

আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী
ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.)

অনুবাদ
মুহাম্মদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী

فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ –وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ– أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ –أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ .وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ .اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ .أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ –فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ .مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ .صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ.

অনুবাদ: তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি বৃদ্ধি করেছেন ও তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যাবাদী। তাদেরকে যখন বলা হয় 'পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করোনা', তারা বলে 'আমরাই তো শান্তি স্থাপনকারী'। সাবধান! এরাই অশান্তি সৃষ্টিকারী, কিন্তু তারা বুঝতে পারেনা। যখন তাদেরকে বলা হয়, যারা ঈমান এনেছে তোমরাও তাদের মতো ঈমান আনো, তারা বলে 'নির্বোধগণ যেরকম ঈমান এনেছে আমরাও কি সেরকম ঈমান আনবো?' সাবধান! তারাই নির্বোধ, কিন্তু তারা জানে না। যখন তারা মুমিনদের সংস্পর্শে আসে তখন বলে 'আমরা ঈমান এনেছি'; আর যখন তারা নিভৃতে তাদের শয়তানদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে, 'আমরাতো তোমাদের সাথেই রয়েছি; আমরা শুধু তাদের সাথে ঠাট্টা-তামাশা করে থাকি।' আল্লাহ তাদের সাথে তামাশা করেন এবং তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াবার অবকাশ দেন।

এরাই হেদায়তের বিনিময়ে ভ্রান্তি ক্রয় করেছে। সুতরাং তাদের ব্যাবসা লাভজনক হয়নি, তারা সৎপথেও পরিচালিত নয়। তাদের দৃষ্টান্ত: যেমন এক ব্যাক্তি আগুন জ্বালালো, এটা যখন তার চারদিক আলোকিত করলো আল্লাহ তখন তাদের জ্যোতি অপসারিত করলেন এবং তাদেরকে ঘোর অন্ধকারে ফেলে দিলেন, তারা কিছুই দেখতে পায়না তারা বধির, মূক, অন্ধ, সুতরাং তারা ফিরবে না।

তাফসীর:

فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ

مَّرَضٌ বলা হয় অসুস্থতাকে। যা শরীরের মধ্যেও হয় আবার দ্বীন মানার ক্ষেত্রেও হয়। এজন্যই আল্লাহ তাআলা জানিয়ে দিচ্ছেন যে, তাদের অন্তরে যে বিশ্বাস তন্মধ্যে রুগ্নতা আছে। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মুহাম্মদ ﷺ এর কাছে যা এসেছে, তাতে তাদের সন্দেহ রয়েছে। আয়াতে مَّرَضٌ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ইসলাম সম্পর্কে তাদের সন্দেহ। এ সকল লোক ঈমানের দিক থেকে পুরোপুরি বিশ্বাসীও না আবার শিরকের দিক থেকে পুরোপুরি অস্বীকারকারীও (কাফির) না। এদের অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন, مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ

فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا

তাদের অসুখ বৃদ্ধির বর্ণনা সম্পর্কে অন্য আয়াতে বলা হয়, وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا– فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ– وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ -যখনই কোনো সূরা অবতীর্ণ হয় তখন তাদের কেউ কেউ বলে এটি তোমাদের মধ্যে কার ঈমান বৃদ্ধি করল। মূলত: যারা মুমিন এটি তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে এবং তারা আনন্দিত হয়। আর যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে এটি তাদের কলুষের সাথে আরো কলুষযুক্ত করে। আর তারা মৃত্যুবরণ করে কাফির অবস্থায়। [১]

আসল কথা হচ্ছে- প্রত্যেক পুষ্টিকর জিনিসের মধ্যে ক্ষতি রয়েছে। ধবল রোগীর জন্য দুধ, চোখ উঠা রোগীর জন্য মধু ক্ষতির কারণ। অনুরূপভাবে যখন আল্লাহর ওয়াদা, শাস্তি, হালাল-হারাম এবং ফরয-ওয়াজিব সংক্রান্ত কুরআনের আয়াতগুলো নাযিল হতে লাগলো, বিশেষত যখন অদৃশ্যের সংবাদ সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হলো, তখন মুনাফিকদের সন্দেহ ও অস্থিরতার রোগ বেড়ে গেল।

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

أَلِيمٌ অর্থাৎ কষ্টদায়ক। যেন আল্লাহ তাআলা বলছেন, তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি। শব্দটি أَلَمٌ থেকে উৎপত্তি আর الألم অর্থ হলো الوجع বা কষ্ট। কুরআন কারীমে যত জায়গায় أَلِيمٌ শব্দ এসেছে তার অর্থ হবে موجع।

بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ

يَكْذِبُونَ এর মধ্যে দুটি কিরাত রয়েছে। ১. ইয়া এর উপর فتح (যবর) এবং ذ এর তাশদীদ ছাড়া পাঠ করা হয়। এ কিরাত অধিকাংশ কুফাবাসীদের। ২. يا এর উপর পেশ দিয়ে এবং জাল ذ এর উপর تشديد দিয়ে। এটি অধিকাংশ মদীনাবাসী, হিজায এবং বসরার লোকদের কিরাত। মুনাফিকদের মিথ্যাচারের উপর কুরআন সাক্ষ্য দিচ্ছে- وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ -আল্লাহ তাআলা সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, অবশ্যই মুনাফিকরা মিথ্যুক। [২]

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ

এখানে ফাসাদ শব্দের মর্মকথা হচ্ছে- কুফরী কার্যাবলি, নিষিদ্ধ কাজ করা এবং যা করতে আদেশ দেওয়া হয়েছে তা মনগড়াভাবে করা। যেহেতু ফাসাদ বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির মূল কারণ হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার দ্বীনের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া। তাছাড়া ঈমান আর ইয়াকীন ছাড়া কোনো কাজই আল্লাহ তাআলার কাছে কবূল হয় না; যদিও এই ব্যক্তি আমল করতে থাকে। আর ফাসাদ এমন একটি বিষয়- যা কোনো কিছু থেকে উপকার গ্রহণের উপযুক্ততা নষ্ট করে দেয়।

قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ– أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ.

মুনাফিকরা বলতো আমরা সংশোধনকারী। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, মুনাফিকরা বলে, আমরা দু'দল তথা মুমিন আর আহলে কিতাবের মধ্যে মধ্যস্থতা ও সংশোধনকারী।

আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের এ কথার উত্তরে বলেছেন, এরাই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী। যেহেতু তারা আল্লাহর আদেশসমূহের বিরোধিতা করে, নিষিদ্ধ কাজ করে থাকে, শরীআতের বিষয়ে সীমালঙ্ঘন করে।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ

যখন মুনাফিকদেরকে বলা হলো, তোমরা হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর সাথীদের মতো ঈমান গ্রহণ করো। এখানে الناس শব্দের শুরুতে الف لام ব্যবহার করে আল্লাহ তাআলা ইঙ্গিত করছেন যে, ناس শব্দটি معهود। الف لام ناس শব্দের উপর দিয়ে বুঝানো হয়েছে যে, এখানে উদ্দেশ্য কেবল তারা, যারা আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের উপর ঈমান এনেছেন, (দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে উদ্দেশ্য করা হয়নি) যেমন- الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ আয়াতে الناس শব্দে الف لام ব্যবহার করে গোটা মানুষ জাতিকে উদ্দেশ্য করা হয়নি।

قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ

سُفَهَاءُ শব্দটি سفيه শব্দের বহুবচন। যেভাবে عليم এর বহুবচন علماء এবং حكيم এর বহুবচন حكماء। السفيه বলতে জাহিল বা মুর্খ, যার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দুর্বল, উপলব্ধি করার ক্ষমতা কম। এজন্য আল্লাহ তাআলা মহিলা আর বাচ্চাদেরকে سفهاء 'সুফাহা' নামে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِيَامًا -তোমাদের সম্পদ যা আল্লাহ তোমাদের জন্য উপজীবিকা করেছেন, তা নির্বোধ মালিকগণের হাতে অর্পণ করো না। [৩]

যখন মুনাফিকদেরকে বলা হলো, তোমরা সেভাবে ঈমান আনো যেভাবে ঈমান এনেছেন মুহাম্মদ ﷺ এর সঙ্গী-সাথী, অনুসারী মুমিনরা। এ কথার জবাবে তারা বললো, কী! আমরা এ সকল মূর্খ, নির্বোধদের মতো ঈমান আনব? তারা নির্বোধ বলে মুহাম্মদ ﷺ এর সঙ্গীদেরকে উদ্দেশ্য করত। আল্লাহ বলছেন,

أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ

সাবধান! এ লোকেরাই মূর্খ, বুদ্ধিহীন অথচ তারা তা জানেনা। কারণ নির্বোধ লোকেরা সংশোধন মনে করে বিশৃঙ্খলা তৈরি করে। সংরক্ষণ মনে করে ক্ষতি করে। আনুগত্য মনে করে অবাধ্যতা করে, ঈমান মনে করে কুফরী করে। নিজের ভালো করতে গিয়ে খারাপ করে। যেমন আল্লাহ তাআলা তাদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ এবং আরো বলেন, أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ

মুনাফিকরা যখন মুমিনদের কাছে আসতো, তখন তারা তাদের জান-মাল ও সন্তান-সন্ততি রক্ষা করার মানসে ধোকা দিয়ে বলত, আমরা ঈমান এনেছি। আল্লাহর পক্ষ থেকে যা কিছু এসেছে তা সবই বিশ্বাস করি। পক্ষান্তরে যে সকল ইয়াহুদী ও কাফির নেতৃবৃন্দ তাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে অস্বীকার করার জন্য ও ইসলামের বিরুদ্ধে কাজ করার জন্য আদেশ দিত, তাদের সাথে একাকী মিলিত হলে বলত, আমরা রাসূলের বিরুদ্ধাচরণে তোমাদের সাথে আছি এবং তোমাদের মতোই إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ -আমরা তাদের সাথে শুধু ঠাট্টা করছি।

اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ

আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তাদের সাথে অনুরূপ আচরণ করবেন। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, সে দিন মুনাফিক নর-নারী মুমিনদেরকে বলবে, তোমরা আমাদের জন্য একটু অপেক্ষা করো, যাতে তোমাদের নূর থেকে আমরা কিছু সংগ্রহ করতে পারি। তখন তাদেরকে বলা হবে- তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরে যাও এবং নূরের সন্ধান করো। অতঃপর উভয় দলের মধ্যখানে একটি প্রাচীর খাড়া করে দেওয়া হবে, যার একটি দরজা থাকবে, এর অভ্যন্তরে থাকবে রহমত এবং বাইরে থাকবে আযাব। তখন তারা মুমিনদেরকে ডেকে বলবে- আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? উত্তরে তারা বলবে, হ্যাঁ, ছিলে।

আল্লাহ তাআলা তাদের সাথে এরকম আচরণ এজন্য করবেন, যেহেতু তারা ষড়যন্ত্র করত, ঠাট্টা বিদ্রুপ করত, ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করত। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ ۚ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا

-আর কাফিররা যেন মনে না করে আমি তাদেরকে যে অবকাশ দিচ্ছি তা তাদের জন্য কল্যাণকর বরং আমি তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছি যেন তারা আরো গুনাহ করতে পারে। [৪]

কেউ কেউ বলেন, কাফিরদের পাপাচার ও কুফরের কারণে তাদেরকে দোষারোপ করাই আল্লাহর পক্ষ হতে استهزاء বা ঠাট্টা। ব্যাখ্যাকারগণের একটি দল বর্ণনা করেন, إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ অথবা نَسُو الله অথবা يخادعون الله وهو خادعهم فيسخرون منهم سخر الله منهم فَأَنسَاهُمْ

এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করে আল্লাহ এ কথা বুঝিয়েছেন যে, আল্লাহ তাআলা তাদের এ সব কথা-বার্তার বদলা তথা শাস্তি প্রদান করবেন। এর প্রকৃত তাবীল বা তাৎপর্য হচ্ছে- আরবী ভাষার নিয়ম অনুযায়ী যাকে নিয়ে ঠাট্টা করা হয় এবং যে বিষয়ে ঠাট্টা করা হয় তা প্রকাশ করে দেওয়াকেও استهزاء বলে। যেহেতু আল্লাহ তাআলা তাদের মুখের কথা যে অন্তরের বিপরীত, তা প্রকাশ করে দিয়েছেন, এটাই তাদের استهزاء এর পরিণাম। খারাপ কাজের বদলা হলো আরেকটি খারাপ কাজের পথ উন্মুক্ত হওয়া। যেহেতু যুলুমের বদলা হলো আদল বা ন্যায় বিচার।

وَيَمُدُّهُمْ শব্দের অর্থ امددناهم হযরত ইউনুস জরমী (র.) বলেন, আরবী ভাষার নিয়ম হলো মন্দ অর্থের ক্ষেত্রে مدت বলে, আর সাধারণভাবে সংবাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে امدد বলে। মোটকথা কিছুক্ষণের জন্য তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

অর্থাৎ তারা তাদের কুফরী কাজ বারংবার করছে। طُغْيَانِ শব্দের অর্থ কোনো কাজে সীমালঙ্ঘন করা। আয়াতের অর্থ হবে, এ সকল লোক তাদের কুফরীতে বারংবার লিপ্ত হচ্ছে।

أُولٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ

ওরা এমন লোক, যারা হিদায়াতের পরিবর্তে গোমরাহী গ্রহণ করেছে। شراء শব্দের অর্থ এক জিনিসের পরিবর্তে অন্য জিনিস গ্রহণ করা। তারা গোমরাহী গ্রহণ করেছে আর (বিনিময়ে) হিদায়াত পরিত্যাগ করেছে। তারা হিদায়াতের মুকাবিলায় গোমরাহী পছন্দ করেছে। এখানে اشتروا শব্দের অর্থ استحبوا অর্থাৎ তারা পছন্দ করেছে। সারসংক্ষেপ এই- তারা ঈমান আনে আবার কুফরী করে। شراء এর উদ্দেশ্য হলো গোমরাহীকে তারা গ্রহণ করেছে অথবা হিদায়াতকে পরিত্যাগ করেছে। যেমন আল্লাহ

তাআলার বাণী, وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ -যে ঈমানের বদলে কুফর গ্রহণ করল, সে সঠিক পথ হতে বিচ্যুত হয়ে পড়ল। [৫]

فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ

অর্থাৎ তাদের এ ব্যবসায় লোকসান হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তারা লাভ করতে পারেনি। অর্থাৎ এ সকল মানুষ উপকারকে দূরে রেখে ক্ষতিকে গ্রহণ করেছে। এমন বাক্য বিশুদ্ধ আরবীর ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়ে থাকে। কেননা আরবীরা একজন আরেকজনকে বলে থাকে-خاب سعيك ونام ليلك وخسر بيعك যখন ربح শব্দ ব্যবসার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় তখন فَمَا رَبِحُوْا فِي تِجَارَتِهِمْ (তারা ব্যবসায় লাভ করতে পারেনি) না বলে فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ (তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি) বলাই যথেষ্ট।

وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

তারা হিদায়াতের মুকাবিলায় গোমরাহী, ঈমানের মুকাবিলায় কুফর, বিশ্বাস আর স্বীকৃতির মুকাবিলায় মুনাফিকী গ্রহণ করায় সত্য ও সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে।

مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَّا يُبْصِرُونَ

এ সব মুনাফিকদের উদাহরণ এরকম, যখন ওরা দৃশ্যত ঈমান আনল, তখন যেন আগুন জ্বালিয়ে আশপাশ আলোকিত করল অথবা তারা জীবন পরিচালনার জন্য মুসলমানদের সাথে যুগলবদ্ধ হলো। আবার পরে যখন তাদের মধ্যে কুফর আর মুনাফিকী সৃষ্টি হলো, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের আলো নিয়ে গেলেন এবং তাদেরকে কুফরের অন্ধকারে ছেড়ে দিলেন, যার কারণে তারা হিদায়াত দেখল না এবং সঠিক রাস্তার উপর দৃঢ়ভাবে থাকতে পারল না। অথবা আয়াতের অর্থ হবে- তাদের মৃত্যুর পর তাদের থেকে নূর ছিনিয়ে নেওয়া হবে এবং তাদেরকে শাস্তির অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া হবে। এ উভয় তাফসীরের পক্ষেই বর্ণনা বিদ্যমান। দ্বিতীয় তাফসীরের পক্ষে- يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ -সেদিন (কিয়ামতের দিন) মুনাফিক নারী-পুরুষ ঈমানদারদের উদ্দেশ্যে বলবে, আমাদের জন্য একটু থামো, আমরা তোমাদের আলো থেকে কিছু গ্রহণ করব[৬] এ আয়াত ইঙ্গিত প্রদান করে।

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ

হিদায়াত আর সত্যের কথা শুনার ক্ষেত্রে তারা বধির, তাই তারা এসব শুনে না, যেহেতু আল্লাহ তাদের লাঞ্ছিত করেছেন। তারা বোবা, ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে, ফলে তারা সত্য ও হিদায়াতের কথা বলতে পারে না। بُكْمٌ শব্দের অর্থ- বাকশক্তিহীন, বোবা। তারা সত্য ও সঠিক পথ প্রত্যক্ষ করার ক্ষেত্রে অন্ধ। তারা তা অনুধাবনও করতে পারে না। কারণ আল্লাহ তাআলা তাদের মুনাফিকীর কারণে তাদের অন্তরের উপর সীল মেরে দিয়েছেন, যার কারণে তারা হিদায়াত লাভ করতে পারে না। অর্থাৎ মুনাফিকগণ কল্যাণ থেকে বধির, মূক এবং অন্ধ। فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ সুতরাং হিদায়াত এবং ইসলামের দিকে তারা ফিরে আসবে না।

১। সূরা তাওবা, আয়াত-১২৪-১২৫ ■ ২। সূরা মুনাফিকুন-০১ ■ ৩। সূরা নিসা, আয়াত-০৫ ■ ৪। সূরা আলে ইমরান, আয়াত-১৭৮ ■ ৫। সূরা আনআম, আয়াত-১০৮ ■ ৬। সূরা হাদীদ, আয়াত-১৩

বাংলা জাতীয় মাসিক
পরওয়ানা

■ ধর্ম-দর্শন, মাসআলা-মাসাইল, ফাদ্বাইল ও আমালিয়াত বিষয়ে লিখুন
■ ইতিহাস-ঐতিহ্য, সমাজ-সংস্কৃতি, সমসাময়িক, দেশজ ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে তথ্য সমৃদ্ধ লেখা পাঠান
■ মুসলিম মনীষী, আউলিয়াদের জীবন ও গৌরবময় অতীতের আলোকোজ্জ্বল কাহিনি তুলে আনুন আপনার লেখায়

প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে পরবর্তী সংখ্যার জন্য নিম্নোক্ত ই-মেইলে লেখা পাঠাতে হবে
E-mail: parwanabd@gmail.com

মাদরাসা-ই সিরাজুম মুনির লতিফিয়া সিলেট
مدرسة سراج منير اللطيفية سلهت
MADRASHA-E SIRAJUM MUNIR LATIFIA SYLHET
[ইসলামি ও আধুনিক শিক্ষা সমন্বিত একটি আন্তর্জাতিক মানের দ্বীনি বিদ্যাপীঠ]

ভর্তি চলছে
আবাসিক
অনাবাসিক
ডে-কেয়ার
হিফযুল কুরআন বিভাগ
আলিয়া শাখা
সাবাহি মক্তব ও দারুল ক্বিরাত

পৃষ্ঠপোষক : হযরত আল্লামা হুছামুদ্দীন চৌধুরী ফুলতলী

১ম-৭ম শ্রেণি
কিন্ডারগার্টেন পদ্ধতিতে পাঠদান আমাদের অঙ্গীকার।

বৈশিষ্ট্যাবলি:
- মাদরাসা শিক্ষাবোর্ড ও জাতীয় পাঠ্যক্রমের অনুসরণ এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আক্বিদা-বিশ্বাসের আলোকে সুসজ্জিত পাঠ্যক্রম।
- পড়ালেখার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে অভিভাবক সম্মেলনের মাধ্যমে নিয়মিত মুক্ত পর্যালোচনা ও মতবিনিময় সভার আয়োজন।
- আরবি ভাষায় দক্ষতা ও মুকালামায় পারদর্শী করার লক্ষ্যে নাহু ও ছরফের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ।
- শিক্ষার্থীদের মন-মানসিকতা ও বহুমুখী প্রতিভা বিকাশের জন্য সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার ব্যবস্থা।
- আবাসিক/অনাবাসিক ছাত্রদের দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলী দ্বারা পাঠদান ও তত্ত্বাবধান।
- সুন্নতে নববীর আদর্শ অনুসরণে ছাত্রদের চরিত্র গঠনের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ।
- মেধা বিকাশের লক্ষ্যে মাদরাসা লাইব্রেরিতে জ্ঞানচর্চার বিশেষ সুযোগ।
- আন্তর্জাতিক মানের কুরআনে হাফিযদের তত্ত্বাবধানে হিফযুল কুরআন বিভাগ।
- ইসলামি ও সাধারণ শিক্ষার সমন্বয় এবং সেমিস্টার পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ।
- ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় লেখা, বক্তৃতা ও বিতর্ক শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ।
- হিফ্য শাখার ছাত্রদের জন্য সাপ্তাহিক খতমে শবিনার ব্যবস্থা।
- শহরের কোলাহলমুক্ত নিরিবিলি ও মনোরম পরিবেশ।
- সাবাহি মক্তব ও বিশুদ্ধ কুরআন শিক্ষার ব্যবস্থা।
- স্থায়ী ক্যাম্পাস ও নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা।

ভর্তি শুরু ১৫ ডিসেম্বর
ক্লাস শুরু ২ জানুয়ারি
যোগাযোগ 01819462098

ক্যাম্পাস
মুক্তিরচক, শাহপরান (শাহপরান থানা সংলগ্ন), সিলেট
পরিচালক: মুফতি মাওলানা বেলাল আহমদ, ০১৭৮২৫৩০৬২০, ০১৭৯০৮৮৫৮৪৯
@ E-mail: sirajummunir77@gmail.com Facebook www.facebook.com/madrasha-e sirajum-munir-latifia-sylhet

দ্বীনের মধ্যে নতুন আবিষ্কারের মূলনীতি ও বিধান

মোহাম্মদ নজমুল হুদা খান

হাদীসের মূল ভাষ্য

عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ عَبْدِ اللهِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ". رواه البخاري ومسلم.

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ:"مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ".

অনুবাদ

উম্মুল মু'মিনীন, উম্মু আবদিল্লাহ হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, যে আমাদের এ দ্বীনের মধ্যে এমন নতুন কিছু আবিষ্কার করে যা এর অন্তর্ভুক্ত নয় তা পরিত্যাজ্য। (বুখারী ও মুসলিম)

ইমাম মুসলিম (র.) এর বর্ণনার মধ্যে রয়েছে, যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করে যে বিষয়ে আমাদের দ্বীনের কোনো নির্দেশনা নেই তা পরিত্যাজ্য।

হাদীসের ব্যাখ্যা

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র.) বলেন, নবী করীম ﷺ এর দ্বীনের মধ্যে নতুন আবিষ্কারের অর্থ হলো, তাঁর দ্বীনের মধ্যে এমন জিনিস নিয়ে আসা, যা মূলত দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়, যা কিতাব ও সুন্নাহ'র মধ্যে পাওয়া যায় না। (উমদাতুল কারী)

হাদীসটির সারকথা হলো, একজন মুসলমানের জীবন, তাঁর ইবাদত, মুআমালাত-মুআশারাত সবকিছু কুরআন-সুন্নাহ'র আলোকেই পরিচালিত হবে। দ্বীনের ক্ষেত্রে কোনো নতুন কিছু আবিষ্কার বা উদ্ভাবন হলে তাও হতে হবে কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী। যদি কোনো নতুন আবিষ্কার কুরআন-সুন্নাহ'র মূলনীতির আলোকে না হয়, বরং কুরআন-সুন্নাহ'র বিরোধী ও সাংঘর্ষিক হয় তাহলে তা পরিত্যাজ্য হবে।

ইমাম মুসলিম (র.) এর র্তণবি অপর হাদীস: "যে ব্যক্তি এমন কোনো আমল করে যে বিষয়ে আমাদের দ্বীনের কোনো নির্দেশনা নেই তা পরিত্যাজ্য"। এ হাদীসটি প্রথম হাদীস থেকে ব্যাপক। প্রথম হাদীসটি নতুন আবিষ্কারের সাথে সম্পর্কিত। আর এ হাদীস ব্যাপকভাবে সকল আমলের সাথে সম্পর্কিত। কোনো আমল তা কোনো ব্যক্তির নিজের আবিষ্কার হোক অথবা অন্যের আবিষ্কার হোক, নতুন হোক অথবা সমাজে পূর্ব থেকে চলমান হোক, তা যদি শরীআতের মূলনীতির আলোকে না হয় তাহলে তা পরিত্যাজ্য হবে। অর্থাৎ, প্রত্যেক আমল হতে হবে কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী।

নতুন আবিষ্কার তথা বিদআত বিষয়ে মূলনীতি

এ হাদীসে বিদআত তথা নতুন আবিষ্কারের বিষয়ে মূলনীতি বিধৃত হয়েছে। তা হলো- নতুন আবিষ্কৃত বিষয়টি যদি مَا لَيْسَ مِنْهُ অর্থাৎ দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত না হয়, বরং দ্বীনের সাথে সাংঘর্ষিক ও এর বিপরীত হয়, তবে তা পরিত্যাজ্য হবে। দ্বীন তথা শরীআতের সাথে সাংঘর্ষিক না হলে তা বিদআত বলে গণ্য হবে না। আল্লামা ইবন হাজার আসকালানী (র.) বলেছেন, এখানে মুহদাসাত বা নতুন আবিষ্কার বলতে এমন নতুন আবিষ্কার, যার পক্ষে শরীআতে কোনো দলীল নেই। শরীআতের পরিভাষায় একে বিদআত বলা হয়। আর যার পক্ষে শরীআতের কোনো দলীল আছে এটি বিদআত নয়। (ফাতহুল বারী)

কেউ কেউ এ মূলনীতি বুঝতে না পেরে সকল নতুন আবিষ্কারের ক্ষেত্রে 'বিদআত' বলে ফতওয়া প্রদান করেন। এটি সঠিক নয়। আবার কেউ কেউ কুরআন-সুন্নাহতে বর্ণিত পরস্পরবিরোধী দুটি বিষয়ের একটিকে 'সুন্নাহ' হিসেবে গ্রহণ করেন আর অপরটিকে 'বিদআত' বলে বাতিল বা পরিত্যাজ্য আখ্যা দেন। এটিও সঠিক নয়। দুটি বিষয়ই যদি কুরআন-সুন্নাহ এর মধ্যে বিদ্যমান থাকে তাহলে একটি সুন্নাহ অপরটি বিদআত হয় কীরূপে? আহলে হাদীস নামধারী লা-মাযহাবীরা এ দুটি ক্ষেত্রে মুর্খতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। তারা সকল নতুন বিষয়কেই বিদআত বলেন আবার হাদীসে বর্ণিত দুটি বিষয়ের একটিকে সুন্নাহ ও অপরটিকে বিদআত বা বাতিল বলে থাকেন। যে বিষয় কোনো না কোনো হাদীসের মধ্যে আছে তা হয়তো অন্য কোনো দলীলের ভিত্তিতে আমলযোগ্য না হতে পারে, উত্তম না হতে পারে কিন্তু তা বিদআত হতে পারে না।

সকল নতুন আবিষ্কারই বিদআত নয়

শরীআতে বিদআত সাধারণত নিন্দনীয় বিষয়। কিন্তু সকল নতুন আবিষ্কারই বিদআত নয়। আবার সকল বিদআত বা নতুন আবিষ্কারই নিন্দনীয় নয়। পূর্বে উল্লেখিত মূলনীতি অনুযায়ী যে নতুন আবিষ্কার শরঈ দলীলের সাথে সাংঘর্ষিক নয় তা বিদআতই নয়। অনেক উলামায়ে কিরাম আবার বিদআতের প্রকার করেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম শাফিঈ, আবূ শামাহ আল মাকদিসী, ইমাম নববী, শায়খ ইযযুদ্দীন ইবন আবদিস সালাম, আল্লামা আইনী, ইবনুল আসীর, হাফিয ইবন হাজার আল আসকালানী, ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (র.) প্রমুখ। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন, বিদআত দুই প্রকার: ১. বিদআতে হাসানাহ ২. বিদআতে সায়্যিআহ। আবার কেউ কেউ বলেছেন, পাঁচ প্রকার। যথা: ওয়াজিব, মানদুব, মুবাহ, মাকরূহ ও হারাম।

আল্লামা ইবন হাজার আসকালানী (র.) এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, ইমাম শাফিঈ (র.) বলেছেন, বিদআত দুই প্রকার: ১. বিদআতে মাহমুদা-প্রশংসনীয় বিদআত ২. বিদআতে মাযমুমাহ-নিন্দনীয় বিদআত। যা সুন্নাহ'র সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা মাহমুদাহ-প্রশংসনীয়। আর যা সুন্নাহ'র সাথে সাংঘর্ষিক তা মাযমুমাহ-নিন্দনীয়। (ফাতহুল বারী)

ইমাম শাফিঈ (র.) থেকে অপর বর্ণনায় আছে, মুহদাসাত তথা নতুন আবিষ্কারসমূহ হলো দুপ্রকার। ১. যে নতুন আবিষ্কার কুরআন, সুন্নাহ, আসার ও ইজমা'র খেলাফ তা হলো বিদআতে দালালাহ (গুমরাহীমূলক নিন্দনীয় বিদআত)। ২. আর যে নতুন আবিষ্কার উপরোক্ত (কুরআন, সুন্নাহ, আসার ও ইজমা) কোনোটির খেলাফ নয় তা মুহদাসাহ গায়র মাযমূমাহ (অনিন্দনীয় বিদআত)। (প্রাগুক্ত)

'সকল বিদআতই গুমরাহী' এ হাদীসের ব্যাখ্যা

সহীহ মুসলিমে জাবির ইবন আবদিল্লাহ (রা.) বর্ণিত হাদীসে আছে, كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ- সকল বিদআতই গুমরাহী। মুহাদ্দিসীনে কিরাম এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, كل بدعة سيئة ضلالة -প্রত্যেক মন্দ বিদআত হলো গুমরাহী। কারণ, নতুন প্রচলিত রীতি-নীতি যে হাসানাহ (উত্তম) ও সায়্যিআহ (মন্দ) উভয়টি হতে পারে এর দলীল অপর হাদীসে রয়েছে। যেমন, সহীহ মুসলিম এর মধ্যে হযরত জারীর ইবন

(পৃষ্ঠা ৩০-এর কলাম গ দেখুন)

মদীনা শরীফ সফরকারীর নিয়ত

আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী

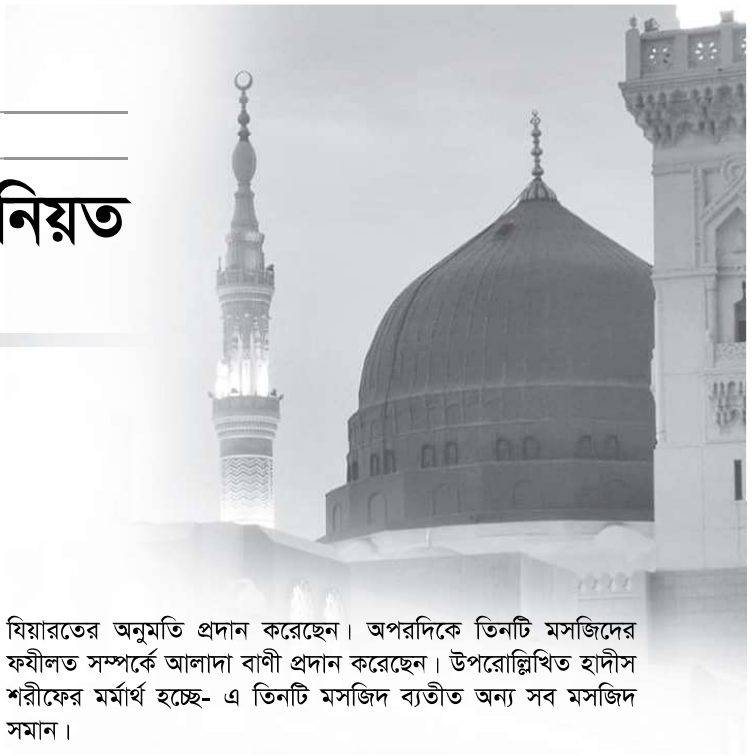

يَا خَيْرَ مَنْ يَّمَّمَ الْعَافُوْنَ سَاحَتَهُ
سَعْيًا وَفَوْقَ مُتُوْنِ الْأَيْنُقِ الرُّسُمِ

যাদের আঙ্গিনায় করুণা প্রাপ্তির আশায় মানুষ ছুটে আসে দৌড়ে ও সওয়ারীর উপর আরোহণ করে তাঁদের মধ্যে আপনি সর্বোত্তম হে আল্লাহর রাসূল ﷺ

হযরত মুহাম্মদ ﷺ বাণী প্রদান করেছেন-

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّـيَّاتِ وَاِنَّمَا لِاِمْرِئٍ مَّا نَوٰي

-নিশ্চয় কর্মসমূহ (সুফল ও কুফল) নিয়তের উপর নির্ভরশীল। ব্যক্তি তার নিয়তের উপর ফল লাভ করে (সুফল বা কুফল)। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ০১)

যে মুমিন ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা মদীনা শরীফ পর্যন্ত পৌঁছার তাওফীক দান করলেন, তিনি কতইনা সৌভাগ্যবান! এ সৌভাগ্যবান ব্যক্তির কি ধরনের নিয়ত করা উচিত সে সম্পর্কে ইমাম ইবনে হুমাম ফতহুল কাদির গ্রন্থে লিখেছেন-

عند العبد الضعيف تجريد النية لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم اذا حصل له اذا قدم زيارة المسجد او يستفتح فضل الله سبحانه فى مرة اخرى ينويهما فيها لأن في ذلك زيادة تعظيمه صلى الله عليه وسلم و إجلاله و يوافق ظاهر ما ذكرناه من قوله عليه الصلوة والسلام لا تعلمه حاجة إلا زيارتى.

-আমি অধমের মতে একমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পবিত্র রওদ্বা শরীফ যিয়ারতের নিয়তই খালিসভাবে করা উচিত। অতঃপর যদি এ ব্যক্তির ভাগ্য প্রসন্ন হয় এবং আল্লাহ তাআলা পুনরায় তাকে আসার তাওফীক দান করেন তবে সেসময় রওদ্বা মুবারকের সাথে মসজিদেরও নিয়ত করবে। কেননা এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রতি অধিক সম্মান প্রদর্শন এই হাদীস শরীফের বাহ্যিক অর্থের لا تعلمه حاجة إلا زيارتي করা হয় এবং উপর আমল করা হয়। (ফতহুল কাদির, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৯৪)

কারো কারো মতে, রওদ্বা মুবারক যিয়ারতের সাথে পবিত্র মসজিদে নববীর নিয়ত করে ফেললে নিম্নোক্ত হাদীস শরীফের উপরও আমল করা হয়। যেহেতু নিম্নোক্ত হাদীস শরীফে মসজিদে নববীর মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে এবং সফর করার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। তাই রওদ্বা মুবারক যিয়ারতের সাথে সাথে মসজিদের নিয়তও করা উচিত। হাদীসখানা হলো-

عن ابي هريرة رضي هنله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا الى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدى هٰذا

-আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বাণী প্রদান করেছেন, তিনটি মসজিদ ব্যতীত যেন সফর করা না হয়: মসজিদুল হারাম, মসজিদুল আকসা ও আমার মসজিদ। (বুখারী, হাদীস নং ১১৮৯)

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালী (র.) যিয়ারত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ [যিয়ারত করো] প্রসঙ্গে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ فَزُوْرُوْهَاএর বাণী যিয়ারতের অনুমতি প্রদান করেছেন। অপরদিকে তিনটি মসজিদের ফযীলত সম্পর্কে আলাদা বাণী প্রদান করেছেন। উপরোল্লিখিত হাদীস শরীফের মর্মার্থ হচ্ছে- এ তিনটি মসজিদ ব্যতীত অন্য সব মসজিদ সমান।

মুহাদ্দিসীনে কিরাম বলেছেন, উপরোক্ত হাদীস শরীফ দ্বারা তিন মসজিদের প্রতি সফর করা ছাড়া অন্যান্য সব রকমের সফর অবৈধ বলে প্রমাণ করা মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়। অন্যান্য বহু প্রয়োজনেও যে সফর করা জায়িয এ সম্পর্কে কোনো দ্বিমত নেই। এমনকি অন্যান্য সফরগুলোর মধ্যে কোনো কোনোটি ফরয বা ওয়াজিব। যেমন হজ্জের জন্য সফর, জিহাদের জন্য সফর, ইলম তলব করার উদ্দেশ্যে সফর, ব্যবসা উপলক্ষ্যে সফর ইত্যাদি।

মোটকথা মসজিদের সফর সম্পর্কিত হাদীস শরীফ দ্বারা অন্য কোনো সফর নিষেধ বলে প্রতীয়মান হয় না। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর রওদ্বা মুবারক যিয়ারতের ফযীলত সম্পর্কিত হাদীসসমূহ পর্যালোচনা করলে একথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, রওদ্বা মুবারকের উদ্দেশ্যে সফর করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাসম্পন্ন অন্যতম একটি সফর।

হাদীস বিষয়ে সর্বজনস্বীকৃত বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন, নিম্নলিখিত পবিত্র হাদীস দ্বারা তিনটি অন্যতম বরকতময় মসজিদের প্রতি সফর করার কথা বলা হয়েছে। উক্ত হাদীস শরীফে যিয়ারতের আদেশ বা নিষেধ সম্পর্কে কোনো ইশারাও নেই। যিয়ারতের ফযীলত অন্যান্য হাদীস দ্বারা আলাদাভাবে সাব্যস্ত করা হয়েছে। আমাদের আলোচিত পবিত্র হাদীস হলো-

لا تشد الرحال إلا الى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدى هٰذا.

-তিন মসজিদ ছাড়া সফর যেন না করা হয়: মসজিদুল হারাম, মসজিদুল আকসা ও আমার মসজিদ।

প্রকাশ থাকে যে, ইমাম বুখারী (র.) নামাযের ফযীলত অধ্যায়ে এ হাদীস শরীফ উদ্ধৃত করেছেন। উক্ত অধ্যায়ের অন্য এক হাদীস হলো-

صَلٰوةٌ فِيْ مَسْجِدِيْ هٰذَا خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ صَلٰوةٍ فِي مَا سَوَاهُ اِلاَّ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.

-আমার এ মসজিদের এক রাকাআত নামায অন্য মসজিদের হাজার রাকাআত নামায থেকেও উত্তম, তবে মসজিদে হারাম ব্যতীত। (বুখারী, হাদীস নং ১১৯০)

মিশকাত শরীফের যে অধ্যায়ে এ হাদীস শরীফ উদ্ধৃত করা হয়েছে সেখানে অধ্যায়ের নাম রাখা হয়েছে-

بَابُ الْمَسَاجِدِ وَ مَوَاضِعِ الصَّلٰوةِ

মুসনাদে ইমাম আহমদে উদ্ধৃত নিম্নবর্ণিত হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মসজিদত্রয় সম্পর্কে বর্ণিত হাদীসসমূহের মুখ্য উদ্দেশ্য হলো বিশেষত উক্ত তিন মসজিদে নামায আদায় করার ফযীলত বর্ণনা করা। মুসনাদে আহমদে এসেছে-

شَهْرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَذُكِرَتْ عِنْدَهُ صَلَاةٌ فِي الطُّورِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْبَغِي لِلْمَطِيِّ أَنْ تُشَدَّ رِحَالُهُ إِلَى مَسْجِدٍ يُبْتَغَى فِيهِ الصَّلَاةُ غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي هٰذَا (مسند الامام احمد)

-হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-এর নিকট 'তুরে' নামায পড়া সম্পর্কে আলোচনা করা হলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নামায আদায় করার জন্য উষ্ট্রপৃষ্ঠে (সফরের উদ্দেশ্যে) হাওদা স্থাপন করা উচিত নয় মসজিদুল হারাম, মসজিদুল আকসা ও আমার মসজিদ ব্যতীত। (মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ১১৫৫২)

পূর্বে উল্লেখিত হাদীসের মুখ্য উদ্দেশ্য কী তা মুসনাদে ইমাম আহমদে উদ্ধৃত এ হাদীস দ্বারা পরিষ্কার হয়ে গেল। সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উদ্দেশ্য হলো তিন মসজিদে নামায আদায় করার ফযীলত বর্ণনা করা।

সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে-

عن سعيد بن المسيب عن ابى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوٰة فى مسجدى هٰذا خير من الف صلوة فى غيره من المساجد الا المسجد الحرام (مسلم– ٤٩٣١)

আল্লামা কাসতাল্লানী তৎপ্রণীত 'আল মাওয়াহিবুল্লাদুন্নিয়া' গ্রন্থে একটি ঘটনা উল্লেখ করেছেন, শায়খ ওলীউদ্দিন ইরাকী (র.) বলেন, আমার পিতা [যইনুদ্দীন ইরাকী (র.)] শায়খ আব্দুর রহমান বিন রজব দিমাশকী হাম্বলী (র.) এক সঙ্গে হযরত ইবরাহীম (আ.) এর শহরের উদ্দেশ্যে সফর আরম্ভ করেন। শহরের নিকট পৌঁছলে ইবনে রজব বলেন, আমি ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ.) এর মসজিদে নামায আদায় করার নিয়ত করে ফেলেছি যেন কবর যিয়ারতের নিয়ত না হয়। ইবনে রজবের কথা শুনে যইনুদ্দীন ইরাকী বলেন, আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নির্দেশের খেলাফ করেছেন। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নির্দেশ হলো, তিন মসজিদের উদ্দেশ্য ব্যতীত যেন সফর করা না হয়। অথচ আপনি ঐ তিন মসজিদ ছাড়া চতুর্থ আর একটি মসজিদের নিয়ত করে ফেলেছেন। পক্ষান্তরে আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নির্দেশ পালন করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নির্দেশ হলো لِهَوْرُوْزُ অর্থাৎ কবর যিয়ারত কর। আর কোনো হাদীস শরীফে বলা হয়নি যে, আম্বিয়ায়ে কিরামের কবর যিয়ারত করা নিষেধ। আমি নির্দেশ মোতাবিক কাজ করছি। উত্তর শুনে শায়খ আব্দুর রহমান বিন রজব দিমাশকী (র.) স্তব্ধ হয়ে গেলেন। (মাওয়াহিব, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩০১)

শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র.) লিখেছেন, যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও বরকতময় কর্ম। এ সফরের আদবসমূহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আদব হচ্ছে নিয়তের সংশোধন। যেহেতু রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যিয়ারত আল্লাহর নৈকট্য লাভের একটি উপায়, সেহেতু আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে, শাফাআতের আশায় হুযূর ﷺ এর পবিত্র দরবারে উপস্থিত হওয়ার চেয়ে উত্তম আর কী হতে পারে?

তিনি আরো বলেন, সরওয়ারে কায়েনাত হযরত রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যিয়ারতের সাথে পবিত্র মসজিদের (মসজিদে নববীর) ইরাদাও করবেন। কেননা তাও মুস্তাহাব। (জযবুল কুলুব)

যিয়ারতকারীগণকে একটি বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখার জন্য বুযুর্গানে দ্বীন বলেছেন যে, সফর যেন দুনিয়ার কোনো উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত, লোক দেখানোর জন্য বা নিছক ভ্রমণের জন্য না হয়; যদি হয় তবে সম্পূর্ণ আমল নষ্ট হয়ে যাবে। তাছাড়া কেউ যদি লোকে কৃপণ বলবে এ অপবাদ থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য অথবা মদীনা শরীফের মহত্ত্ব-গুরুত্ব সম্পর্কে (মন্দ লোকের প্রভাবে) আদৌ বিশ্বাসী না হয়, কেবলমাত্র লোকজন অমুক হাজী মদীনা শরীফ না গিয়ে ব্যয় সংকোচন করেছে এ অপবাদ মোচনের জন্য সফর করে থাকে তবে তার সফর অর্থহীন।

উর্দূতে একটি শ্লোক

کوئی دیوانا بنتا ہے * اور کوئی دیوانا ہوتا ہے

অর্থাৎ কেউ পাগল সাজে, আবার কেউ পাগল হয়।

প্রকৃত আশিক যে ব্যক্তি সে আশিকের বাহ্যিক রূপ ধারণ করে না। বাহ্যিক আড়ম্বর পরিত্যাগ করে হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত আগুনের উষ্ণতা অনুভব করতে থাকে। নীরবে সে হৃদয়ের কান্না শ্রবণ করে। তাই মদীনার সার্থক মুসাফিরগণকে আমরা দেখতে পাই যে, তারা ধৈর্য সহকারে অফুরন্ত ব্যথা হৃদয়ে লয়ে গিরি-মরু অতিক্রম করে মদীনার পথে চলছেন। শত শত ঢেউ বুকে লয়ে সমুদ্র যেমন শান্ত-স্তব্ধ, তিনিও তেমন।

ঘাত প্রতিঘাত ব্যথা বেদনায় আমার জীবন ভরা
ভাঙ্গা গড়ার ইতিহাস যেন আমার জীবন সারা।
বহুদূর থেকে কত ব্যথা লয়ে মরু-গিরি পার হয়ে
অধম কাঙ্গাল এসেছে হেথায় বুক ভরা আশা নিয়ে।

(ইমাদ উদ্দিন ফুলতলী)

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর খিদমতে এক মহিলা উপস্থিত হয়ে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর মাযার শরীফ যিয়ারত করব। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) পর্দা সরিয়ে মেয়েলোকটিকে রওযা মুবারকের দিকে ইঙ্গিত করলেন। মেয়েলোকটি যিয়ারত শেষ করে কাঁদতে আরম্ভ করল এবং কাঁদতে কাঁদতে সেখানেই মৃত্যুবরণ করল। (মাওয়াহিব, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩০৫)

দুঃখজনক ব্যতিক্রম

শায়খ ইবনে তায়মিয়া (মৃত্যু সন ৭২৮ হিজরী) মত প্রকাশ করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা অবৈধ। তিনি দালিলিক প্রমাণ হিসাবে নিম্নবর্ণিত হাদীস পেশ করেন-

لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ، مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَمَسْجِدِي هٰذَا

অর্থাৎ তিনটি মসজিদ ছাড়া সফর যেন না করা হয়: মসজিদুল হারাম, মসজিদুল আকসা ও আমার মসজিদ।

কিন্তু ইসলামের সঠিক বাহক উলামায়ে কিরাম এ আশ্চর্যজনক মতবাদকে অবাঞ্ছিত বলে আখ্যায়িত করেন। ইমাম কাসতাল্লানী এ প্রসঙ্গে বলেন-

وللشيخ تقى الدين ابن تيمية هنا كلام شنيع عجيب يتضمن منع شد الرحال للزيارة النبوية وانه ليس من القرب بل بضد ذالك، وردَّ عليه الشيخ تقي الدين السبكى)رح(فى شفاء السقام فشفى صدور المؤمنين .

-এ প্রসঙ্গে শায়খ তকিউদ্দিন ইবনে তায়মিয়া এখানে আশ্চর্যজনক ঘৃণ্য উক্তি করেছেন। সে উক্তির মধ্যে রয়েছে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যিয়ারতের

উদ্দেশ্যে সফর করা ঠিক নয় এবং এ কর্ম আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের উপকরণ নয়; বরং তার বিপরীত। ইবনে তায়মিয়ার উক্তিকে খণ্ডন করেছেন শায়খ তকিউদ্দিন সুবুকী তৎপ্রণীত "শিফাউস সাকাম" কিতাবে। যা দ্বারা তিনি মুমিনগণের অন্তরকে সুস্থ করেছেন। (মাওয়াহিব, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০০)

একটি সহজ অংক

আমাদের দেশের অনেক হাজী হজ্জ সমাপন করে মদীনা মুনাওয়ারায় যান। মক্কা শরীফ থেকে মদীনা মুনাওয়ারা সফর করার সময় সফরের কষ্ট ছাড়াও বাংলাদেশী কয়েক হাজার টাকা খরচ করেন। এদিকে মক্কা শরীফ অবস্থান করে মসজিদুল হারামে নামায আদায় করলে এক রাকাতের বিনিময়ে এক লক্ষ রাকাতের সওয়াব পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে মদীনা শরীফের মসজিদে নামায আদায় করলে এক রাকাতের বিনিময়ে হাজার রাকাতের সওয়াব পাওয়া যায়।

এখন প্রশ্ন দাঁড়ায় সফর যদি কেবল মসজিদের জন্যই হয় তবে এত কষ্ট সহ্য করার ও অর্থ ব্যয় করার কি প্রয়োজন আছে, যখন বিনা অর্থ ব্যয়ে ও পরিশ্রমে মক্কা শরীফে একশত গুণ বেশি সওয়াব পাওয়া যায়? এখানে মূল বিষয়টি হলো ভিন্ন।

মদীনা মুনাওয়ারা সফরের আসল উদ্দেশ্য

রাহমাতুল্লিল আলামীনের শান্তির নীড় মদীনা মুনাওয়ারার দিকে সফর করার আসল উদ্দেশ্য হলো যিয়ারত। কারণ যিয়ারত এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যার জন্য ইমানদারগণ অর্থ ব্যয় করতে ও অপরিসীম কষ্ট সহ্য করতে মানসিকভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রস্তুত। আশিকের জন্য সে কষ্ট আনন্দদায়ক। ইকবাল বলেছেন-

جفاجو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں
ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزا ہی نہیں (اقبال رح)

পাঠক মনে করতে পারেন যে আমার স্বল্প জ্ঞানের আলোকে একটি খোঁড়া যুক্তি আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। তাই তিরমিযী শরীফের ভাষ্য "মাআরিফুস সুনান" কিতাবে মুহাদ্দিস মাওলানা ইউসুফ বিন্নুরী এ বিষয়ে যে সুন্দর যুক্তি পেশ করেছেন তা নিম্নে উদ্ধৃত করলাম:

ومن ذا الذى يتحمل متاعب الرحلة ومكابدة السفر نحو سبع مأة ميل ايابا وذهابا الى تحصيل اجر الف صلاة فى حين ان يتمكن بدله اجر مأة الف صلاة فى المسجد الحرام من غير اَيَّة مكابدة وعناء, فأيَّة نفس تسمح بهذه التفدية العظيمة والتضحية الجليلة فى نقص اجوره العزيزة من غير متاعب و عناء, كلا ثم كلا! وانما تستحث النجب والركائب الى تلك البقعة المقدسة التى ثوى فيها حبيب رب العالمين ورحمة للعالمين وامام المرسلين و سيد ولد ادم اجمعين الى تلك البقعة التى اشرقت بها الانوار الالهية وحفته التجليات الربانية.

তিরমিযী শরীফের ব্যাখ্যাকার কর্তৃক প্রদত্ত যুক্তির সার সংক্ষেপ হলো এই-

মক্কা শরীফের মসজিদুল হারামে এক লক্ষ রাকাতের সওয়াব ছেড়ে এক হাজার রাকাতের সওয়াব প্রাপ্তির জন্য প্রায় সাতশত মাইল সফরের কষ্ট সহ্য করে মদীনায় কেউ কি যাবে? না, কখনও না; বরং সফরকারীকে উৎসাহিত করে সেই পবিত্র মাটি যেখানে সমাহিত আছেন হাবীবু রাব্বিল আলামীন, ইমামুল মুরসালিন, সায়্যিদে ওলাদে আদম। সেই সে পবিত্র ভূমির দিকে লোক সফর করে যেখানে ভাস্মর হয়েছে নূরে ইলাহী ও তজল্লিয়াতে রব্বানী।

এ সুন্দর যুক্তিটি পেশ করার পর তিনি লিখেছেন জামহারাতুল উম্মা অর্থাৎ মুসলিম উম্মার বেশিরভাগের মতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কবর শরীফ যিয়ারত করা আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের উত্তম উপকরণসমূহের মধ্যে একটি এবং এতদুদ্দেশ্যে সফর করা জায়িয বরং উত্তম। অতঃপর 'ওফাউল ওফা'র' বরাত দিয়ে লিখেছেন হানাফী মাযহাবের মতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কবর শরীফ যিয়ারত উত্তম মুস্তাহাব কর্ম, যা ওয়াজিবের নিকটবর্তী। অনুরূপভাবে মালিকী হাম্বলী মাযহাবেরও মত রয়েছে।

অতঃপর তিনি লিখেছেন:

مالسنا في حاجة الى نقله بعد ثبوت الإجماع القولي والعمل معا

অর্থাৎ, যেহেতু এ বিষয়টির উপর মুসলমানদের বক্তব্য ও আমলের দিক থেকে ইজমা হয়ে গেছে সেহেতু এগুলো উদ্ধৃত করার কোনো প্রয়োজন মনে করি না।

ইমাম সুয়ূতী প্রমাণ করেছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যিয়ারত যে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের উপকরণ তা কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত।

তকিউদ্দীন আলহিসনী বলেন,

كان ابن تيمية ممن يعتقد ويفتى بأن شد الرحال الى قبور الانبياء حرام لا تقصر فيه الصلوة .

-ইবনে তায়মিয়া বিশ্বাস করতেন এবং ফতওয়া দিতেন যে, আম্বিয়ায়ে কিরামের কবরের উদ্দেশ্যে সফর করা হারাম। এ সফরে নামায কসর আদায় করা যায় না।

তিরমিযী শরীফের ব্যাখ্যাকার ইবনে তায়মিয়ার মতবাদের সার সংক্ষেপ নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন-

ويقول ابن تيمية أن السفر اليه غير جائز –نعم يسافر إلى مساجده صلى الله عليه وسلم ثم بلغ المدينة و صلى فى المسجد فيستحب له أن يزور قبره صلى الله عليه وسلم لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور قبر بقيع الغرقد وغيره.

-ইবনে তায়মিয়া বলেন, (যিয়ারতের উদ্দেশ্যে) সফর করা জায়িয নয়। হ্যাঁ, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মসজিদের দিকে সফর করবেন, যখন মদীনায় পৌঁছবেন এবং মসজিদে নামায সম্পন্ন করবেন, তখন কবর শরীফ যিয়ারত করা মুস্তাহাব। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতুল বাকী ও অন্যান্য কবরস্থান যিয়ারত করতেন।

তিরমিযী শরীফের ব্যাখ্যাকার বলেন, আলোচনা ও পর্যালোচনার পর একথাই প্রমাণিত হয় যে ইবনে তায়মিয়া ও তার অনুসারীগণ এ অভিমতটি নিয়ে আলাদা হয়ে গেছেন (অর্থাৎ একঘরে হয়ে গেছেন)। যদিও সমস্ত ইমামগণের ও জমহুর উম্মতের অভিমতের বিপক্ষে ইবনে তায়মিয়ার অভিমতগুলোর কোনো কোনোটির সাথে একমত পোষণকারী আছেন। যদি আমরা ধরে নেই যে, কিছু সংখ্যক লোক ইবনে তায়মিয়ার দিকে চলে গেছেন, তবে যেতে দিন। পূর্বে যে নগণ্য সংখ্যক লোক এরূপ মতবাদ পোষণ করেছিলেন তাদের সে মতবাদ নিছক উক্তি হিসাবে পুস্তকের পাতার ভাজে লুক্কায়িত ছিল এবং তার প্রভাব নিস্তেজ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ইবনে তায়মিয়া এমন ব্যক্তি যিনি সেগুলো কবর খোঁড়ে বের করে নিয়ে আসলেন এবং নতুনভাবে তা প্রবর্তন করলেন। এমনি করে ইবনে তায়মিয়া মুসলিম উম্মার মধ্যে নতুন ফ্যাসাদের একটি দরজা উম্মুক্ত করে দিলেন।

আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (র.) ইবনে তায়মিয়ার মতবাদ খণ্ডনকারী উলামায়ে কিরামের আলোচনা করার পরে লিখেছেন-

ولم يقدر ابن تيمية و اتباعه ان يجيبوا عنه بجواب شاف.

ইবনে তায়মিয়া ও তদীয় অনুসারীগণ তার মতবাদ খণ্ডনকারীগণের সন্তোষজনক কোনো জবাব দিতে সক্ষম হননি। (মাআরিফুস সুনান, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩২৯-৩৩৩)

যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকের ফদ্বীলত ও আমাল

মাওলানা আহমদ হাসান চৌধুরী

> *এই দশ দিনের এতো মর্যাদার একটি কারণ হিসেবে উলামায়ে কিরাম বলেন, এই সময়ের মধ্যে সকল প্রকার ইবাদত করা যায়। নামায, রোযা, যাকাত, সদকাহসহ সব আমল অন্য সময়ে করা যায় কিন্তু কুরবানী, হজ্জ করা যায় না। আর এই দশ দিনের মধ্যে নামায, রোযা, যাকাতের সাথে সাথে কুরবানী ও হজ্জ সহ অন্যান্য সকল ইবাদত করা যায়। সে জন্যে এর মর্যাদা আলাদা। (ইবন হাজার; ফাতহুল বারী)*

হাদীস শরীফে জিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের ইবাদত, রোযা রাখা, তাসবীহ-তাহলীলের অনেক ফদ্বীলত বর্ণিত হয়েছে। কুরআন কারীমে আল্লাহ তাআলা এ দিনগুলোর শপথ নিয়েছেন, বেশি বেশি যিকর করতে নির্দেশ করেছেন। আমরা এই দশ দিন সম্পর্কে আলোচনা তুলে ধরছি।

কুরআন কারীমে যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশদিনের ফদ্বীলতের ব্যাপারে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন-

وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ

-এবং নির্দিষ্ট দিনগুলোতে যেন তারা আল্লাহর নাম স্মরণ করে। (সূরা হাজ্জ, আয়াত-২৮)

তাফসীরে ইবন কাসীর-এ হযরত ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে এখানে **أَيَّام مَعْلُومَاتٍ** 'নির্দিষ্ট দিনসমূহ' দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যিলহজ্জের 'দশ রাত'।

অনুরূপ সূরা ফাজরে আল্লাহ তাআলা এই দশ রাত্রির কসম করেছেন। আল্লাহ তাআলা যেসব বিষয়ের কসম করেছেন সেসকল বিষয় ইহকালীন অথবা পরকালীন জীবনে কোন না কোন গুরুত্ব বহন করে। আল্লাহ তাআলা সূর্যের শপথ করেছেন, চন্দ্রের শপথ করেছেন, তারকারাজির শপথ করেছেন, মক্কা মুকাররামার শপথ করেছেন, কুরআন মাজীদের শপথ করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনের শপথ নিয়েছেন, তেমনিভাবে এই দশ রাত্রিরও শপথ করেছেন- **وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ** -ফজরের শপথ, আর দশ রাত্রির শপথ। (সূরা ফাজর, আয়াত- ১,২)

এ আয়াতের ব্যাপারেও ইমাম তাবারী (র.) বলেন, 'দশ রাতের শপথ' এর দ্বারাও যিলহজ্জ এর প্রথম দশ রাত উদ্দেশ্য। এ ব্যাপারে কুরআন বিশেষজ্ঞগণ ইজমা পোষণ করেছেন।

আর ইবন কাসীর তার তাফসীরে সূরা ফাজরের এ আয়াতের ব্যাপারে বলেন, হযরত ইবন আব্বাস (রা.), ইবন যুবাইর (রা.), মুজাহিদসহ পূর্বাপর প্রায় সবাই এমত পোষণ করেন যে এর দ্বারা যিলহজ্জের ১ম দশ রাত উদ্দেশ্য।

সূরা ফাজরের পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ তাআলা জোড় ও বেজোড়ের শপথ নিয়েছেন। হাদীসের ভাষ্য থেকে বুঝা যায় এ দুটিও যিলহজ্জের প্রথম দশকের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন-

হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সূত্রে বর্ণনা করেন, নিশ্চয় (সূরা ফাজরের আয়াতস্থিত) দশ রাত দ্বারা যিলহজ্জের ১০ রাত আর **والشفع والوتر** এর **والوتر** (বেজোড়) দ্বারা আরফার দিন (৯ তারিখ) এবং **والشفع** (জোড়) দ্বারা কুরবানীর দিন (১০ তারিখ) উদ্দেশ্য। (তাফসীরে কুরতুবী, সূরা ফাজর)

যিলহজ্জের প্রথম ১০ দিনের ফদ্বীলতের ব্যাপারে বহু হাদীসেও উল্লেখ পাওয়া যায়। এইদিনের আমল আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয়। হযরত ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, **ما من أيامٍ العمل الصالح فيها أحبُّ إلى الله من هذه الأيامِ (يعني أيامَ العشر). قالوا: يا رسول الله، ولا الجهادُ في سبيل الله؟ قال: ولا الجهادُ في سبيل الله إلا رجلٌ خرج بنفسه وماله فلم يرجعْ من ذلك بشيء.**

-এমন কোনো দিবস নেই যার আমল যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশ দিনের আমল থেকে আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। প্রশ্ন করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর পথে জিহাদ করা থেকেও কি অধিক প্রিয়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ জিহাদ করা থেকেও অধিক প্রিয়, তবে এমন ব্যক্তির কথা ভিন্ন যে তার জান-মাল নিয়ে আল্লাহর পথে বের হলো এবং এর কোনো কিছুই ফেরত নিয়ে এলো না। (সুনান আবি দাউদ, কিতাবুস সাওম, বাবু মিন সাওমিল আশার)

সর্বোত্তম দিন

হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত আরেকটি হাদীসে এসেছে- যিলহজ্জের ১০ দিন সর্বোত্তম দিন। হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নিশ্চয়ই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন "দুনিয়ার দিনসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে 'দশ দিন' অর্থাৎ যিলহজ্জ মাসের দশদিন। বলা হলো আল্লাহর পথে (জিহাদে) কাটানো দিনগুলোও এর মতো নয়? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর পথের দিনগুলোও এর সমান নয়, তবে এই ব্যক্তি ভিন্ন যে নিজের মুখমণ্ডল ধূলো ধূসরিত করল (অর্থাৎ শহীদ হলো)। (হাইসামী, খণ্ড-৪, পৃষ্ঠা নং-১৭)

ইবন হিব্বান সূত্রে বর্ণিত হয়েছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, **ما من أيامٍ أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة** -যিলহজ্জের প্রথম ১০ দিনের মতো উত্তম দিন আল্লাহর কাছে আর কোনটিই নয়। (ইবন হিব্বান, খণ্ড -৯, হাদীস

নং-৩৮৫৩)

জিহাদ হতেও উত্তম

উপরোক্ত হাদীসে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলেন, এগুলো উত্তম না যে দিনগুলো জিহাদে কাটানো হয় সেদিনগুলো উত্তম? রাসূল ﷺ বললেন, এগুলো জিহাদে কাটানো দিনের চেয়েও উত্তম।

এ দিনগুলোর আমল পবিত্রতম ও সাওয়াবে সর্বোত্তম

হযরত ইবন আব্বাস (রা.) নবী কারীম ﷺ এর সূত্রে বর্ণনা করেন,

ما من عملٍ أزكى عند الله ولا أعظم أجراً من خيرٍ يعمله في عشر الأضحى... (رواه الدارمي)

-আল্লাহর কাছে উত্তম কাজসমূহের মধ্যে পবিত্রতম ও প্রতিদানের বিবেচনায় সবচেয়ে বড় আমল হচ্ছে যা আদহার দশদিনে সম্পাদন করা হয়। ... (দারেমী, খণ্ড-২, হাদীস নং-১৭৭৪)

ফদ্বীলতের কারণ

যিলহজ্জের প্রথম দশকের এতো ফদ্বীলত হওয়ার পেছনে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো রয়েছে-

১. তারবীয়ার দিন (يوم التروية) এটি হচ্ছে যিলহজ্জের ৮ম দিন। যেদিনে হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। মুহরিম অবস্থায় হাজীগণ মিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে না।

২. এই দশকে রয়েছে আরফার দিন। যা অত্যন্ত ফদ্বীলতের এবং মর্যাদার। হাদীসে এসেছে-

* আরফাই হচ্ছে হজ্জ। (الحج العرفة)

* এই দিনে আল্লাহ তাআলা অধিক সংখ্যক মু'মিন মু'মিনাতকে (মু'মিন নারী-পুরুষ) মাফ করে দেন। (নাসাঈ)

* এ দিনে আল্লাহ তাআলা আরফার ময়দানে উপস্থিতদের নিয়ে ফিরিশতাদের মাঝে গৌরব করেন। (মুসলিম শরীফে হযরত আয়িশা (রা.) বর্ণিত হাদীসে দ্রষ্টব্য)

* এই দিনে রোযা রাখলে আগের ও পরের ২ বছরের গুনাহ মাফ হয়ে যায়। (সহীহ মুসলিম)

৩. যিলহজ্জের প্রথম দশ দিনগুলোতেই মুজদালিফায় অবস্থান করা হয়।

৪. এ দিনগুলোর মধ্যেই ইসলামের ৫ম স্তম্ভ হজ্জ সম্পাদিত হয়।

৫. এদিনগুলোর ১০ম দিন থেকে কুরবানীর দিন সূচনা হয়। আর হাদীসের এক বর্ণনা অনুযায়ী এই দিন দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ দিনসমূহের একটি। আবূ দাউদে বর্ণিত হয়েছ-

إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر، ثم يوم القرّ. رواه أبو داوود

-নিশ্চয় আল্লাহ তাআলার কাছে দিনসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলো কুরবানীর দিন, তারপর এর পরবর্তী দিন অর্থাৎ ১১ যিলহজ্জ। (আবু দাউদ)

যিলহজ্জের প্রথম দশকের এতো ফদ্বীলত বর্ণিত হয়েছে যে, আলিমগণ রামাদানের শেষ দশকের এবং এর মধ্যে সমন্বয় করতে গিয়ে বলেন,

عَشْرُ رَمَضَانَ أَفْضَلُ مِنْ حَيْثُ لَيَالِيهِ لِأَنَّ مِنْهَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَهِيَ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، وَعَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ أَفْضَلُ مِنْ حَيْثُ أَيَّامُهُ لِأَنَّ فِيهَا يَوْمَ عَرَفَةَ وَهُوَ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ.

-রামাদানের শেষ দশক 'রাতের' বিবেচনায় সর্বোত্তম কেননা, এর মধ্যে রয়েছে লাইলাতুল কদর। আর এটা রাতসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম। অন্যদিকে যিলহজ্জের প্রথম দশক 'দিনের' বিবেচনায় উত্তম, কেননা এর মধ্যে রয়েছে আরফার দিন যা দিনসমূহের মধ্যে সর্বোত্তম। (মিরকাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৯৬)

এই দশ দিনের এতো মর্যাদার একটি কারণ হিসেবে উলামায়ে কিরাম বলেন, এই সময়ের মধ্যে সকল প্রকার ইবাদত করা যায়। নামায, রোযা, যাকাত, সাদকাহসহ সব আমল অন্য সময়ে করা যায় কিন্তু কুরবানী, হজ্জ করা যায় না। আর এই দশ দিনের মধ্যে নামায, রোযা, যাকাতের সাথে সাথে কুরবানী ও হজ্জ সহ অন্যান্য সকল ইবাদত করা যায়। সে জন্যে এর মর্যাদা আলাদা। (ইবন হাজার; ফাতহুল বারী)

এ রাতসমূহের আমল

এ রাতসমূহে আমরা নিম্নলিখিত আমল করতে পারি-

বেশি বেশি আল্লাহর যিকর করা

এ সময়ে যিকর করার জন্য সরাসরি কুরআন শরীফের নির্দেশনা পাওয়া যায়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, **وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ** -তোমরা নির্দিষ্ট দিনসমূহে আল্লাহর নামের যিকর করো। (সূরা হাজ্জ, আয়াত-২৮)

জমহুর মুফাসসিরীনের মতে এই আয়াত দ্বারা যিলহজ্জের প্রথম দশ দিনকে বুঝানো হয়েছে।

অধিক পরিমাণ তাসবীহ-তাহলীল করা

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন,

ما من أيام أعظم عند الله، ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح، والتحميد، والتهليل، والتكبير.

-এই দশ দিনের মর্যাদার সমতুল্য এবং এই দশ দিনের আমল অপেক্ষা অধিক প্রিয় আমল আল্লাহর কাছে নেই। সুতরাং তোমরা এই দিনসমূহে অধিক পরিমাণে তাসবীহ, তাহমীদ, তাহলীল এবং তাকবীর পাঠ করো। (আহমদ, ৭/২২৪)

রোযা রাখা

যিলহজ্জের প্রথম দিন থেকে নবম দিন পর্যন্ত রোযা রাখা। রাসূল ﷺ এই সময়ে রোযা রাখতেন। উম্মুল মুমিনীন হযরত হাফসা (রা.) বলেন,

أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداة.

-রাসূল ﷺ চারটি জিনিস কখনো ছাড়তেন না। আশুরার রোযা, দশ রাত্রির রোযা, প্রত্যেক মাসে তিনটি রোযা আর সকালের দুই রাকাআত নামায (ফজরের সুন্নত)। (সুনান কুবরা লিন নাসাঈ, হাদীস নং ২৭৩৭)

অন্য হাদীসে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ، يَعْدِلُ صِيَامَ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا بِصِيَامِ سَنَةٍ، وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ.

-হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) নবী কারীম ﷺ হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইরশাদ করেন, আল্লাহর নিকট দিনসমূহের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় হচ্ছে যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকের ইবাদত। এর প্রত্যেক দিনের রোযা এক বছরের রোযার সমান। আর এর প্রত্যেক রাতের ইবাদত শব-ই কদরের ইবাদতের সমান। (সুনান তিরমিযী, হাদীস নং ৭৫৮)

রাত জেগে ইবাদত করা

যিলহজ্জের দশ রাত্রিসমূহে রাত জেগে ইবাদতের গুরুত্ব অপরিসীম। হানাফী ও হাম্বলী মাযহাব অনুযায়ী এ দশকের রাতসমূহে জাগ্রত থেকে ইবাদত করা মুস্তাহাব।

প্রখ্যাত তাবিঈ হযরত সাঈদ ইবন জুবাইর (রা.) বলেন, **لاَ تُطْفِئُوا سُرُجَكُم لَيَالِيَ العَشْرِ** -তোমরা দশ রাত্রিতে তোমাদের ঘরের বাতিসমূহ নিভিয়ে ফেলো না। অর্থাৎ ঘুমিয়ে পড়ো না।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এই দশককে যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

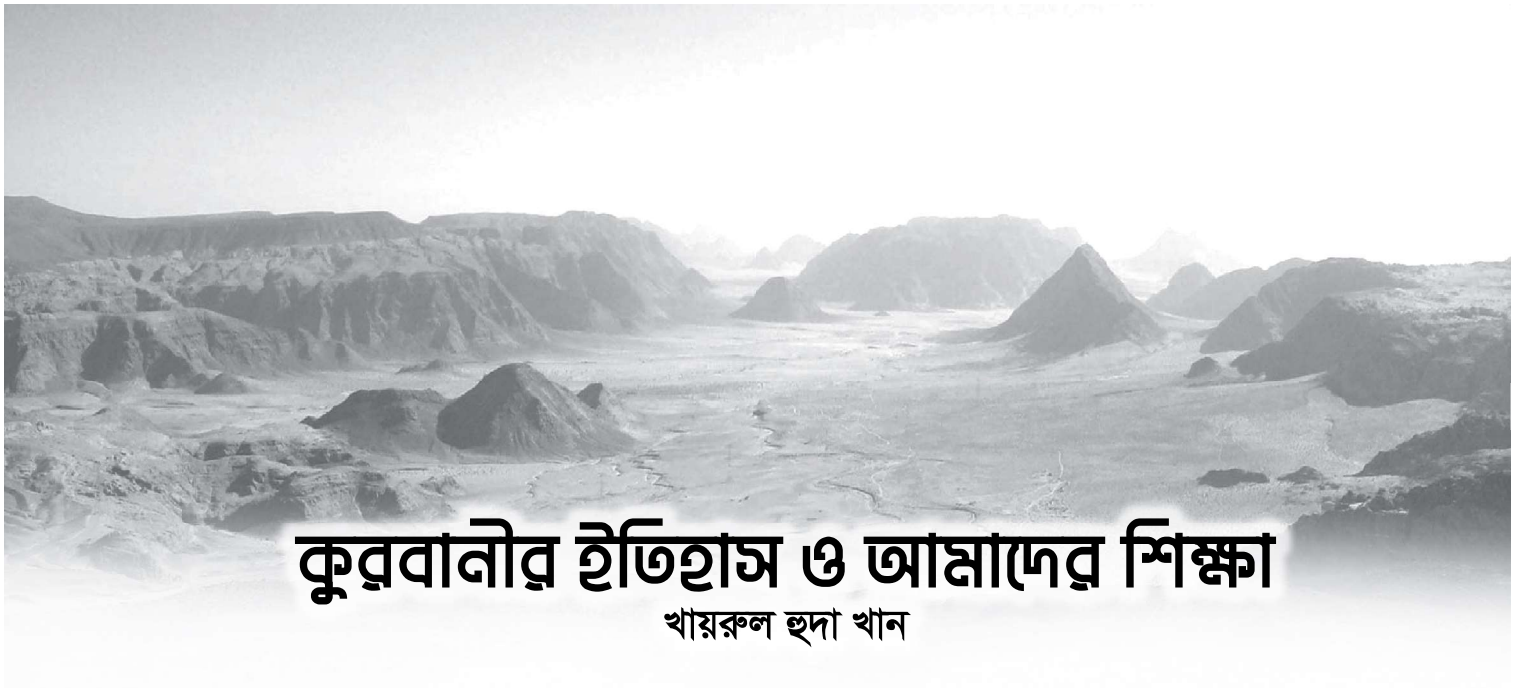

কুরবানীর ইতিহাস ও আমাদের শিক্ষা

খায়রুল হুদা খান

কুরবানীর ইতিহাস অনেক প্রাচীন। পৃথিবীতে মানুষের ইতিহাসের সূচনা থেকেই কুরবানীর ইতিহাসের সূচনা। কুরআনে কারীমেও সেদিকে ইঙ্গিত করে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন, "প্রত্যেক উম্মতের জন্য আমি কুরবানীর বিধান রেখেছিলাম, যাতে তারা নির্ধারিত পশু জবাই করার সময় আল্লাহর নাম স্মরণ করে এ জন্য যে, তিনি চতুষ্পদ জন্তু থেকে তাদের জন্য রিযক নির্ধারণ করেছেন।" (সূরা হাজ্জ, আয়াত-৩৪) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসীরগ্রন্থসমূহে উল্লেখ করা হয়েছে যে হযরত আদম (আ.) থেকে শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ পর্যন্ত প্রত্যেক জাতিকে আল্লাহ তাআলা তার নৈকট্য লাভের জন্য কুরবানীর বিধান দিয়েছেন। 'কুরবানী' অর্থই হচ্ছে নৈকট্য হাসিলের মাধ্যম। কুরআনে কারীমে 'কুরবানী' শব্দটি উল্লেখের মাধ্যমেও বিশেষ এই আমলের গুরুত্ব, মর্যাদা ও তাৎপর্য অনুধাবন করা যায়।

মানবজাতির ইতিহাসে প্রথম মানব হযরত আদম (আ.) এর দুই পুত্র কাবিল ও হাবিলের মাধ্যমেই প্রথম কুরবানী শুরু হয়। পৃথিবীতে অবতরণের পর হযরত আদম (আ.) ও হাওয়া (আ.) এর সন্তান জন্ম হতে লাগলো। ধীরে ধীরে মানুষ বাড়তে লাগলো পৃথিবীতে। হযরত হাওয়া (আ.) এর গর্ভে সন্তান জন্ম নিতো জোড়ায় জোড়ায়। প্রতি জোড়ায় একজন ছেলে আর একজন মেয়ে জন্ম হতো। একই জোড়ার ছেলে ও মেয়েরা পরস্পর বিয়ে করতে পারবে না। বিয়ে করতে হলে ভিন্ন জোড়ার কাউকে করতে হবে। কাবিল ও হাবিল ছিল ভিন্ন জোড়ার। কিন্তু হাবিলের জোড়ার মেয়েটি তেমন সুন্দরী ছিল না। সেই তুলনায় কাবিলের জোড়ার মেয়েটি ছিল বেশি সুন্দরী। নিয়ম অনুসারে হাবিল বিয়ে করবেন কাবিলের জোড়ার মেয়েটিকে আর কাবিল বিয়ে করবেন হাবিলের জোড়ার মেয়েটিকে। কিন্তু কাবিল বেঁকে বসে, সে হাবিলের জোড়ার মেয়েটিকে বিয়ে করবে না। যেভাবেই হোক, নিজের জোড়ার সুন্দরী মেয়েটিকেই বিয়ে করবে।

এমতাবস্থায় পিতা হযরত আদম (আ.) আল্লাহর নির্দেশে একটি মীমাংসা করলেন। তাদের দুজনকে আল্লাহর নামে কুরবানী দিতে হবে। যার কুরবানী আল্লাহর কাছে গৃহীত হবে, তার ইচ্ছাই গ্রহণ করা হবে। এখন কার কুরবানী গৃহীত হলো আর কার কুরবানী গৃহীত হলো না, তাও বুঝা যাবে। যার কুরবানী কবূল হবে আসমান থেকে আগুন এসে ঐ কুরবানীকে পুড়িয়ে দিবে।

পিতা আদম (আ.) এর দেওয়া মীমাংসা অনুসারে তারা উভয়েই কুরবানীর বস্তু উপস্থাপন করলো আল্লাহর কাছে। হাবিল একটি সুস্থ ও মোটাতাজা দুম্বা কুরবানী করলো আর কাবিল তার কিছু সবজি ও শস্য উৎসর্গ করলো। আল্লাহ পাক হাবিলের কুরবানীকেই কবূল করলেন। উপর থেকে আগুন দিয়ে দুম্বাটিকে পুড়িয়ে নিলেন। যেহেতু আল্লাহ পাক হাবিলের কুরবানী কবূল করেছেন, সে হিসেবে বিয়ের নিয়ম আগের মতোই রইলো, হাবিল বিয়ে করবেন কাবিলের জোড়ায় জন্ম নেয়া মেয়েটিকে আর কাবিল হাবিলের জোড়ার মেয়েটিকে। কিন্তু কাবিল এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারলো না। কুরবানী কবূল না হওয়াতে এবং স্ত্রী হিসেবে কাঙ্ক্ষিত মেয়েকে না পাওয়াতে সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। ক্রোধের বশে হাবিলকে সে বললো, আমি তোমাকে হত্যা করবো। কাবিলের এমন আচরণে হাবিল শান্তভাবে একটি সুন্দর জবাব দিলেন যেটা কুরআনে কারীমে মানবজাতির শিক্ষার জন্য আল্লাহ পাক তুলে ধরেছেন। হাবিল জবাব দিয়েছিলেন, "আল্লাহ পাক কেবল মুত্তাকীদের পক্ষ থেকেই কবূল করেন।" এ থেকে কিয়ামত পর্যন্ত একটি শিক্ষা উপস্থাপন করা হয়েছে; আর সেটা হলো, যে কুরবানী একমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তে, তাকওয়ার ভিত্তিতে এবং আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে করা হয়, কেবল সে কুরবানীই আল্লাহ কবূল করেন।

ফাতহুল কাদীরের বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, হাবিলের পেশকৃত দুম্বাটিকে জান্নাতে উঠিয়ে নেওয়া হয় এবং তা জান্নাতে বিচরণ করতে থাকে। পরবর্তীতে ইবরাহীম (আ.) ইসমাঈল (আ.) এর কুরবানীর ঘটনায় ফেরেশতা জিবরাঈল (আ.) আসমান থেকে এই দুম্বা নিয়েই অবতরণ করেন এবং ইসমাঈল (আ.) এর পরিবর্তে এই দুম্বা কুরবানী করা হয়। সেজন্য কুরআনে কারীমে আল্লাহ পাক এই কুরবানীকে "যিবহুন আযীম' বা মহান কুরবানী নামে অভিহিত করেছেন। উল্লেখ্য, কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে হযরত ইবরাহীম (আ.) জান্নাতী সেই দুম্বার শিং স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে কাবা শরীফের দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখেন। ৬৪ হিজরীর মুহাররাম মাসে পাপিষ্ঠ ইয়াযিদের নির্দেশে যখন পবিত্র মক্কা নগরী অবরোধ করা হয় এবং কাবা ঘরে আগুনের বারুদ নিক্ষেপ করা হয়, সে সময় কাবা ঘরের ব্যাপক ক্ষতি সাধন হয় এবং ইসমাঈল (আ.) এর স্মৃতিচিহ্ন বহনকারী সেই দুম্বার শিংটিও ভস্মীভূত হয়ে যায়।

হযরত ইবরাহীম (আ.) কর্তৃক প্রিয় পুত্র ইসমাঈল (আ.) এর কুরবানীর ঘটনা ইতিহাসের এক স্মরণীয় অধ্যায়। বস্তুতঃ ইসলামী শরীআতের কুরবানী এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত; যেটা হাদীস শরীফ দ্বারাও প্রমাণিত। সাহাবায়ে কিরাম একদা রাসূল ﷺ এর প্রতি আরয করে বলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! কুরবানী কী?' রাসূল ﷺ ইরশাদ

করেন, 'তোমাদের পিতা ইবরাহীম (আ.) এর সুন্নাত।' তাঁরা আবার জিজ্ঞেস করেন, 'এতে কী পাওয়া যায়?' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, 'প্রতি লোমের বিনিময়ে একটি করে নেকি'। (ইবনু মাজাহ)

আল্লাহর নবী হযরত ইবরাহীম (আ.) কে আল্লাহ পাক জীবনে কঠিন কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করেছেন। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। ছিয়াশি বছর বয়সে আল্লাহ পাক তাঁকে প্রথম সন্তান ইসমাঈল (আ.) কে দান করেন। পরম আশা ও অব্যাহত দুআর পর ছিয়াশি বছর বয়সে তিনি যে সন্তান লাভ করেন, পরে দেখা যায় সেই সন্তানই একের পর এক পরীক্ষার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। স্ত্রী হাজেরা ও দুগ্ধপোষ্য ইসমাঈলকে সুদূর হিজাযের জনমানবশূন্য ধু-ধু মরুভূমিতে রেখে আসা সেই পরীক্ষারই এক দৃশ্যপট।

ইসমাঈল (আ.) শিশু থেকে কৈশোরে পদার্পণ করলেন। তাফসীরে রূহুল বয়ানে আছে ৯ বছরের কথা। কোন কোন বর্ণনায় তিনি যখন ১৩ বছরে উপনীত হলেন একদিন পিতা এসে বলেন, 'প্রিয় বৎস, আমি স্বপ্নে দেখেছি তোমাকে আমি জবাই করছি। বলো, তোমার কী মত?' বালক ইসমাঈল (আ.) নিঃসঙ্কোচে জবাব দেন, 'আব্বাজান! আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন তা পালন করুন। আমাকে ইন শা আল্লাহ ধৈর্যশীলদের মধ্যেই পাবেন।' হযরত ইসমাঈল (আ.) এর এই উত্তম জবাব এবং নিঃসঙ্কোচ আত্মসমর্পণ ছিল পিতার প্রতি পুত্রের এবং প্রতিপালকের প্রতি মানবকুলের আনুগত্যের এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

এ কথা অকাট্যভাবে প্রমাণিত সত্য যে, নবী রাসূলগণের স্বপ্নও ওহীর অন্তর্ভূক্ত। তাই এ স্বপ্নের অর্থ ছিল এই যে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হযরত ইবরাহীম (আ.) এর একমাত্র পুত্রকে জবাই করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ হুকুমটি স্বপ্নের মাধ্যমে দেওয়ার কারণ হলো হযরত ইবরাহীম (আ.) এর আনুগত্যের বিষয়টি পূর্ণমাত্রায় প্রমাণিত করা। পিতা-পুত্র মহান প্রতিপালকের নির্দেশ সত্বর পালনের নিমিত্তে যাবতীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করলেন এবং এ কাজ সমাধার জন্য তারা মক্কা শরীফের অদূরে মিনা প্রান্তরে গমন করেন। পুত্র ইসমাঈল পিতা ইবরাহীম (আ.) কে বললেন, আব্বাজান! আমার হাত-পা খুব শক্ত করা বেঁধে নিন যাতে আমি নড়াচড়া করতে না পারি। অন্যথায় আমার সাওয়াব কমে যেতে পারে। আর আপনার পরিধেয় বস্ত্রাদি সামলে নিন, যাতে আমার রক্তের ছিটা তাতে না পড়ে, কেননা রক্ত দেখলে আমার মা অধিক ব্যাকুল হয়ে যেতে পারেন। আপনার ছুরিটি ভালো করে ধার দিয়ে নিন এবং আমার গলায় দ্রুত চালাবেন, যাতে আল্লাহর ডাকে সাঁড়া দিতে আমার দেরি না হয়। আমাকে আপনি উপুড় করে শোয়াবেন, কেননা কুরবানী করার সময় আমার চেহারার উপর আপনার দৃষ্টি পড়লে পুত্রের প্রতি বাৎসল্য আপনার কাজে বিঘ্ন ঘটাতে পারে। একমাত্র আদরের সন্তানের মুখে এমন কথা শুনে পিতার মানসিক অবস্থা কি যে হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু হযরত ইবরাহীম (আ.) দৃঢ়তায় অটল থেকে ইসমাঈল (আ.) কে সোজা করে শুইয়ে দিয়ে তার গলায় ছুরি চালালেন। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, বার বার ছুরি চালানো সত্ত্বেও গলা কাটছে না। হযরত ইবরাহীম (আ) এবং ইসমাঈল (আ.) এর আত্মসমর্পণে মহান আল্লাহ পাক সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন। আল্লাহ বলেন, 'অবশেষে যখন পিতাপুত্র উভয়ে আল্লাহর কাছে নিজেদের আনুগত্যের শির নত করে দিল এবং ইবরাহীম (আ.) পুত্রকে উপুড় করে শুইয়ে দিলেন (জবাই করার জন্য), তখন আমি ডাক দিয়ে বললাম, হে ইবরাহীম! তুমি স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছ।' (সূরা আস-সাফফাত, আয়াত-১০৫)

হযরত ইবরাহীম (আ.) যখন পুত্রের গলায় ছুরি চালাতে লাগলেন, তখন হযরত জিবরাঈল (আ.) আল্লাহর নির্দেশে বেহেশত থেকে নির্ধারিত দুম্বা নিয়ে রওয়ানা হলেন। আকাশ থেকে তিনি এ সময় উচ্চস্বরে ধ্বনি দিতে থাকেন 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার'। এমন মধুর ধ্বনি শুনে হযরত ইবরাহীম (আ.) স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠলেন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আল্লাহু আকবার'। হযরত ইসমাঈল (আ.) পিতার মুখে তাওহীদের বাণী শুনতে পেয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠলেন, 'আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ।' হজরত জিবরাঈল (আ.) এবং দুই নবীর কালামগুলো আল্লাহর কাছে এতই পছন্দনীয় হলো যে, কিয়ামত পর্যন্ত ঈদুল আদ্বহা এবং ঈদুল ফিতরের দিনগুলোতে বিশ্ব মুসলিমের কণ্ঠে ওই কালামগুলো উচ্চারিত হতে থাকবে।

মহান আল্লাহর নির্দেশে হযরত ইবরাহীম (আ.) পুত্রকে ছেড়ে দিলেন এবং আসমান থেকে প্রেরিত দুম্বাটিকে জবাই করলেন। এটাই সেই কুরবানী যা আল্লাহর দরবারে এতই প্রিয় ও মাকবুল হয়েছিল যে, আল্লাহ তাআলা পরবর্তী সকল উম্মতের মধ্যে তা অবিস্মরণীয় রূপে বিরাজমান রাখার ব্যবস্থা করে দিলেন। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেনে, 'আর আমি তাঁর (ইসমাঈলের) পরিবর্তে জবাই করার জন্য দিলাম একটি মহান কুরবানী। এবং পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে চিরকালের জন্য তার সুনাম ও সুখ্যাতি রেখে দিলাম'- (আস সা-সাফফাত, আয়াত-১০৭-১০৮)। আল্লাহ তাআলা নিজের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কুরবানীর এই সুন্নত জারী রাখার মাধ্যমে কিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীর বুকে হযরত ইবরাহীম (আ.) এর সুনাম ও সুখ্যাতি ধরে রাখবেন।

কুরবানী ইসলামের একটি 'মহান নিদর্শন' যা 'সুন্নাতে ইবরাহীম' হিসেবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে মদীনায় প্রতি বছর আদায় করেছেন এবং সাহাবীগণও নিয়মিতভাবে কুরবানী করেছেন। অতঃপর অবিরত ধারায় মুসলিম উম্মাহর সামর্থ্যবানদের মধ্যে এটি চালু আছে। কুরবানীর আমল কুরআন, সুন্নাহ এবং ইজমায়ে উম্মত দ্বারা সুপ্রমাণিত। কুরবানী, আত্মসমর্পণ ও আত্মত্যাগের এ প্রেরণা ও চেতনা সমগ্র জীবনে জাগ্রত রাখার জন্যে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আরো নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'বলুন, আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মৃত্যু সবকিছু আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য, যার কোন শরীক নেই। এরই নির্দেশ আমাকে দেওয়া হয়েছে এবং আমিই প্রথম মুসলিম (আল্লাহর প্রতি আত্মসপর্মণকারী)'- (সূরা আনআম, আয়াত-১৬২-১৬৩)

পবিত্র কুরআনে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে- 'অতএব নামায আদায় কর তোমার রবের উদ্দেশ্যে এবং 'নাহর কর।' (সূরা কাউসার, আয়াত-০২) মুফাসসিরীনে কিরামের মতে এখানে 'নাহর' অর্থ কুরবানী। তাফসীরে রূহুল মাআনীর ভাষ্যমতে কতিপয় ইমাম ঐ আয়াত দ্বারা কুরবানী ওয়াজিব হওয়াকে প্রমাণ করেছেন। তিরমিযী শরীফের হাদীসে আছে- হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দশ বছর মদীনায় ছিলেন এবং প্রতি বছর কুরবানী করেছেন।' হযরত মুল্লা আলী কারী (র.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি বছর কুরবানী করায় কুরবানীর আমল ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ বহন করে।' এজন্য ইমাম আবূ হানীফা (র.) নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিকের উপর কুরবানীকে ওয়াজিব মনে করেন।

হযরত ইবরাহীম (আ.) এর প্রতি নিজ সন্তানকে কুরবানীর এ নির্দেশ ও উদ্দেশ্য ছিল পিতা-পুত্রের আনুগত্য ও আল্লাহর ভয়ের পরীক্ষামাত্র। সে পরীক্ষায় পিতা-পুত্র যেমন উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। তেমনি তাদের তাকওয়ার পরিচয়ও ফুটে উঠেছিল। সুতরাং কুরবানী নিছক একটি উৎসব নয়, কুরবানী হচ্ছে আল্লাহর প্রতি আমাদের সর্বোচ্চ আত্মসমর্পণের এক অনুপম দীক্ষা এবং তাকওয়া অর্জনের এক দীপ্ত অঙ্গীকার।

ইসরাঈলের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক অনৈতিক

মুহাম্মাদ ইবন নূর

যে কয়টি দেশ প্রথম পর্যায়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল, ইসরাঈল তাদের অন্যতম। সদ্য-স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য তখন বৈদেশিক স্বীকৃতির গুরুত্ব অপরিসীম। তবু বাংলাদেশ ইসরাঈলের স্বীকৃতি প্রত্যাখ্যান করেছিল। স্বীকৃতি প্রত্যাখ্যানের নৈতিক ও কূটনৈতিক তাৎপর্য অনস্বীকার্য। ফিলিস্তিনের ভূমি দখল করে প্রতিষ্ঠিত অবৈধ রাষ্ট্র ইসরাঈলের সাথে কোনো ধরনের সম্পর্ক স্থাপন নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে যেমন গ্রহণযোগ্য নয়, তেমনি কূটনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সে সময় বাংলাদেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রের স্বীকৃতি অর্জন। যেহেতু সে সময় প্রতিটি আরব রাষ্ট্র ইসরাঈলের বিরুদ্ধে সোচ্চার ছিল, তাই ইসরাঈলকে স্বীকৃতি দিলে কিংবা ইসরাঈলের স্বীকৃতি গ্রহণ করলে সে সকল আরব রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা সম্ভব হতো না। এসব দিক বিবেচনা করে বাংলাদেশ তখন সঠিক সিদ্ধান্তটিই গ্রহণ করেছিল।

বিশ্ব রাজনীতির প্রেক্ষাপট অর্ধ শতকে অনেকটা বদলেছে। এখন আর আরব রাষ্ট্রগুলোর নিকট ইসরাঈল অচ্ছুত নয়। অনেক আরব রাষ্ট্র ইতোমধ্যে প্রকাশ্যে ইসরাঈলের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, আর গোপনে তো আরো অনেকেরই ইসরাঈলের সাথে সম্পর্ক রয়েছে। এমন পরিস্থিতি সৃষ্টির জন্য ইসরাঈলকে বহু কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে। ইসরাঈল সবসময়ই যেকোনো উপায়ে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী, কারণ এর মধ্য দিয়ে তারা ফিলিস্তিনিদেরকে মানসিকভাবে কোণঠাসা করতে চায়। অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের বিষয়েও ইসরাঈলের আগ্রহের শেষ নেই।

ইসরাঈলের এই আগ্রহ থাকলেও বাংলাদেশ ফিলিস্তিনের পক্ষে এবং ইসরাঈলের দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে ছিল সব সময়। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এ দেশের পাসপোর্টে লেখা ছিল 'ইসরাঈল ব্যতীত সকল দেশের জন্য বৈধ।' কিন্তু ইসরাঈলের পক্ষে আন্তর্জাতিক লবি সবসময়ই কাজ চালিয়ে গেছে। তাদের সাথে বাংলাদেশের কিছু লোকও এই প্রক্রিয়ার সাথে জড়িয়ে পড়ে। তাদের প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে বিভিন্ন সময় লেখালেখিসহ নানা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। তাদের এসকল কার্যক্রমের লক্ষ্য বাংলাদেশের মানুষের ইসরাঈল বিরোধিতার তীব্রতা হ্রাস করা, যাতে ধীরে ধীরে ইসরাঈলের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের স্বাভাবিকীকরণ সম্ভব হয়।

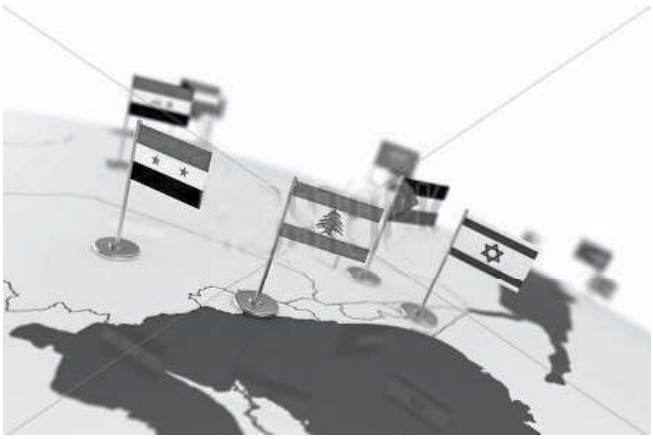

বছরখানেক পূর্বে জনৈক বাংলাদেশি আইনজীবী উমরান চৌধুরী ইসরাঈলের পত্রিকা হারেৎজে ইসরাঈলের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের পক্ষে একটি কলাম লিখেন। এই কলামে যে সকল অপ্রাসঙ্গিক যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে, ইসরাঈলপ্রেমীরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ বিভিন্ন জায়গায় এসকল যুক্তি বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করেন। সম্প্রতি বাংলাদেশের পাসপোর্ট থেকে "ইসরাঈল ব্যতীত" শব্দগুচ্ছ বাদ দেওয়া হয় চুপিসারে। পাসপোর্টের এই পরিবর্তনের বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর থেকে ইসরাঈলের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পক্ষে বিপক্ষে যুক্তি-তর্ক আবারও সামনে চলে আসে। আমরা এ নিবন্ধে বাংলাদেশ-ইসরাঈল কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন বিষয়ক বিভিন্ন যুক্তি পর্যালোচনা করবো। এক্ষেত্রে হারেৎজে প্রকাশিত কলামটির বিভিন্ন বিষয় সামনে রাখবো, যেহেতু এ বিষয়ে ইসরাঈলপন্থীদের অবস্থান সেই কলামটিতে স্পষ্ট হয়েছে। পাশাপাশি পাসপোর্টের "ইসরাঈল ব্যতীত" শব্দগুচ্ছ নিয়ে সরকারি যুক্তিসমূহও খতিয়ে দেখবো।

প্রকাশিত কলামটিতে হাস্যকর যে যুক্তিটি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা হয়েছে, সেটি হলো বাংলাদেশ ও ইসরাঈল উভয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গণহত্যার ঘটনা ঘটেছে। তাই রাষ্ট্র দুটির মধ্যে মিল রয়েছে। ঐ কলামের লেখক হলোকাস্ট বা জার্মান নাৎসি বাহিনী কর্তৃক ইয়াহুদী গণহত্যার সাথে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের তুলনা করেছেন। অথচ মুক্তিযুদ্ধের সাথে প্রকৃত অর্থে ইসরাঈল কর্তৃক ফিলিস্তিনিদের উপর যে নির্যাতন-নিপীড়ন চলছে, সেটিই অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। জার্মানদের হাতে ইয়াহুদীরা নির্যাতিত হয়ে জার্মানিতে যদি ইয়াহুদী রাষ্ট্র গড়ে তুলতো, তাহলে এই যুক্তিটি কিছুটা মেনে নেওয়া যেতো। কিন্তু ইয়াহুদীরা ফিলিস্তিনে এসে উলটা ফিলিস্তিনিদের উপর গণহত্যা নিপীড়ন চালিয়ে যে রাষ্ট্রটি প্রতিষ্ঠা করেছে, সেটি নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে কোনোভাবেই সমর্থনযোগ্য হতে পারে না।

ভারতকে জড়িয়ে প্রকাশিত কলামটিতে পরস্পরবিরোধী দু'টি যুক্তি উপস্থাপন করা হয়েছে। শুরুর দিকে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের সাথে ইসরাঈলের ভালো সম্পর্ক রয়েছে, তাই বাংলাদেশেরও উচিত ইসরাঈলের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা। কয়েক প্যারা পরে আবার বলা হয়েছে ইসরাঈল ও বাংলাদেশ উভয় দেশই শত্রু পরিবেষ্টিত, তাই তাদের মধ্যে কৌশলগত সম্পর্ক থাকা জরুরি। বলা হয়েছে, ইসরাঈল যেমন চারদিকে আরব অ-ইয়াহুদী রাষ্ট্র পরিবেষ্টিত, তেমনি বাংলাদেশ চারদিক থেকে ভারত ও মিয়ানমার পরিবেষ্টিত, এ দুটি রাষ্ট্রই অমুসলিম এবং দুই দেশেই মুসলিম বিদ্বেষ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ভারতে মুসলিমদের সাথে বৈষম্যমূলক নাগরিকত্ব আইন পাশ হয়েছে, এর ফলে

ভারত থেকে শরণার্থী আসতে পারে বাংলাদেশে। আসামের এনআরসির কথাও সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ বাস্তবে ভারতের চেয়ে ইসরাঈলের আইন ঢের বেশি মুসলিম বিদ্বেষী, ভারত থেকে এখনও মুসলিম জনগোষ্ঠী শরণার্থী না হলেও ইসরাঈলের অবৈধ দখলদারিত্বের কারণে অগণিত ফিলিস্তিনি মুসলিম বিভিন্ন দেশে শরণার্থী হিসেবে বসবাস করছেন।

কলামটিতে আরেকটি বিষয়ের উপর বেশ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে, ইসরাঈল মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে শক্তিশালী গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, বাংলাদেশের সাথে ইসরাঈলের সরাসরি কোনো শত্রুতা নেই, তাই বাংলাদেশের উচিত ইসরাঈলের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা। অথচ ইসরাঈলের এই কথিত গণতন্ত্র যে কত অমানবিক ও বর্বর, বিশ্ববাসী তা প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করছেন। ফিলিস্তিনে ইসলামপন্থীরা শক্তিশালী হচ্ছে বলে ফিলিস্তিন ও ইসরাঈলের দ্বি-রাষ্ট্রভিত্তিক সমাধান এখন নাকি প্রাসঙ্গিকতা হারাচ্ছে, এমন দাবিও করেছেন ঐ কলামের লেখক। অথচ একটি রাষ্ট্রের জনগণ তাদের ইচ্ছেমতো যেকোনো পন্থা বেছে নিতেই পারে, এর ফলে তাদের স্বাধীনতার দাবি কীভাবে অপ্রাসঙ্গিক হতে পারে? আর তাছাড়া ঐ লেখক যে রাষ্ট্রটির পক্ষে দালালি করছেন, সেটি তো কট্টর ইয়াহুদীবাদী রাষ্ট্র, ইসলামপন্থা নিয়ে যদি সমস্যা থাকে, তবে বর্বর ইয়াহুদীবাদী রাষ্ট্র কীভাবে সমর্থনযোগ্য হয়?

কলামটির একদম শেষের দিকে লেখক ইসরাঈলের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করেছেন। বাস্তবে বাংলাদেশের জন্য প্রতিটি খাতেই ইসরাঈলের চেয়ে ভালো বিকল্প রয়েছে। ফলে ইসরাঈলের সাথে সম্পর্ক স্থাপন না করলে বাংলাদেশ যে খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তা কিন্তু নয়। ইসরাঈলের পক্ষে বাংলাদেশে যারা কথা বলেন, তারা মূলত এই কলামে বর্ণিত যুক্তিগুলোই বলে থাকেন, সে জন্য আমরা সংক্ষেপে এসকল যুক্তির বিষয়ে আলোকপাত করলাম। তবে এসব যুক্তি পর্যালোচনা করলে ইসরাঈলের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক স্থাপন যে আসলে একেবারেই অযৌক্তিক ও অনৈতিক, এবং এর পক্ষে যে শক্তিশালী কোনো যুক্তিই নেই, তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে এখনো ইসরাঈলের বিপক্ষে কঠোর অবস্থানে রয়েছে। জেরুজালেমকে রাজধানী করে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র পূর্ণ স্বাধীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ইসরাঈলকে বাংলাদেশ কোনো ধরনের স্বীকৃতি দেবে না, সম্পর্ক স্থাপনও করবে না। আনুষ্ঠানিক অবস্থান এরকম হলেও দুঃখজনক বিষয় হলো বাস্তবে এই অবস্থানের পরিবর্তনের কিছু লক্ষণ ধীরে ধীরে দেখা যাচ্ছে। ইসরাঈলের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক না থাকলেও বাস্তবে ঠিকই ইসরাঈলের সাথে বাণিজ্য হচ্ছে। এক্ষেত্রে ইসরাঈলি কোম্পানি তৃতীয় কোনো দেশে তাদের শাখার মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে রফতানি করে থাকে। যেহেতু আনুষ্ঠানিকভাবে ইসরাঈল ব্যতীত অন্য একটি দেশে অবস্থিত কোম্পানির সাথে লেনদেন হয়, তাই এটিকে বেআইনি বলার সুযোগ থাকে না। তবে ইসরাঈল প্রসঙ্গে বাংলাদেশের অবস্থানের সবচেয়ে বড় যে পরিবর্তনটি হয়েছে, সেটি হলো পাসপোর্ট থেকে "ইসরাঈল ব্যতীত" শব্দগুচ্ছ মুছে ফেলা।

এটি নিঃসন্দেহে অনেক বড় একটি সিদ্ধান্ত। ইতোমধ্যে ইসরাঈলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বাংলাদেশের এ সিদ্ধান্তটিকে স্বাগত জানানো হয়েছে। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, "আন্তর্জাতিক মান রক্ষার জন্য" এমনটি করা হয়েছে, তবে ইসরাঈল ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা এখনও বলবৎ আছে, কোনো বাংলাদেশি নাগরিক ইসরাঈল ভ্রমণ করলে শাস্তি পেতে হবে।

বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রী ও কর্মকর্তার এই বক্তব্য মোটেও বাস্তবসম্মত নয়। প্রথমত "ইসরাঈল ব্যতীত" শব্দগুচ্ছটি লেখা থাকুক বা না থাকুক, এর উপর কোনো দেশের পাসপোর্টের মান নির্ভর করে না। একটি দেশের পাসপোর্টের আন্তর্জাতিক মান নির্ভর করে সে দেশের পাসপোর্ট দিয়ে কতটি দেশে ভিসা ছাড়া বা অন-অ্যারাইভাল ভিসা দিয়ে ভ্রমণ করা যায়, দেশটির পাসপোর্ট ব্যবহার করে বাইরের দেশে কী কী বিশেষ সুবিধা পাওয়া যায়, এসবের ভিত্তিতে। বাংলাদেশের পাসপোর্টের মান খুব শক্তিশালী নয়। সুবিধার বদলে উলটো বিভিন্ন দেশে এ পাসপোর্টের জন্য অসুবিধায় পড়তে হয়। এসকল অসুবিধা দূর করে পাসপোর্টের মানোন্নয়নের জন্য চাই শক্তিশালী কূটনৈতিক পদক্ষেপ, "ইসরাঈল ব্যতীত" শব্দগুচ্ছ মুছে এক্ষেত্রে কোনো লাভই হবে না। তাছাড়া মালয়েশিয়ার বর্তমান পাসপোর্টে ইসরাঈল ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা আছে, এবং মালয়েশিয়ার পাসপোর্টের মান বাংলাদেশের পাসপোর্টের চেয়ে ঢের বেশি।

বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে দ্বিতীয় যে দাবিটি করা হয়েছে যে, ইসরাঈল ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা এখনও বলবৎ আছে, কোনো বাংলাদেশি নাগরিক ইসরাঈল ভ্রমণ করলে শাস্তি পেতে হবে; এটিও বাস্তব নয়। কারণ ইসরাঈল ভ্রমণের বিষয়ে বাংলাদেশের আইনে কোনো ধরনের নিষেধাজ্ঞা নেই, কেবল পাসপোর্টে উল্লেখিত নিষেধাজ্ঞা ব্যতীত। এবার পাসপোর্ট থেকে "ইসরাঈল ব্যতীত" শব্দগুচ্ছ মুছে ফেলার ফলে সেই আইনি ভিত্তিটুকুও আর অবশিষ্ট নেই। ফলে নতুন ই-পাসপোর্ট নিয়ে কেউ ইসরাঈল ভ্রমণ করলে তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের যে দাবিটি করা হচ্ছে, বাস্তবে তা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। আদালত তো আর কোনো আইন ছাড়াই কাউকে শাস্তি দিতে পারেন না।

বাংলাদেশের পাসপোর্ট থেকে "ইসরাঈল ব্যতীত" শব্দগুচ্ছ মুছে ফেলার পর বাস্তবে এর কী প্রভাব পড়বে? আসলে এই পদক্ষেপের পর হুট করে যে বাংলাদেশের মানুষ ইসরাঈল ভ্রমণ শুরু করবে, এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই। আর ইসরাঈলের লবির সাথে সম্পৃক্ত বাংলাদেশিরা এর আগেও ইসরাঈলে যেতে পারতো, পাসপোর্টের বদলে ইসরাঈল আলাদা কাগজে তাদেরকে ভিসা প্রদান করতো। এখনও তারা ইসরাঈল যেতে পারবে। বাংলাদেশে যেহেতু ইসরাঈলের দূতাবাস নেই, সে জন্যে তৃতীয় কোনো দেশ থেকে ভিসা সংগ্রহ করতে হবে, এছাড়া ইসরাঈল ভ্রমণে আর কোনো বাধাই নেই।

তবে পাসপোর্টের এই পরিবর্তনটি ইসরাঈলের পক্ষে যারা দীর্ঘদিন থেকে প্রচারণা চালাচ্ছে, তাদের জন্য একটি বড় জয় হিসেবে বিবেচিত হবে। এই নিবন্ধের শুরুতে আমরা যে সকল যুক্তি পর্যালোচনা করেছি, পাসপোর্ট পরিবর্তনের এই সিদ্ধান্ত এসকল যুক্তিকেই শক্তিশালী করছে। ফলে বাংলাদেশ সরকারের এই পদক্ষেপটি ভবিষ্যতে ইসরাঈলের সাথে আরো সম্পর্ক বৃদ্ধির পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হবে। আর তাই বাংলাদেশ সরকার যতই বলুক না কেন, দিনশেষে এটি নিছক পাসপোর্টের মানোন্নয়নের জন্য গৃহীত কোনো পদক্ষেপ নয়, এই সিদ্ধান্তের কূটনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। এবং দুঃখজনকভাবে এটি সন্ত্রাসী রাষ্ট্র ইসরাঈলের পক্ষের একটি সিদ্ধান্ত, যদিও ঠিক কোন প্রেক্ষাপটে সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়েছে, তা এখনো স্পষ্ট নয়।

বাংলাদেশের পাসপোর্টধারীরা শত অসুবিধা সত্ত্বেও যে কয়টি বিষয় নিয়ে গর্ব করতো, পাসপোর্টে লেখা "ইসরাঈল ব্যতীত" শব্দগুচ্ছ তন্মধ্যে অন্যতম। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ইসরাঈলের বিষয়ে বাংলাদেশের যে অবস্থান সুস্পষ্ট কোনো কারণ ছাড়াই সে অবস্থান পরিবর্তন কোনোভাবেই কাম্য নয়।

রাফয়ে ইয়াদাইনের মাসআলা

কিছু বিভ্রান্তি ও এর সঠিক সমাধান

মাওলানা ছালিক আহমদ (র.)

ঈমানের পরই নামাযের স্থান। নামাযকে বলা হয় ‘উম্মুল ইবাদাত’ তথা সকল ইবাদতের মূল। কেননা নামাযের মধ্যে ইসলামে স্বীকৃত সকল ইবাদতের নমুনা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে লক্ষ্য করা যায়। নামাযে রয়েছে শ্রেষ্ঠ ইবাদত ‘তিলাওয়াতে কুরআন’। রয়েছে তাসবীহ, তাহলীল, তাহমীদ ও তাকবীর। তাছাড়া আরো রয়েছে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর সালাত, সালাম ও সর্বশেষে রয়েছে তাওবা।

ইসলামের আমলযোগ্য প্রায় সকল বিষয়েই কিছু না কিছু মতবিরোধ উলামায়ে কিরাম ও

> *“আহলে হাদীস নামধারী সালাফী লা-মাযহাবীরা হাজারো বছর পূর্ব থেকে ইসলামের মুআমালত, মুআশারাত, ইবাদত বন্দেগী ও আকীদাসহ যাবতীয় সকল মিমাংসিত ইখতিলাফী বিষয়কে মিডিয়ার সহজলভ্যতার সুযোগে নতুন করে উসকে দিয়ে মুসলিম মিল্লাতকে এক নব্য ফিতনার মুখোমুখী দাঁড় করিয়েছে। যার পরিণতি ইতোমধ্যে অত্যন্ত ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে।”*

ফুকাহায়ে ইযামের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। নামাযের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। কুরআন কারীমে নামায কায়িম করার নির্দেশ বারবার দেওয়া হয়েছে কিন্তু তা কিভাবে আদায় করতে হবে তা বিস্তারিতভাবে নেই। সুতরাং নামায আদায় করার পদ্ধতি পুরোটাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ থেকে আমরা পেয়েছি। এ জন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশনা صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّى -তোমরা আমাকে যেভাবে নামায আদায় করতে দেখ সেভাবেই নামায আদায় করো। এখন প্রশ্ন হতে পারে, নামাযের মাসাইলে এতো ইখলিতলাফ বা মতবিরোধ কেন? প্রশ্নটার জবাব এক কথায়, কিংবা অতি সংক্ষেপে দেওয়া অসম্ভব। এ প্রসঙ্গে আমরা এতটুকুই বলব যে, নামাযের আহকাম আরকান তথা ফরয, ওয়াজিবের ক্ষেত্রে তেমন একটা মতপার্থক্য নেই। তবে সুন্নাত ও মুস্তাহাব সম্পর্কে অনেক মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এ সকল মতপার্থক্যের মূল কারণ হচ্ছে রিওয়ায়াতের ভিন্নতা।

মুহাদ্দিসীনে কিরাম যখন তাদের সংকলিত হাদীসগ্রন্থে হাদীস সংকলন করেছেন, তখন হাদীসের সনদ বা সূত্রকে প্রাধান্য দিয়ে এবং নিজস্ব শর্তাবলিকে সামনে রেখে তাদের কিতাবে হাদীস সংকলন করেছেন। হাদীসের প্রেক্ষাপট ও কোনটি পূর্বের এবং কোনটি পরের কোনটি নাসিখ কোনটি মানসূখ তার প্রতি লক্ষ্য না করে তারা হাদীস একত্রিত করেছেন। ফলে দুটি হাদীসের মধ্যে আবার এমন অনেক সাহাবী রয়েছেন যারা কয়েকদিন রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সান্নিধ্যে থেকে নিজ দেশে চলে গেছেন কিংবা রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেক সাহাবীকে দ্বীনের দাঈ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের জন্য বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করেছেন। তাঁরা নবীজির সান্নিধ্যে থাকাকালে নামাযের যে পদ্ধতি বা ইসলামের অন্য কোনো বিষয় যেরূপ দেখেছেন বা জেনেছেন, তারা নিজেদের জ্ঞাত পদ্ধতি ও বিষয় বর্ণনা করেছেন। তাদের চলে যাওয়ার পর উক্ত পদ্ধতি বা বিষয় পরিবর্তিত কিংবা রহিত হয়ে গেছে, তা তাদের জানা ছিল না। উক্ত পদ্ধতি ও বিষয় মুহাদ্দিসীনে কিরাম সনদের বিবেচনায় হাদীসের কিতাবে স্থান দিয়েছেন। কার্যত তাদের বর্ণনা ও অন্য সাহাবীদের বর্ণনার মধ্যে ভিন্নতা দেখা দিয়েছে। পরবর্তীতে ফকীহ মুহাদ্দিস ও ইমাম মুজতাহিদগণ কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে উপরোক্ত বিষয়ের আলোকে যাচাই-বাছাই করে পরস্পর বিরোধী হাদীসগুলোর মধ্যে হয়তো সমন্বয় সাধন করেছেন, না হয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিছু হাদীসকে আমল থেকে বাদ দিয়েছেন (মানসুখ কিংবা মারজুহ হিসাবে), ফলে অনেক হাদীসই সহীহ হাদীসের কিতাবে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও তা আমল যোগ্য হিসাবে গৃহীত হয়নি। যে সমস্ত হাদীস আমলযোগ্য এগুলোকে সুন্নাহ বলা হয়। এখানে একটি কথা লক্ষ্যণীয় যে, সকল মুহাদ্দিস ফকীহ নন, তবে সকল ফকীহ মুহাদ্দিস। হাদীস গ্রহণ করা ও বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে সূত্র ও তথ্যগত ইখতিলাফ থাকার কারণে কোনো একজন ফকীহ মুহাদ্দিস একটি হাদীসকে গ্রহণ করেছেন, অপরজন সূক্ষ্ম কোনো কারণে তা পরিত্যাগ করেছেন, এতে গবেষণার দ্বার সুপ্রসন্ন হয়েছে এবং ঘুরে ফিরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অধিকাংশ হাদীসকে আমলে আসার পথ সুগম হয়েছে। মুজতাহিদগণের উক্ত ইখতিলাফকেই বলা হয়েছে রাহমাত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে চার মাযহাবের অনুসারীদের দ্বারাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অধিকাংশ হাদীসের উপর আমল হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে তথাকথিত লা-মাযহাবী আহলে হাদীস নামধারীরা মূলত সহীহ হাদীসের দোহাই তুলে ইসলামী শরীআতের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দলীল হাদীসে নববীর বিশাল ভাণ্ডারকে অস্বীকার করছে।

আহলে হাদীস নামধারী সালাফী লা-মাযহাবীরা হাজারো বছর পূর্ব থেকে ইসলামের মুআমালত, মুআশারাত, ইবাদত বন্দেগী ও আকীদাসহ যাবতীয় সকল মিমাংসিত ইখতিলাফী বিষয়কে মিডিয়ার সহজলভ্যতার সুযোগে নতুন করে উসকে দিয়ে মুসলিম মিল্লাতকে এক নব্য ফিতনার মুখোমুখী দাঁড় করিয়েছে। যার পরিণতি ইতোমধ্যে অত্যন্ত ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। ফলে আজ স্থানে স্থানে, মসজিদে মসজিদে বিশেষ কিছু পূর্ব মীমাংসিত ফুরুঈ মাসআলাকে কেন্দ্র করে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, চ্যালেঞ্জবাজি, পরস্পরের মধ্যে কাঁদা ছুড়াছুড়ি, এমনকি একে অপরকে গালমন্দ করছে, নির্বোধ, পথভ্রষ্ট প্রভৃতি কটুবাক্য ব্যবহার করছে। ফলে ইসলামের ক্ষতি হচ্ছে এবং ইসলাম বিদ্বেষীরা খুশি ও লাভবান হচ্ছে।

পরিতাপের বিষয়, নামাযের একটি বিশেষ

পদ্ধতি অবলম্বন করেই আহলে হাদীস নামধারীরা একে নবীজির সালাত কিংবা হাদীস ও সুন্নাহসম্মত নামায বলে আখ্যায়িত করছে, আর অপরাপর পদ্ধতিগুলোকে হাদীস-সুন্নাহ বিরোধী মনে করছে। এমনকি তাদের উগ্রপন্থীরা অন্য পদ্ধতিগুলোকে বাতিল বলছে। এখন প্রশ্ন দাঁড়ায় সাহাবা-তাবিঈন, মুহাদ্দিসীন, আম্মায়ে মুজতাহিদীন তথা সালফে সালিহীন যুগে যুগে যে পদ্ধতিতে নামায আদায় করেছেন তাঁদের নামায কি সুন্নাহবিরোধী ছিল? তাদের বক্তব্য দ্বারা পরোক্ষভাবে এ কথাইতো সাব্যস্ত হচ্ছে যে, সাহাবা-তাবিঈন ও তাদের পরবর্তীদের নামায খিলাফে সুন্নাহ বা খিলাফে হাদীস ছিল। (نعوذ بالله من ذالك)

তাই উক্ত নিবন্ধে ধারাবাহিকভাবে এমন কয়েকটি বিষয় আলোচনা করার ইচ্ছা পোষণ করছি যেগুলোকে কেন্দ্র করে আজ মসজিদে-মসজিদে, মহল্লায়-মহল্লায় ফিতনা দেখা দিয়েছে। যারা তাদের বক্তব্য-বিবৃতি, বই-পুস্তক, লিফলেট পড়ে সালাফ ও খালাফসহ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের হক্কানী উলামায়ে কিরামের প্রতি কুধারণা পোষণ করছেন এবং বাজার থেকে বাংলা ভাষায় অনূদিত হাদীসের বিভিন্ন কিতাব পড়ে যারা নিজেকে স্বঘোষিত মুহাদ্দিস বা আহলে হাদীস ভাবা শুরু করেছেন, আশা করি তারা উক্ত নিবন্ধে আলোচিত বিষয়গুলো উদার মনমানসিকতা নিয়ে পাঠ করলে সঠিক বিষয়টি অনুধাবন করতে পারবেন।

রাফয়ে ইয়াদাইন

রাফয়ে ইয়াদাইন অর্থ উভয় হাত উত্তোলন করা। নামায শুরু করতে যে তাকবীর উচ্চারণ করা হয় তাকে আকবীরে তাহরীমা বলা হয়। তাকবীরে তাহরীমা ফরয এবং উক্ত তাকবীর বলার সময় উভয় হাত উত্তোলন করা সর্বসম্মতিক্রমে সুন্নাত। তবে হাত কিভাবে ও কতটুকু পর্যন্ত ওঠাতে হবে এ ব্যাপারে উলামা, মুহাদ্দিসীন ও ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। সুতরাং এ বিষয়ের সকল দলীল আদিল্লা বিশ্লেষণপূর্বক আলোচনা করতে হলে পৃথক শিরোনামের প্রয়োজন। বিধায় এ প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে শুধু হাত ওঠানো দিয়েই আলোচনা শুরু করছি।

তাকবীরে তাহরীমা ব্যতিত রুকুতে যাওয়ার সময় ও রুকু থেকে ওঠার সময় হস্তদ্বয় ওঠানো সুন্নাত কি না এ ব্যাপারে মুহাদ্দিসীন ও ফুকাহায়ে কিরামের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। প্রথমেই চার মাযহাবের ইমামগণ ও তাঁদের অনুসারীদের মতামতসমূহ ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করা হলো। যেহেতু এ প্রসঙ্গে রিওয়ায়াতের ভিন্নতা রয়েছে তাই চার ইমামের দুজনের মতে তা সুন্নাত এবং দুজনের মতে জায়িয তবে সুন্নাত নয় বরং মাকরূহ বা অপছন্দনীয়।

আহনাফের অভিমত

হানাফী মাযহাবের প্রামাণ্য কিতাব রাদ্দুল মুহতার, যা ফাতাওয়ায়ে শামী নামে সুপ্রসিদ্ধ, উক্ত কিতাবের প্রথম খণ্ড ৩৭৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে-لا يرفع عند التكبيرات الإنتقالات خلافا للشافعي واحمد فيكره عندنا ولا تفسد الصلوة -নামাযের এক রুকন থেকে অন্য রুকনে যেতে যে তাকবীর বলা হয়, সেই তাকবীরের সময় হাত উত্তোলন করা যাবে না। ইমাম শাফিঈ (র.) ও ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র.) বিপরীত মত পোষণ করে থাকেন। তবে হাত ওঠানোর কারণে নামায ফাসিদ হবে না।

শাফিঈদের অভিমত

كتاب الفقه على المذاهب الأربعة এর প্রথম খণ্ড ২৫০নং পৃষ্ঠায় শাফিঈ মাযহাবের বক্তব্য নিম্নরূপ উল্লেখ রয়েছে।

الأكمل فى السنة هو رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام والركوع والرفع منه وعند القيام من التشهد الأول

-পরিপূর্ণ সুন্নাত হচ্ছে তাকবীরে তাহরীমার সময় রুকুতে যাওয়ার সময়, রুকু হতে ওঠতে ও প্রথম তাশাহহুদ শেষে দাঁড়ানোর সময় উভয় হাত উত্তোলন করা।

তবে প্রথম তাশাহহুদ শেষে দাঁড়ানোর সময় অর্থাৎ তৃতীয় রাকাতের জন্য ওঠার সময় হাত উত্তোলন না করার অভিমতও শাফিঈ মাযহাবের কোনো কোনো কিতাবে উল্লেখ রয়েছে।

মালিকী মাযহাবের অভিমত

كتاب الفقه على المذاهب الاربعة এর প্রথম খণ্ড ২৫০নং পৃষ্ঠায় মালিকী মাযহাবের অভিমত উল্লেখ করা হয়েছে নিম্নরূপ-

رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة الاحرام مندوب وفيما عدا ذالك مكروه

-তাকবীরে তাহরীমার সময়ে কাঁধ বরাবর হস্তদ্বয় উত্তোলন করা মুস্তাহাব। উক্ত স্থান ব্যতীত হাত ওঠানো মাকরূহ।

হাম্বলী মাযহাবের অভিমত

كتاب الفقه على المذاهب الاربعة এর প্রথম খণ্ড ২৫০নং পৃষ্ঠায় হাম্বলী মাযহাবের অভিমত নিম্নরূপ উল্লেখ করা হয়েছে-

يسن للرجل والمرأة رفع اليدين الى حذو المنكبين عند تكبيرة الاحرام والركوع والرفع منه.

-তাকবীরে তাহরীমা, রুকুতে যাওয়া ও রুকু থেকে ওঠার সময় নর-নারী সকলের জন্যই কাঁধ পর্যন্ত উভয় হাত উত্তোলন করা সুন্নাত।

ইমাম চতুষ্টয়ের বক্তব্যের খুলাসা

এক. তাকবীরে তাহরীমার সময় রাফয়ে ইয়াদাইন বা হাত ওঠানো সর্বসম্মতিক্রমে সুন্নাত।

দুই. তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্যান্য স্থানে রাফয়ে ইয়াদাইন করলে সর্বসম্মতিক্রমে নামায ফাসিদ হবে না।

তিন. ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মালিক (র.) এর মতে তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্যান্য স্থানে রাফয়ে ইয়াদাইন করা সুন্নাত নয়, জায়িয। তবে মাকরূহ বা অপছন্দনীয়।

চার. ইমাম শাফিঈ (র.) ও ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র.) এর মতে তাকবীরে তাহরীমার মতোই রুকুতে যাওয়ার সময় ও রুকু থেকে ওঠার সময় রাফয়ে ইয়াদাইন সুন্নাত।

তথাকথিত আহলে হাদীস লা-মাযহাবীরা নামাযে ফরয, ওয়াজিব কিংবা সুন্নাত-মুস্তাহাব এগুলোর যে পৃথক হুকুম রয়েছে তা মানতে নারাজ। বরং তাদের মতে নামাযের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবগুলো কাজই একই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত।

এখন মূল আলোচনার বিষয় হলো রুকুতে যেতে ও রুকু থেকে ওঠার সময় রাফয়ে ইয়াদাইন করা ও না করা নিয়ে। সুতরাং এ সংক্রান্ত দলীল আদিল্লার বিশ্লেষণমূলক আলোচনা নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে পেশ করা হলো।

রাফয়ে ইয়াদাইন করা সংক্রান্ত দলীল

নামাযে তাকবীরে তাহরীমা, রুকুতে যাওয়া ও রুকু থেকে ওঠার সময় রাফয়ে ইয়াদাইন করা সংক্রান্ত রিওয়ায়াত একাধিক। তন্মধ্যে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) বর্ণিত হাদীসটি সিহাহ সিত্তাহ'র অন্তর্ভুক্ত একাধিক কিতাবসহ হাদীস শাস্ত্রের অনেক গ্রন্থে শব্দগত কিছু পার্থক্যসহ উল্লেখ রয়েছে। এটি এ বিষয়ে বর্ণিত সর্বাধিক শক্তিশালী দলীল হিসেবে পরিগণিত হয়। হাদীসটি নিম্নরূপ-

عن الزهرى قال اخبرنى سالم بن عَبْدِ اللهِ بْنِ عمر ﷺ ان عَبْدِ اللهِ بْنِ عمر ﷺ قَالَ رَأَيْتُ النبيَّ ﷺ افْتَتَحَ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلاةِ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حتّى يَجْعَلَهُما حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وإذا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَهُ، وإذا قالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَهُ، فَعَلَ مِثْلَهُ، وقالَ: رَبَّنا ولَكَ الحَمْدُ، ولا يَفْعَلُ ذلكَ حِينَ يَسْجُدُ، ولا حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ.

-যুহরী থেকে বর্ণিত, আমার নিকট আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা.) এর ছেলে সালিম বর্ণনা করেছেন, আব্দুল্লাহ ইবন উমর (রা.) বলেন, আমি রাসূল ﷺ কে তাকবীর দ্বারা নামায শুরু করতে দেখেছি। তখন তিনি তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় কাঁধ পর্যন্ত উভয় হাত উত্তোলন করলেন এবং যখন سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَهُ বললেন তখনও অনুরূপ করলেন, অতঃপর رَبَّنا ولَكَ الحَمْدُ বললেন। তবে তিনি সিজদায় যেতে ও সিজদা থেকে মাথা উত্তোলন করতে তা [রাফয়ে ইয়াদাইন] করেননি। (বুখারী ১ম খণ্ড, পৃ. ১০২; মুসলিম ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬৮; আবূ দাউদ ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৪)

রাফয়ে ইয়াদইন না করা সংক্রান্ত দলীল

তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া নামাযের অন্য কোথাও রাফয়ে ইয়াদাইন নেই এ মর্মে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যাও একাধিক। তবে এ সংক্রান্ত বর্ণনাসমূহের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী বর্ণনা হিসেবে গণ্য করা হয় হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) বর্ণিত হাদীসটি, যা সিহাহ সিত্তাহ'র অন্তর্ভুক্ত একাধিক কিতাবসহ প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রন্থসমূহে বিভিন্ন সহীহ সূত্রে শাব্দিক কিছু পার্থক্য সহকারে বর্ণিত হয়েছে। হাদীসটি নিম্নরূপ:

عن علقمة قال قال عبد الله بن مسعود ﷺ ألا أُصَلِّي بكم صلاةَ رسولِ اللهِ ﷺ؟ فصلّى فلم يرفَعْ يدَيْهِ إلّا في أوَّلِ مرَّةٍ. قال ابو عيسى حديث ابن مسعود ﷺ حديث حسن.

-হযরত আলকামা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) একদা সাহাবায়ে কিরামের মজলিসে ঘোষণা করলেন, আমি কি রাসূল ﷺ যেরূপ নামায আদায় করেছেন সেরূপ নামায আদায় করে দেখাব না? অতঃপর তিনি নামায আদায় করলেন। তখন তিনি প্রথম তাকবীর অর্থাৎ তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্য কোথাও রাফয়ে ইয়াদাইন করলেন না। (তিরমিযী ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৯; আবূ দাউদ ১ম খণ্ড, পৃ. ১০৯; শারহু মাআনিল আসার (তাহাবী) ১ম খণ্ড, পৃ. ১৬২; জামিউল মাসানিদ ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৫৫)

উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করে ইমাম তিরমিযী (র.) বলেছেন, হাদীসটি হাসান। জাহিরীদের ইমাম ইবন হাযম তার লিখিত المحلى (আল মুহাল্লা) নামক গ্রন্থের ৪র্থ খণ্ডে ৮৮নং পৃষ্ঠায় উক্ত হাদীসকে সহীহ বলেছেন। তাছাড়া সমকালীন একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আল্লামা আহমদ শাকির ترمذى محقق এর ২য় খণ্ড ৪১নং পৃষ্ঠায় উক্ত হাদীস সম্পর্কে নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন,

هذا الحديث صححه ابن حزم وغيره من الحفاظ، وهو حديث صحيح وما قالوا فى تعليله ليس بعلة.

-ইবন হাযম ও অন্যান্য হাফিযে হাদীসগণ উক্ত হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। সুতরাং হাদীসটি সহীহ। যারা উক্ত হাদীসের কিছু ত্রুটি উল্লেখ করেছেন সেগুলো আদৌ কোনো ত্রুটি হিসেবে পরিগণিত নয়।

সুতরাং বর্তমান সময়ের তথাকথিত আহলে হাদীস লা-মাযহাবীরা তাদের চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী সাধারণ মানুষকে এ কথা বলে বিভ্রান্ত করতে চায় যে রাফয়ে ইয়াদাইন না করা সংক্রান্ত বর্ণিত হাদীসসমূহের সবগুলোই দঈফ তথা দুর্বল। তাদের এ সকল বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্য আদৌ সত্য নয়। বরং তা ধোঁকা বৈ কিছুই নয়।

মতবিরোধের ভিত্তি জায়িয-নাজায়িয নিয়ে নয়; উত্তম ও অনুত্তম নিয়ে

রিওয়ায়াতের ভিন্নতাহেতু নামাযের অনেক ক্ষেত্রেই ইমামগণ নিজস্ব ইজতিহাদ অনুযায়ী কোনো একটি বর্ণনাকে প্রাধান্য দিয়ে মত প্রকাশ করেছেন ও আমল করেছেন। উদাহরণস্বরূপ নামায শুরু করতে তাকবীর আগে বলতে হবে নাকি হাত আগে ওঠাতে হবে? এ ব্যাপারে বিপরীতমুখী সহীহ বর্ণনা থাকায় কেউ তাকবীর আগে বলেন এবং হাত পরে ওঠান, আবার কেউ কেউ আগে হাত ওঠান এবং পরে তাকবীর বলেন উভয় পদ্ধতিই সুন্নাহ'র অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে কাওমাতে رَبَّنا لَكَ الحَمْدُ ও বলা যায় আবার 'ওয়াও' যুক্ত করে رَبَّنا ولَكَ الحَمْدُ এবং اَللّٰهُمَّ رَبَّنا ولَكَ الحَمْدُ ও বলা যায়। সবই সুন্নাহর অন্তর্ভুক্ত এবং সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

কিছু মতবিরোধ এমনও রয়েছে যেখানে দুটো বিষয়ই অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত। তবে বিভিন্ন সূক্ষ্ম আলামতের ভিত্তিতে কোনো ফকীহ একটিকে উত্তম ও প্রাধান্য দিয়ে থাকেন এবং অপরটিকে অনুত্তম তবে বৈধ ও শরীআতে তা অনুমোদিত বলে স্বীকৃতি দিয়ে থাকেন। আর নামাযে রাফয়ে ইয়াদাইনের মাসআলাটি শেষোক্ত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। যেমন আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (র.) তার রচিত زاد المعاد গ্রন্থে ফজরের নামাযে কুনুত পড়া প্রসঙ্গে লিখেন-

وهذا من الاختلاف المباح الذى لا يعنف فيه فاعله ولا من تركه وهذا كرفع اليدين فى الصلاة وتركه– وكالخلاف فى انواع الشهادات وانواع الاذان والاقامة وانواع الشك من الافراد والقران والتمتع.

-ফজরের নামাযে কুনুত পড়া এমন সব মতবিরোধের অন্তর্ভুক্ত, যাতে কার্যসম্পাদনকারী কিংবা পরিত্যাগকারী কাউকেই নিন্দা ও ভর্ৎসনা করা যাবে না। এটা নামাযে রাফয়ে ইয়াদাইন করা বা না করা, তাশাহহুদ পাঠের বিভিন্নতা, আযান- ইকামাতের বিভিন্ন পদ্ধতি ও হজ্জের বিভিন্ন প্রকার তথা ইফরাদ, কিরান ও তামাত্তু প্রভৃতি বিষয়ের মতবিরোধের ন্যায়।

আমলে মুতাওয়ারাস

নামায এমন একটি ইবাদত যা শুধু মাসআলা পড়ে শিখা যায় না। তা সঠিকভাবে আদায় করতে হলে বাস্তব প্রশিক্ষণের প্রয়োজন। আর সাহাবায়ে কিরাম এ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন রাসূলে পাক ﷺ এর নামায দেখে। সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ ও প্রজ্ঞাবান যারা ছিলেন তারাই নবী ﷺ এর মজলিসে সম্মুখ সারিতে বসতেন এবং নামাযে তাঁর ঠিক পেছনে দাঁড়াতেন। আর এমনটি করার নির্দেশও দিয়েছিলেন খোদ রাসূলে আকরাম ﷺ -لِيَلِيَنِّي منكُم أولوا الأحلامِ والنُّهى -তোমাদের মধ্যে বুদ্ধিমান ও প্রজ্ঞাবান যারা তারা যেন আমার নিকটে দাঁড়ায়। (শারহু মাআনিল আসার (তাহাবী), খণ্ড ১, পৃ. ১৬৩)

আর এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, সাহাবীদের মধ্যে একাধারে ফকীহ ও মুহাদ্দিস যে কয়জন ছিলেন তন্মধ্যে অন্যতম হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.)। যিনি স্বদেশে ও সফরে নবী ﷺ এর খাদিম ছিলেন। তাঁর উপাধি ছিল 'রাসূল ﷺ صاحب النعلين والوسادة والمطهرة' এর পাদুকাদ্বয়, বালিশ এবং উযূর পানির পাত্র বহনকারী'। এমনকি তিনি নবী পরিবারের এতই ঘনিষ্ট ছিলেন যে, হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) বলেন, আমরা দীর্ঘদিন যাবত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) ও তাঁর মাতাকে আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত মনে করতাম, কেননা নবীর গৃহে তাদের যাতায়াত ছিল অনেক বেশি। হযরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) নবীজির কতটুকু কাছের লোক ছিলেন নিম্নোক্ত বর্ণনায় লক্ষ্য করুন-

عَن المغيرة قال قلت لابراهيم حديث وائل انه رأى النبى صلى الله عليه وسلم يَرفَعُ يَدَيه إذا افتَتحَ الصلاةَ، وإذا ركَع، وإذا رفَع رأسَهُ منَ الركوعِ فقال ان كان وائل رأه مرة يفعل ذالك فقد رأه عبد الله خمسين مرة لا يفعل ذالك. (شرح معانى الأثار)

-হযরত মুগীরা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবরাহীম নাখঈকে বললাম, ওয়াইল ইবন হুজর (রা.) এর হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তিনি নবী ﷺ কে তাকবীরে তাহরীমা, রুকুতে যেতে এবং রুকু থেকে ওঠতে রাফয়ে ইয়াদাইন করতে দেখেছেন।

তখন ইবরাহীম নাখঈ বললেন, ওয়াইল (রা.) যদি একবার রাফয়ে ইয়াদাইন করতে দেখেন তাহলে আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা.) পঞ্চাশ বার তা না করতে দেখেছেন। (শারহু মাআনিল আসার, খণ্ড ১, পৃ. ১৬২)

সেই ইবন মাসউদ (রা.) নবীজির সালাত কেমন ছিল তা প্রশিক্ষণ দিতে গিয়ে শুধুমাত্র তাকবীরে তাহরীমায় রাফয়ে ইয়াদাইন করলেন, অন্য কোথাও তা করলেন না। তাছাড়া ইমাম মালিক (র.) যিনি মদীনা শরীফের বাসিন্দা হয়েও রাফয়ে ইয়াদাইন করেননি। বরং তাঁর মাযহাব অনুযায়ী তা মাকরূহ। তাহলে বুঝাই যাচ্ছে যে, ইসলামের প্রাণকেন্দ্র মদীনা শরীফের বাসিন্দাগণ, খুলাফায়ে রাশিদীনের মধ্যে হযরত উমর (রা.) ও হযরত আলী (রা.)সহ অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরাম রাফয়ে ইয়াদাইন করতেন না, যা আমলে মুতাওয়ারাস অর্থাৎ সাহাবা, তাবিঈন ও তাবে তাবিঈনের ধারাবাহিক আমলে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। কথাটির স্বীকৃতি আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (র.) এর নিম্নোক্ত বক্তব্যেও পাওয়া যায়।

وقد كان فى سائر البلاد تاركون وكثير من التاركين فى المدينة فى عهد مالك (رح) وعليه بنى مختاره. (نيل الفرقدين)

-সকল শহরেই রাফয়ে ইয়াদাইন পরিত্যাগকারী লোক ছিলেন। এমনকি মদীনায়ও ইমাম মালিক (র.) এর যুগে হাত না ওঠানোর পক্ষের লোক অধিক থাকায় তিনি তাঁর মতের ভিত্তি এর উপরই রাখেন। (নায়লুল ফারকাদাইন, পৃ.২২)

ইসলামী শিক্ষার আরেক প্রাণকেন্দ্র হলো কুফা নগরী, যেখানে প্রায় পাঁচশত সাহাবায়ে কিরাম অবস্থান করতেন। কারও মতে প্রায় দেড় হাজার সাহাবায়ে কিরাম তথায় বসবাস করতেন। তন্মধ্যে বদরের যুদ্ধ ও বাইআতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবায়ে কিরামও ছিলেন। তাদের কেউই তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্য কোথাও রাফয়ে ইয়াদাইন করতেন না। যেমন ইমাম মুহাম্মদ ইবন নাসর আল মারওয়াযী (র.) তদীয় **التعليق الممجد** নামক গ্রন্থের ১ম খণ্ড ৯১নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন,

لا نعلم مصرا من الأمصار يتركوا باجماعهم رفع اليدين عند الخفض والرفع فى الصلاة الا اهل الكوفة.

-কুফাবাসী ব্যতীত আমরা অন্য এমন কোনো শহর সম্পর্কে অবগত নই যে, উক্ত শহরের পুরো বাসিন্দাই রুকুতে যাওয়ার ও রুকু থেকে ওঠার সময় রাফয়ে ইয়াদাইন ছেড়ে দিতেন। সুতরাং এটা প্রমাণিত হলো যে, কুফা শহরে বসবাসকারী সাহাবায়ে কিরাম, তাবিঈন ও তাদের পরবর্তীদের মধ্যে কেউই রাফয়ে ইয়াদাইন করতেন না। আর মদীনা শরীফসহ অন্যান্য শহরের বাসিন্দাদের মধ্যেও উক্ত আমলের (রাফয়ে ইয়াদাইন না করার) আধিক্যতার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং আহনাফ ও মালিকী মাযহাবের অনুসারীরা উক্ত আমলে মুতাওয়ারাস এর সূত্র ধরে ও নিম্নোক্ত দলীলাদির ভিত্তিতে তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত অন্যান্য স্থানে রাফয়ে ইয়াদাইন মানসূখ বা রহিত হওয়ার অভিমত পোষণ করে থাকেন।

(রাফয়ে ইয়াদাইন রহিত হওয়ার দলীল দেখুন আগামী সংখ্যায়)

[এ নিবন্ধের লেখক হযরত মাওলানা ছালিক আহমদ (র.) আমাদের মাঝে আর নেই। গত ২৪ জুন, ২০২১, বৃহস্পতিবার তিনি পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন। অসুস্থ অবস্থায় থেকেও তিনি মাসিক পরওয়ানার জন্য এ লেখা স্বহস্তে লিখে পাঠিয়েছেন। এটিই তাঁর জীবনের সর্বশেষ লেখা। তিনি একজন বিজ্ঞ আলিমে দ্বীন, প্রাজ্ঞ মুহাদ্দিস, আশিকে রাসূল ও আদর্শ মানুষ ছিলেন। তিনি সারাজীবন ইলমে দ্বীন ও ইলমে হাদীসের খিদমতে নিবেদিত ছিলেন। আল্লাহ তাঁর সকল খিদমতকে কবূল করুন এবং তাঁকে জান্নাতে উচ্চ মাকাম দান করুন। আমীন। -সম্পাদক]

মো. আনোয়ার হোসেন
প্রোপ্রাইটর

Al Arab Tailors

আল আরব
টেইলার্স
পাঞ্জাবী স্পেশালিস্ট

১১৮, করিম উল্লাহ মার্কেট (নিচ তলা)
বন্দর বাজার, সিলেট
01734-346601

কুরবানীর আহকাম ও জরুরি মাসাঈল

মো: কুতবুল আলম

কুরবানী শব্দের অর্থ ত্যাগ, উৎসর্গ, বিসর্জন, নৈকট্যলাভ ইত্যাদি। ফিকহের পরিভাষায় একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে নির্দিষ্ট পশু জবাই করাকে উদ্বহিয়্যাহ বা কুরবানী বলা হয়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে সকল যুগে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত সকল শরীআতেই কুরবানীর বিধান বিদ্যমান ছিল। তবে তা আদায়ের পন্থা এক ছিল না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنۢ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَٰمِ–

-আমি প্রত্যেক উম্মতের জন্য কুরবানীর বিধান দিয়েছি। আল্লাহ তাদেরকে জীবনোপকরণ স্বরূপ যে সকল চতুস্পদ জন্তু দিয়েছেন সেগুলোর উপর যেন তারা (জবাই করার সময়) আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে। (সূরা হাজ্জ, আয়াত-৩৪)

নেক আমলসমূহের মধ্যে কুরবানী অন্যতম আমল। রাসূলে আকরাম ﷺ এটি গুরুত্ব সহকারে আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। সামর্থবান নর-নারীর উপর এটি ওয়াজিব। এটি মৌলিক ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো কুরবানী তরক করেননি বরং সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি কুরবানী করে না এরূপ ব্যক্তিকে কঠোর সতর্ক করেছেন।

আলোচ্য নিবন্ধে কুরবানীর কতিপয় জরুরি মাসাঈল সম্পর্কে আলোচনার প্রয়াস পাব, যাতে করে কুরবানী সংক্রান্ত বিধি-বিধান সম্পর্কে অবগত হয়ে এ গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত একমাত্র আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে সম্পাদন করা সম্ভব হয়।

কুরবানী করা সামর্থবানদের উপর ওয়াজিব

মহান আল্লাহ উম্মতে মুহাম্মাদীর উপর কুরবানী ওয়াজিব করে দিয়েছেন। কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার দলীল হচ্ছে আল্লাহ তাআলার নির্দেশ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ–

-সুতরাং আপনি আপনার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে নামায আদায় করুন এবং পশু কুরবানী করুন। (সূরা কাওসার, আয়াত-০২)

আয়াতের আলোকে উলামায়ে কিরাম বলেন, কুরবানী ওয়াজিব। তাছাড়া হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন,

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مَن كان له سَعَة، ولَمْ يُضَحِّ، فلا يَقْرَبَنّ مُصَلّانا– [رواه ابن ماجه وأحمد]

-হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি সামর্থ থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করে না সে যেন আমাদের ঈদগাহে না আসে। (ইবনু মাজাহ, মুসনাদ আহমদ)

যারা কুরবানী পরিত্যাগ করে তাদের প্রতি এ হাদীস একটি সতর্কবাণী। যদি কুরবানী করা সুন্নাত বা নফল হত অথবা ঐচ্ছিক কোন বিষয় হত তবে রাসূল ﷺ এরূপ ধমকের দ্বারা উম্মতকে সাবধান করতেন না। এরূপ ধমক সুন্নাতের ক্ষেত্রে আসে না, কেবল ওয়াজিবের ক্ষেত্রেই আসে। রাসূল ﷺ আরো বলেন,

عَنْ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ كُنَّا وُقُوفًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَةَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةً وَعَتِيرَةً. (رواه ابن ماجه)

-হযরত মিখনাফ বিন সুলাইম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা আরাফার ময়দানে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকটে বসা অবস্থায় ছিলাম এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, হে মানব সকল! প্রত্যেক পরিবারের উপর আবশ্যক হল প্রতি বছর কুরবানী ও আতীরা আদায় করা। (আতীরা হলো রাজাবিয়্যাহ অর্থাৎ রজব মাসের প্রথম দিকে যে পশু জবাই করা হয় তাকে আতীরা বলা হয়। এটির বিধান পরবর্তীতে রহিত হয়েছে।) (ইবনু মাজাহ, বাবুল আদাহী ওয়াজিবাতুন হিয়া আম লা)

উপরোক্ত পবিত্র কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনার আলোকে ইমাম আযম আবূ হানীফাসহ ইমাম মুহাম্মাদ, ইমাম যুফার, ইমাম রাবীয়া, ইমাম আওযায়ী, ইমাম লাইস বিন সাআদ, সুফিয়ান সাওরী প্রমুখের মতে এবং ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমাদ (র.) থেকে বর্ণিত একটি মতানুসারে কুরবানী ওয়াজিব। ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ এর অপর মতানুসারে এবং ইমাম শাফিঈ (র.) এর মতে কুরবানী সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। কিন্তু তারা আবার বলেন, সামর্থ্য থাকা অবস্থায় কুরবানী পরিত্যাগ করা মাকরূহ। যদি কোনো জনপদের লোকেরা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সম্মিলিতভাবে কুরবানী পরিত্যাগ করে তবে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হবে। কেননা, কুরবানী হল ইসলামের একটি শিআর বা মহান নিদর্শন।

বর্তমান সময়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মাযহাব অস্বীকারকারী ব্যক্তির বক্তব্য পাওয়া যায় যে, 'সম্পদশালী হওয়ার পরেও যদি কুরবানী না করে তবে তার কোন পাপ হবে না। কুরবানী হচ্ছে নেকীর কাজ, করলে নেকী পাবে, না করলে পাবে না। এমনকি কোটিপতিও যদি কুরবানী না দেয় কোন সমস্যা নেই।' এরূপ বক্তব্য স্পষ্টত ভ্রান্ত, পথভ্রষ্টতা এবং গোমরাহী। এ বক্তব্য দ্বারা পক্ষান্তরে কুরআন কারীমের আয়াত ও নবী করীম ﷺ এর অনেক হাদীসকে অস্বীকার করা হয়ে থাকে।

কুরবানীর পরিবর্তে সাদকাহ দেওয়া

কুরবানী না করে তার সমপরিমাণ টাকা সাদকাহ করে দিলে কুরবানী আদায় হবে না। কুরবানী ব্যতীত অন্যান্য কোন সাদকাহ কুরবানীর সমকক্ষ হবে না। এমনকি কেউ যদি একটি জীবিত বকরী অথবা এর মূল্য কুরবানীর দিনসমূহে কাউকে দান করে দেয় তবুও তার উপর থেকে কুরবানীর আবশ্যকতা রহিত হবে না, তাকে অবশ্যই কুরবানী করতে হবে যেহেতু এটা তার উপর ওয়াজিব। আর কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি পশুর রক্ত প্রবাহিত করার সাথে সম্পর্কিত। কুরবানী অন্যান্য সকল সাদকাহ হতে উত্তম, কেননা ইহা ইসলামের অন্যতম একটি নিদর্শন এবং ওয়াজিব আমল।

কুরবানী যাদের উপর ওয়াজিব

জীবিকা নির্বাহের আবশ্যকীয় উপকরণ যেমন- বসবাসের ঘর, পরিধেয় বস্ত্র, খাদ্য দ্রব্য এবং ঘরের সরঞ্জামাদি ও অন্যান্য মৌলিক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ব্যতীত ঋণ আদায়ের পর কোন স্বাধীন, জ্ঞানবান, প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমান নর-নারী যদি সাড়ে বায়ান্ন ভরি রুপা (প্রায় ৬১৩ গ্রাম) অথবা সাড়ে সাত ভরি সোনা (প্রায় ৮৮ গ্রাম) কিংবা এর যে কোনো একটির সমমূল্যের নগদ টাকা বা ব্যবসায়িক মাল বা অন্যান্য সম্পদের মালিক হয় তবে এ মালকে

শরীআতের পরিভাষায় 'যাকাতের নিসাব' বলা হয়। এক্ষেত্রে বর্তমান হিসাবে যেহেতু স্বর্ণের মূল্য থেকে রৌপ্যের মূল্য অনেক কম সেহেতু রৌপ্যের মূল্যই ধর্তব্য হবে। যদি কারো নিকট কিছু পরিমাণ প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যবসার মাল, নগদ টাকা, স্বর্ণ ও রৌপ্য থাকে এবং কোনটাই পৃথকভাবে নিসাব পরিমাণ না হয় তবে এগুলোর সম্মিলিত মূল্য যদি সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্যের মূল্যের সমপরিমাণ হয় (বর্তমান বাজারমূল্যে এটি ৫০ হাজার টাকা প্রায়) তবে এতে নিসাব পূর্ণ হবে।

যে ব্যক্তি উপরে উল্লিখিত পরিমাণ মালের মালিক তাকে মালিকে নিসাব বা সাহিবে-নিসাব বলা হয়। টাকা-পয়সা, সোনা-রুপা, অলঙ্কার, বসবাস ও খোরাকির প্রয়োজনে আসে না এমন জমি, প্রয়োজনের অতিরিক্ত বাড়ি, ব্যবসায়িক পণ্য ও অপ্রয়োজনীয় সকল আসবাবপত্র কুরবানীর নেসাবের ক্ষেত্রে হিসাবযোগ্য। অবশ্য এ মাল ঋণমুক্ত এবং তার মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত হতে হবে। যে ব্যক্তি ১০ যিলহজ্জ ফজর থেকে ১২ যিলহজ্জ সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে এ পরিমাণ মালের মালিক থাকবে তার উপর তার নিজের পক্ষ হতে কুরবানী আদায় করা আবশ্যক। কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার জন্য যাকাতের অনুরূপ নিসাব পরিমাণ সম্পদ পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয় বরং কেবল ১০ যিলহজ্ব থেকে ১২ যিলহজ্ব পর্যন্ত যে কোনো দিন উপরোক্ত পরিমাণ মালের মালিক থাকলেই কুরবানী ওয়াজিব হবে। যার উপর সাদাকাতুল ফিতর ওয়াজিব, তার উপর কুরবানীও ওয়াজিব।

একান্নভুক্ত পরিবারের মধ্যে একাধিক ব্যক্তির উপর কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার শর্ত পাওয়া গেলে অর্থাৎ তাদের প্রত্যেকের কাছে পৃথকভাবে নেসাব পরিমাণ সম্পদ থাকলে তাদের প্রত্যেকের উপর ভিন্ন ভিন্ন কুরবানী ওয়াজিব। পরিবারের যত সদস্যের উপর কুরবানী ওয়াজিব তাদের প্রত্যেককেই একটি করে পশু কুরবানী করতে হবে কিংবা বড় পশুতে পৃথক পৃথক অংশ দিতে হবে। একটি কুরবানী সকলের জন্য যথেষ্ট হবে না। কুরবানী শুধু নিজের পক্ষ থেকে ওয়াজিব হয়। অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান-সন্ততি বা যে সকল সম্পদশালী ব্যক্তি তাদের খাদেম বা চাকর বাকরের পৃষ্ঠপোষকতা ও ভরণ-পোষণ করেন তাদের পক্ষ থেকে অথবা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে একজন সম্পদশালী হলে অন্য জনের পক্ষ হতে বা সন্তান তার মা-বাবার পক্ষ থেকে কুরবানী দেওয়া ওয়াজিব নয়। কোন মহিলাকে দেওয়া নগদ মোহর যদি নিসাব পরিমান হয় তবে ঐ মহিলার উপর কুরবানী ওয়াজিব। কুরবানী ওয়াজিব এমন ব্যক্তিও ঋণের টাকা দিয়ে কুরবানী করলে ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। তবে সুদের উপর ঋণ নিয়ে কুরবানী করা যাবে না। যেসকল হাজী কুরবানীর দিনগুলোতে মুসাফির থাকবে তাদের উপর ঈদুল আদহার কুরবানী ওয়াজিব নয়। কিন্তু যে হাজী কুরবানীর কোনো দিন মুকীম থাকবে সামর্থ্যবান হলে তার উপর ঈদুল আদহার কুরবানী করা জরুরি হবে। এটি সে নিজ এলাকায়ও করতে পারবে। কুরবানী করতে হবে সম্পূর্ণ হালাল সম্পদ থেকে। হারাম টাকা দ্বারা কুরবানী করা সহীহ নয় এবং এক্ষেত্রে অন্য শরীকদের কুরবানীও সহীহ হবে না।

কুরবানীর মেয়াদকাল ও কুরবানী করার উত্তম সময়

কুরবানী নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সম্পর্কিত একটি ইবাদত। এ সময়ের পূর্বে যেমন কুরবানী আদায় হবে না তেমনি পরে করলেও আদায় হবে না। কুরবানীর সময়কাল মাত্র তিনদিন। এ দিনগুলো হলো- ১০, ১১ ও ১২ই যিলহজ্জ। উক্ত দিনগুলোর মধ্যে প্রথম দিন অর্থাৎ ১০ই যিলহজ্জ কুরবানী করা অধিক উত্তম। এরপর দ্বিতীয় দিন, এরপর তৃতীয় দিন। তবে এই তিন দিনের যে দিন ইচ্ছা কুরবানী করা যাবে। অতএব কোন কারণ ব্যতিত বিলম্ব না করা উত্তম। কুরবানীর তিনদিনের মধ্যে যে দুটি রাত অন্তর্ভুক্ত, সেই দুই রাতে অর্থাৎ ১০ ও ১১ তারিখ দিবাগত রাতেও কুরবানী করা জায়িয। তবে দিনে কুরবানী করাই ভালো। রাতের বেলা জবাই করতে আলো স্বল্পতার দরুণ জবাইয়ে ত্রুটি হতে পারে বিধায় রাতে জবাই করা অনুত্তম। তবে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা থাকলে কোনো অসুবিধা নেই। কুরবানীদাতা এক স্থানে আর কুরবানীর পশু ভিন্ন স্থানে থাকলে কুরবানীদাতার ঈদের নামায পড়া বা না পড়া ধর্তব্য নয়; বরং পশু যে এলাকায় আছে ওই এলাকায় ঈদের জামাআত হয়ে গেলে পশু জবাই করা যাবে।

প্রথম দিন কখন থেকে কুরবানী করা যাবে

যেসব এলাকার লোকদের উপর ঈদের নামায ওয়াজিব তাদের জন্য প্রথম দিন ১০ই যিলহজ্জ ঈদের নামাযের আগে কুরবানী করা জায়েয নয়। অবশ্য বৃষ্টিবাদল বা অন্য কোনো ওজরে যদি প্রথম দিন ঈদের নামায পড়া না হয় তাহলে ঈদের নামাযের সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর প্রথম দিনেও কুরবানী করা জায়িয। প্রথম দিন কখন থেকে কুরবানী করা যাবে এ বিষয়ে সহীহ বুখারী ও মুসলিম উভয় কিতাবে হযরত বারা বিন আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ আছে নবী করীম ﷺ বলেন,

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ–

-যে ব্যক্তি ঈদের নামাযের পূর্বে কুরবানীর পশু জবাই করবে সেটা তার নিজের জন্য সাধারণ জবাই হবে। আর যে নামায ও খুতবার পর জবাই করবে তার কুরবানী পূর্ণ হবে এবং সে-ই মুসলমানদের রীতি অনুসরণ করেছে। (সহীহ বুখারী, বাবুন ফী উদ্বহিয়্যাতিন নাবীয়্যি ﷺ... ও সহীহ মুসলিম, কিতাবুল আদ্বাহী বাবু ওয়াকতিহা)

যথাসময়ে কুরবানী করতে না পারলে

কেউ যদি কুরবানীর দিনগুলোতে ওয়াজিব কুরবানী দিতে না পারে তাহলে কুরবানীর পশু ক্রয় না করে থাকলে তার উপর কুরবানীর উপযুক্ত একটি ছাগলের মূল্য সাদকাহ করা ওয়াজিব। আর যদি পশু ক্রয় করে ছিল, কিন্তু কোনো কারণে কুরবানী দেওয়া হয়নি তাহলে ঐ পশু জীবিত সাদকাহ করে দিতে হবে। তবে যদি (সময়ের পরে) জবাই করে ফেলে তাহলে পুরো গোশত সাদকাহ করে দিতে হবে। এক্ষেত্রে গোশতের মূল্য যদি জীবিত পশুর চেয়ে কমে যায় তাহলে যে পরিমাণ মূল্য হ্রাস পেল তাও সাদকাহ করতে হবে।

এক পশুতে কয়েকজন শরীক হয়ে কুরবানী

একটি ছাগল, ভেড়া বা দুম্বা দ্বারা শুধু একজনই কুরবানী দিতে পারবে। এমন একটি পশু কয়েকজন মিলে কুরবানী করলে কারো কুরবানীই সহীহ হবে না। আর উট, গরু, মহিষে সর্বোচ্চ সাত জন শরীক হতে পারবে। সাতের অধিক শরীক হলে কারো কুরবানী সহীহ হবে না। হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে-

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ–[رواه مسلم]

-হযরত জাবির (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা হুদাইবিয়াতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে ছিলাম। তখন আমরা উট ও গরু দ্বারা সাতজনের পক্ষ থেকে কুরবানী দিয়েছি। (সহীহ মুসলিম, বাবুল ইশরাকি ফীল হাদয়ী...)

উল্লেখ্য যে ইমাম তিরমিযী (র.) উক্ত হাদীস উল্লেখ করার পর বলেন,

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ–

হাদীসটি হাসান ও সহীহ, আর শরীক হয়ে কুরবানী করার এ বিষয়টি আহলে ইলম তথা নবী করীম ﷺ এর সাহাবায়ে কিরাম ও অন্যান্যদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এটি সুফিয়ান সাওরী, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমদ ও ইসহাক (র.) এর অভিমত।

এ বিষয়ে হাদীসের কিতাবসমূহে আরো অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। যা থেকে বুঝা যায়, কয়েকজন মিলে শরীক হয়ে কুরবানী করার এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রমাণিত এবং এটি হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশনা। এর উপর আমল করে আসছেন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সাহাবায়ে কিরাম ও যুগে যুগে তাদের অনুসারী প্রায় সকল মাযহাবের ইমাম ও মুজতাহিদগণ। এটিই হযরত আলী, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হযরত আয়িশা (রা.) এর অভিমত, আর এটিই হচ্ছে ইমাম আযম আবূ হানীফা, ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমাদ, সুফিয়ান সাওরী, আওযাঈ, হাসান বসরী, আমর বিন দিনার, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারাক, ইসহাক, সালিম, আতা, তাউস (র.) এর অভিমত।

কোন ব্যক্তি যদি দাবী করেন, 'একটা গরুতে সাত ভাগ হওয়ার ব্যাপারে কোন হাদীস নেই' তবে এরূপ বক্তব্য স্পষ্ট গোমরাহী। এ বক্তব্য দ্বারা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনেক হাদীসকে শুধু অস্বীকার করা হয়নি বরং সাহাবায়ে কিরাম ও উম্মতে মুসলিমার বিখ্যাত ইমাম ও মুজতাহিদগণকে হেয় প্রতিপন্ন করা হবে।

সাতজনে মিলে কুরবানী করলে কুরবানী জায়িয হওয়ার জন্য শর্ত হলো কারো অংশ এক সপ্তমাংশের কম হতে পারবে না। যেমন কারো আধা ভাগ, কারো দেড়ভাগ। এমন হলে কোনো শরীকের কুরবানীই সহীহ হবে না। যদি কেউ আল্লাহ তাআলার হুকুম পালনের উদ্দেশ্যে কুরবানী না করে শুধু গোশত খাওয়ার নিয়তে কুরবানী করে তাহলে তার কুরবানী সহীহ হবে না। তাকে অংশীদার বানালে শরীকদের কারো কুরবানী হবে না। তাই অত্যন্ত সতর্কতার সাথে শরীক নির্বাচন করতে হবে। শরীকদের কারো পুরো বা অধিকাংশ উপার্জন যদি হারাম হয় তাহলে কারো কুরবানী সহীহ হবে না। যদি কেউ গরু, মহিষ বা উট একা কুরবানী দেওয়ার নিয়তে কিনে আর সে ধনী হয় তাহলে ইচ্ছা করলে অন্যকে শরীক করতে পারবে। তবে এক্ষেত্রে একা কুরবানী করাই শ্রেয়। শরীক করলে সে টাকা সাদকাহ করে দেওয়া উত্তম। আর যদি ওই ব্যক্তি এমন গরীব হয়, যার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব নয়, তাহলে যেহেতু কুরবানীর নিয়তে পশুটি ক্রয় করার মাধ্যমে লোকটি তার পুরোটাই আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করে নিয়েছে তাই তার জন্য এ পশুতে অন্যকে শরীক করা জায়িয নয়। এমন গরীব ব্যক্তি যদি কাউকে শরীক করতে চায় তাহলে পশু ক্রয়ের সময়ই নিয়ত করে নিবে। কয়েকজন মিলে কুরবানী করার ক্ষেত্রে জবাইয়ের আগে কোনো শরীকের মৃত্যু হলে তার ওয়ারিসরা যদি মৃতের পক্ষ থেকে কুরবানী করার অনুমতি দেয় তবে তা জায়িয হবে। নতুবা ওই শরীকের টাকা ফেরত দিতে হবে। অবশ্য তার স্থলে অন্যকে শরীক করা যাবে।

কুরবানীর পশুতে আকীকা ও হজ্জের কুরবানীর নিয়তে শরীক হওয়া

এক কুরবানীর গরু, মহিষ বা উটে আকীকার নিয়তে শরীক হতে পারবে। এক বা একাধিক আকীকাও করা যেতে পারে। এতে কুরবানী ও আকীকা দুটোই সহীহ হবে। অনুরূপভাবে এক কুরবানীর পশুতে আকীকা ও হজ্জের কুরবানীর নিয়তও করা যাবে। এতে প্রত্যেকের নিয়তকৃত ইবাদত আদায় হয়ে যাবে তবে এ পশু হেরেম এলাকায় জবাই করতে হবে। অন্যথায় হজ্জের কুরবানী আদায় হবে না।

শৈশবে আকীকা করা না হলে বড় হওয়ার পরও আকীকা করা যাবে। যার আকীকা সে নিজে এবং তার মা-বাবাও আকীকার গোশত খেতে পারবে। কেউ কেউ কুরবানীর পশুর সাথে আকীকা দিলে আকীকা সহীহ হবে না বলে মত দেন, কিন্তু নির্ভরযোগ্য আলিমগণ এ মতটি গ্রহণ করেননি। কোনো হাদীসে কুরবানীর সাথে আকীকা করতে নিষেধ করা হয়নি; বরং কুরবানীর সাথে হজ্জের কুরবানী, জরিমানা দম একত্রে এক পশুতে দেওয়ারও প্রমাণ আছে। অর্থাৎ কুরবানীর পশুতে অন্য ইবাদতের নিয়তে শরীক হওয়া জায়িয। সুতরাং আকীকার নিয়তে শরীক হওয়াও জায়িয। আতা ইবনে আবী রাবাহ (রা.) বলেন, উট-গরু সাতজনের পক্ষ হতে কুরবানী হতে পারে। আর এতে শরীক হতে পারে কুরবানীকারী, তামাত্তু হজ্জকারী এবং হজ্জের ইহরাম গ্রহণের পর হজ্জ আদায়ে অপারগ ব্যক্তি। এছাড়া ফাতাওয়ায়ে শামীসহ অন্যান্য কিতাবাদিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, কুরবানীর সাথে আকীকা সহীহ। (রদ্দুল মুহতার, হাশিয়াতুত তাহতাবী)

কুরবানীর পশু হারিয়ে গেলে, চুরি হয়ে গেলে বা মরে গেলে

কুরবানীর পশু যদি হারিয়ে যায়, চুরি হয়ে যায় বা মরে যায় আর কুরবানীদাতার উপর পূর্ব থেকে কুরবানী ওয়াজিব থাকে তাহলে আরেকটি পশু কুরবানী করতে হবে। গরীব হলে (যার উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়) তার জন্য আরেকটি পশু কুরবানী করা ওয়াজিব নয়।

কুরবানীর পশু হারিয়ে যাওয়ার পরে যদি আরেকটি কেনা হয় এবং পরে হারানোটিও পাওয়া যায় তাহলে কুরবানীদাতা ধনী হলে দুটির একটি কুরবানী করলেই চলবে। তবে দুটি কুরবানী করাই উত্তম। উল্লেখ্য যে, গরীব ব্যক্তির ক্রয়কৃত পশু হারিয়ে গেলে তার জন্য আরেকটি পশু কুরবানী করা আবশ্যকীয় নয়, তারপরও যদি সে আরেকটি পশু কুরবানীর জন্য কিনে ফেলে তবে সেটি জবাই করা জরুরি হয়ে যায় এবং হারানোটি পাওয়া গেলে তাও জবাই করতে হবে। তবে যদি গরীব ব্যক্তি দ্বিতীয় পশু খরিদ করার সময় এ নিয়ত করে যে, যে পশুটি হারানো গেছে তার বদলে এটি খরিদ করছি, তাহলে একটিই যথেষ্ট হবে।

জবাইয়ের আগে কুরবানীর পশু থেকে উপকৃত হওয়া

কুরবানীর পশু কেনার পর বা নির্দিষ্ট করার পর তা থেকে উপকৃত হওয়া জায়েয নয়। যেমন হালচাষ করা, আরোহণ করা, পশম কাটা ইত্যাদি। সুতরাং কুরবানীর পশু দ্বারা এসব করা যাবে না। যদি করে তবে পশমের মূল্য, হালচাষের মূল্য ইত্যাদি সাদকাহ করে দিবে। কুরবানীর পশুর দুধ পান করা যাবে না। যদি জবাইয়ের সময় আসন্ন হয় আর দুধ দোহন না করলে পশুর কষ্ট হবে না বলে মনে হয় তাহলে দোহন করবে না। প্রয়োজনে ওলানে ঠান্ডা পানি ছিটিয়ে দেবে। এতে দুধের চাপ কমে যাবে। যদি দুধ দোহন করে ফেলে তাহলে তা সাদকাহ করে দিতে হবে। নিজে পান করে থাকলে মূল্য সাদকাহ করে দিবে। কুরবানীর পশু বাচ্চা দিলে ওই বাচ্চা জবাই না করে জীবিত সাদকাহ করে দেওয়া উত্তম। যদি সাদকাহ না করে তবে কুরবানীর পশুর সাথে বাচ্চাকেও জবাই করবে এবং গোশত সাদকাহ করে দিবে। কুরবানীর পশু বিক্রয় করা উচিত নয়। যদি কেউ বিক্রয় করে কম মূল্যে অন্য পশু খরিদ করে কুরবানী করে তবে বিক্রিত পশু থেকে যা লাভ আসবে তা সাদকাহ করে দিতে হবে।

অন্যের পক্ষ থেকে কুরবানী

মৃতের পক্ষ থেকে ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে কুরবানী করা জায়িয বরং সাওয়াবের কাজ। এতে মৃতের রূহে সাওয়াব পৌঁছে। কুরবানী একটি সাদকাহ। আর মৃত ব্যক্তির নামে যেমন সাদকাহ করা যায় তেমনি তার নামে কুরবানীও দেওয়া যায়। কুরবানীর দিনে মৃত ব্যক্তির জন্য টাকা পয়সা সাদকাহ করার চেয়ে তার পক্ষ থেকে কুরবানী করে সাওয়াব পৌঁছানো উত্তম। সম্পদশালী ব্যক্তি পশু খরিদ করে যদি মৃত ব্যক্তির নামে কুরবানী করে দেয় তাতে মৃত ব্যক্তি সাওয়াব পাবে কিন্তু এ দ্বারা তার নিজের কুরবানী আদায় হবে না। তাকে অন্য পশু কুরবানী করে তার নিজের ওয়াজিব কুরবানী আদায় করতে হবে। মৃত ব্যক্তি যদি ওসিয়ত না করে থাকে তবে সেটি নফল কুরবানী হিসেবে গণ্য হবে। কুরবানীর স্বাভাবিক গোশতের মতো তা নিজেরাও খেতে পারবে এবং আত্মীয়-স্বজনকেও দিতে পারবে। আর যদি মৃত ব্যক্তি কুরবানীর ওসিয়ত করে গিয়ে থাকে তবে এর গোশত

নিজেরা খেতে পারবে না। গরীব-মিসকীনদের মাঝে সাদকাহ করে দিতে হবে।

যেমনিভাবে মৃতের পক্ষ থেকে ঈসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে কুরবানী করা জায়িয তদ্রুপ জীবিত ব্যক্তির পক্ষ থেকে তার ঈসালে সাওয়াবের জন্য নফল কুরবানী করা জায়িয। এ কুরবানীর গোশত দাতা ও তার পরিবারও খেতে পারবে। বিদেশে অবস্থানরত ব্যক্তির জন্য নিজ দেশে বা অন্য কোথাও কুরবানী করা জায়িয।

অন্যের ওয়াজিব কুরবানী দিতে চাইলে ওই ব্যক্তির অনুমতি নিতে হবে। অনুমতি নিলে এর দ্বারা ওই ব্যক্তির কুরবানী আদায় হয়ে যাবে। নতুবা ওই ব্যক্তির কুরবানী আদায় হবে না। অবশ্য স্বামী বা পিতা যদি স্ত্রী বা সন্তানের বিনা অনুমতিতে তার পক্ষ থেকে কুরবানী করে তাহলে তাদের কুরবানী আদায় হয়ে যাবে। তবে অনুমতি নিয়ে আদায় করা ভালো।

নবী করীম ﷺ এর পক্ষ থেকে কুরবানী করা

সামর্থ্যবান ব্যক্তির রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পক্ষ থেকে কুরবানী করা উত্তম। এটি বড় সৌভাগ্যের বিষয়ও বটে। নবী কারীম ﷺ আলী (রা.) কে তার পক্ষ থেকে কুরবানী করার ওসীয়ত করেছিলেন। তাই তিনি প্রতি বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পক্ষ থেকেও কুরবানী দিতেন।

জবাই সংক্রান্ত মাসআলা

ধারালো অস্ত্র দ্বারা কুরবানীর পশু জবাই করা উত্তম। কুরবানীর পশু নিজ হাতে জবাই করা মুস্তাহাব। রাসূলুল্লাহ ﷺ ষাটের অধিক উট নিজ হাতে কুরবানী করেছিলেন। পরে তিনি হযরত আলীকে ছুরি দিয়েছেন, তিনি বাকীগুলো কুরবানী করেছেন। যদি নিজে জবাই করতে না পারে, তবে অন্যকে দিয়েও জবাই করাতে পারবে। এক্ষেত্রে কুরবানীদাতা পুরুষ হলে জবাইস্থলে তার উপস্থিত থাকা ভালো। মেয়েরা পর্দার ব্যাঘাত হয় বলে যদি সামনে উপস্থিত না থাকতে পারে, তবে তাতে কোনো ক্ষতি নেই। কুরবানী করার সময় মুখে নিয়ত করা ও দুআ উচ্চারণ করা জরুরি নয়। শুধু মনে চিন্তা করে নিয়ত করে মুখে শুধু 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলে জবাই করলে তার কুরবানীও জায়িয হবে। কিন্তু স্মরণে থাকলে জায়িয হলেও নিয়ত ও দুআ পড়া বেশি উত্তম। জবাইয়ে একাধিক ব্যক্তি শরীক হলে অনেক সময় জবাইকারীর জবাই পুরোপুরী সম্পন্ন হয় না, তখন কসাই বা অন্য কেউ জবাই সম্পন্ন করে থাকে। এক্ষেত্রে অবশ্যই উভয়কেই নিজ নিজ জবাইয়ের আগে 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' পড়তে হবে। যদি কোনো একজন না পড়ে তবে ওই কুরবানী সহীহ হবে না এবং জবাইকৃত পশুও হালাল হবে না। জবাইয়ের পর পশু নিস্তেজ হওয়ার আগে চামড়া খসানো বা অন্য কোনো অঙ্গ কাটা মাকরূহ। এক পশুকে অন্য পশুর সামনে জবাই করবে না। জবাইয়ের সময় প্রাণীকে প্রয়োজনের অধিক কষ্ট দিবে না।

কুরবানীর গোশত খাওয়া ও বণ্টন

কুরবানীদাতার জন্য নিজ কুরবানীর গোশত খাওয়া মুস্তাহাব। এ বিষয়ে নিম্নোক্ত দুটি আয়াতে আল্লাহ তাআলা নির্দেশনা প্রদান করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ– [الحج]، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ–[الحج]

-অতঃপর তোমরা উহা হতে আহার কর এবং দুস্থ, অভাবগ্রস্তকে আহার করাও। (সূরা হাজ্জ, আয়াত-২৮), -যখন উহারা কাত হয়ে পড়ে যায় তখন তোমরা উহা হতে আহার কর এবং আহার করাও ধৈর্যশীল অভাবগ্রস্থকে এবং সাহায্যপ্রার্থী অভাবগ্রস্থকে। (সূরা হাজ্জ, আয়াত-৩৬)

এছাড়াও নিম্নোক্ত হাদীসে নবী করীম ﷺ নির্দেশনা প্রদান করেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ضَحَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ] أخرجه أحمد]

-হযরত আবু হুরাইরা (রা.) থেকে নবী করীম ﷺ বলেন, তোমাদের কোন ব্যক্তি যখন কুরবানী করবে তখন সে যেন তার কুরবানীর গোশত আহার করে। (মুসনাদু আহমদ, মুসনাদু আবূ হুরাইরা)

ঈদুল আদহার দিন সম্ভব হলে সর্বপ্রথম নিজ কুরবানীর গোশত দিয়ে খানা শুরু করা সুন্নাত। অর্থাৎ সকাল থেকে কিছু না খেয়ে প্রথমে কুরবানীর গোশত খাওয়া সুন্নাত। এই সুন্নাত শুধু ১০ যিলহজ্জের জন্য। ১১ বা ১২ তারিখের গোশত দিয়ে খানা শুরু করা সুন্নাত নয়। কুরবানীর গোশত তিনদিনেরও অধিক জমিয়ে রেখে খাওয়া জায়িয। কুরবানীর গোশত ফ্রিজে রাখা বা প্রক্রিয়াজাত করে রাখা জায়িয। কুরবানীর গোশত হিন্দু ও অন্য ধর্মাবলম্বীকে দেওয়া জায়িয। শরীকে কুরবানী করলে ওজন করে গোশত বণ্টন করতে হবে। অনুমান করে ভাগ করা জায়িয নয়। কুরবানীর গোশতের এক তৃতীয়াংশ গরীব-মিসকীনকে সাদকাহ করে দিবে এবং এক তৃতীয়াংশ দ্বারা আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীকে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করবে এবং অবশিষ্ট এক তৃতীয়াংশ নিজের জন্য রাখবে। কুরবানীর গোশত গরীব ধনী সকলকে দান করতে পারবে। অবশ্য পুরো গোশত যদি নিজে রেখে দেয় তাতেও কোনো অসুবিধা নেই। কুরবানীর গোশত, চর্বি ইত্যাদি বিক্রি করা জায়িয নয়। বিক্রি করলে পূর্ণ মূল্য সাদকাহ করে দিতে হবে।

কুরবানীর চামড়া

কুরবানীর চামড়া কুরবানীদাতা নিজে ব্যবহার করতে পারবে। এই চামড়া ধনী বা গরীব যে কাউকে হাদিয়া হিসাবেও দিতে পারবে। তবে কেউ যদি নিজে ব্যবহার না করে বিক্রি করে তবে বিক্রিয়লব্ধ মূল্য পুরোটা সাদকাহ করা জরুরি। কুরবানীর পশুর চামড়া বিক্রি করলে মূল্য সাদকাহ করে দেওয়ার নিয়তে বিক্রি করবে। সাদকাহর নিয়ত না করে নিজের খরচের নিয়ত করা নাজায়িয ও গুনাহ। নিয়ত যাই হোক বিক্রিয়লব্ধ অর্থ পুরোটাই সাদকাহ করে দেওয়া জরুরি। কুরবানীর চামড়ার প্রাপ্য হল সমাজের গরীব মিসকিন, শুধুমাত্র যারা যাকাত পাওয়ার উপযুক্ত। কুরবানীর চামড়ার টাকা দিয়ে মসজিদ, মাদরাসা, ঈদগাহ নির্মাণ করা বা মেরামত করা অথবা জনহিতকর কোন কাজ করা যেমন রাস্তাঘাট ও ব্রীজ নির্মাণ ও মেরামত জায়িয নেই।

জবাইকারী বা কাজের লোককে পারিশ্রমিক

কুরবানীর পশু জবাই করে বা এ সংক্রান্ত অন্যান্য কাজে অংশগ্রহণ করে পারিশ্রমিক দেওয়া-নেওয়া জায়িয। তবে জবাইকারী, কসাই বা কাজে সহযোগিতাকারীকে কুরবানীর পশুর গোশত, চামড়া বা কোনো কিছু পারিশ্রমিক হিসেবে দেওয়া যাবে না। অবশ্য এ সময় ঘরের অন্যান্য সদস্যদের মতো জবাইকারী বা কাজের লোকদেরকে গোশত খাওয়ানো যাবে। এবং নির্ধারিত পারিশ্রমিক দেওয়ার পর পূর্বচুক্তি ছাড়া হাদিয়া হিসেবে গোশত বা তরকারী দেওয়া যাবে।

হযরত শাহজালাল (র.) : জীবন ও কর্ম

সিদ্দীকুর রহমান চৌধুরী

ইতিহাসের পাতায় এটা স্পষ্ট যে সুদীর্ঘ আট শতাব্দীব্যাপি মুসলিম রাজন্যবর্গ দিল্লি আগ্রার সুরম্য মসনদে সগৌরবে সমাসীন ছিলেন। ক্রমানুগতিক ধারায় প্রবল প্রতাপশালী মুসলমান বাদশাহগণ দিল্লির মসনদ অলংকৃত করে অতি শানশওকতেই রাজদণ্ড পরিচালনা করেন। অপর দিকে আধ্যাত্মিক রাজ্যের তখতে সমাসীন হয়ে দিল্লি-আগ্রা-আজমীরে আস্তানা গেড়েছিলেন সুলতানুল হিন্দ গরীবে নেওয়াজ হযরত খাজা মুঈনুদ্দীন চিশতী (র.), শাহ নিযামুদ্দীন (র.), হযরত কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (র.) প্রমুখ সাধক, যারা সাধন জগতে উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় জ্যোতিষ্মান।

পরাক্রমশালী বাদশাহদের সুদীর্ঘ শাসন, আউলিয়ায়ে কিরামের পদচারণা সত্ত্বেও দিল্লি-আগ্রা-আজমীরের তুলনায় উপমহাদেশের দুর্গম পূর্বাঞ্চলীয় সুদূর বাংলাদেশ বিভাগ পূর্বকালীন সময়েও তুলনামূলকভাবে মসজিদ, মাদরাসা, খানকাসহ মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠই ছিল। দুর্ভেদ্য অরণ্য-ঘনজঙ্গল পেরিয়ে সুলতান বাদশাহদের অভিযান প্রতিকূলতার মুখে পুরোপুরি কার্যকরী না হওয়া সত্ত্বেও এ অঞ্চলে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্যিই বিস্ময়কর।

আধ্যাত্মিক রাজ্যে বিচরণকারী আউলিয়ায়ে কিরাম নির্বিঘ্নে মাওলার সান্নিধ্য কামনায় ও দ্বীনে মুহাম্মাদী তাবলীগের জন্য দুর্ভেদ্য নিভৃত জনপদকেই বেছে নিতেন। সুলতান-বাদশাহদের আড়ম্বরপূর্ণ জীবনের কল্লোল ধ্বনি ও যুদ্ধে উন্মুক্ত অশ্বের পদধ্বনি যেখানে পৌঁছতে ব্যর্থ সেই কোলাহলহীন অঞ্চলেই তাঁরা টাঙ্গিয়েছেন ধ্যানের সামিয়ানা। তাইতো আমরা দেখতে পাই অরণ্য আর পাহাড়ের চাঁদোয়া ঘেরা, শত নদীর বন্ধনে, সমুদ্রের পাহারায় বিস্তৃত এই বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন আধ্যাত্মিক পুরুষগণ। যে অঞ্চলে ইসলামের প্রতিষ্ঠা ছিল অনেকাংশে অসম্ভব সেসব অঞ্চলেই আমরা দেখতে পাই গড়ে উঠেছিল মুসলিম জনপদ। ইহা আউলিয়ায়ে কিরাম সূফী-দরবেশগণের পদচারণায় সম্ভব হয়েছে। যেসব সূফী সাধকের ত্যাগ ও সাধনার বদৌলতে বাংলাদেশের মানুষ পবিত্র ইসলামের আবে কাওসারের সন্ধান পেয়েছে; তাদের মধ্যে হযরত শাহজালাল মুজাররাদে ইয়ামানী (র.) অন্যতম ও শ্রেষ্ঠতম।

পরিচিতি

হযরত শাহজালাল মুজাররাদে ইয়ামানী (র.) এর পূর্ব পুরুষগণ ছিলেন কুরাইশ বংশীয় এবং মক্কা শরীফের বাসিন্দা। পরবর্তীতে তারা কিছু সংখ্যক ইয়ামানে বসতি স্থাপন করেন, আর এ ইয়ামানেই শাহজালালের জন্ম হয়। এজন্য তিনি ইয়ামানী হিসেবে পরিচিত। কারো কারো মতে, তাঁর পিতা ইয়ামান থেকে পুনরায় তুর্কীস্থানের অন্তর্গত মহাসাধক জালালুদ্দীন রূমীর স্মৃতিধন্য 'কুনিয়ায়' এসে বসতি স্থাপন করেন। আর এখানেই ১৩২৪ খ্রিষ্টাব্দ/৭৪৩ হিজরী সনে তার জন্ম হয়। এজন্য কোনো কোনো লেখক তাকে শাইখ জালাল কুনিয়াবী নামে উল্লেখ করেছেন।

হযরত শাহজালালের (র.) পিতার সঠিক নাম সম্বন্ধেও মতভেদ রয়েছে। কারো মতে তাঁর পিতার নাম 'মুহাম্মাদ' কারো মতে 'মাহমুদ' আবার কারো মতে 'মাহমুদ বিন মুহাম্মাদ'। শাহজালাল (র.) এর মাতৃ পরিচয় তেমন কিছু জানা যায় না। তবে কিছু লেখকের মতে তাঁর মাতা হযরত জালাল বুখারী (র.) এর কন্যা ছিলেন। তাঁর নাম সায়্যিদা সুররুখ বুখারী। শাহজালাল (র.) এর পিতা মুহাম্মাদ জিহাদে শহীদ হন। তার পিতামহও ছিলেন একজন শহীদ। ধারণা করা হয় যে, হযরত শাহজালাল (র.) এর জন্মের পূর্বেই তাঁর পিতা শহীদ হয়েছেন। শহীদ পরিবারের সন্তান শাহজালালের শোণিতেও ছিল জিহাদী প্রেরণা। তাই পরবর্তী জীবনে আমরা তাঁকে দেখতে পাই এক মুজাহিদ সাধক রূপে। যুলুম ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অসত্যের মোকাবিলায় তিনি তাঁর জীবনকে করেছিলেন উৎসর্গ।

জন্মের কয়েকমাস পরেই কারো কারো মতে তিন মাস পরেই পিতৃহীন শাহজালাল মাতৃহারা হন। পিতৃ-মাতৃহীন এই ইয়াতীম শিশুর লালন-পালনের ভার নেন তাঁর এক নিকট আত্মীয়, শিশু জালালের সাথে তাঁর কী সম্পর্ক ছিল এ নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন তিনি ছিলেন শিশু জালালের খালু। আবার কারো কারো মতে তাঁর লালন পালনকারী মনীষী ছিলেন তুর্কিস্তানের মহাসাধক খাজা সায়্যিদ সুলতান আহমদ ইয়াসভী (র.)। তবে অধিকাংশ লেখকের মতে তিনি ছিলেন তাঁর মাতুল (মামা) ও আধ্যাত্মিক গুরু সায়্যিদ আহমদ কবীর সোহরাওয়ার্দী (র.)। কেউ কেউ আবার মুলতানের সায়্যিদ আহমদ কবীর সোহরাওয়ার্দীকে শাহজালাল (র.) এর মাতুল বলে উল্লেখ করেছেন। তবে সায়্যিদ আহমদ কবীর যে মক্কা শরীফের একজন বিশিষ্ট আলিম ছিলেন এ ধারণাই যুক্তিযুক্ত। তিনি সোহরাওয়ার্দীয়া তরীকার একজন প্রখ্যাত সূফী-দরবেশ ছিলেন।

শাহজালাল (র.) তাঁর মাতুল সায়্যিদ আহমদ কবীর সোহরাওয়ার্দী (র.) এর তত্ত্বাবধানে থেকে অতি অল্প বয়সেই কুরআন-হাদীস, ফিকহসহ ইলমে তাসাওউফের জ্ঞানও লাভ করেন। বিশেষত, তিনি এ দরবেশের সুহবতে সূফীতত্ত্বের রহস্যময় বেলাভূমিতে বিচরণ করতে সক্ষম হন। কালক্রমে তাঁর অনেক কারামতও প্রকাশ হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে বিভিন্ন ইতিহাসগ্রন্থে যে ঘটনাটির বর্ণনা রয়েছে তা উল্লেখ করা হলো।

হিন্দুস্থানের পথে

হযরত শাহজালাল মুজাররাদে ইয়ামানীর (র.) পূর্বপুরুষ যেহেতু গাজী ও শহীদ ছিলেন, সেহেতু তাঁর শোণিতে ছিল জিহাদের প্রেরণা। তাই কামালিয়াত হাসিলের পর নিজের অন্তরে জিহাদের ইঙ্গিত অনুভব করতে থাকেন। তখনকার দিনে হিন্দুস্থান মূর্তি পূজার দেশ হিসেবে জানতেন। তাই অন্ধকারে আলোর মশাল জ্বালাবার জন্য তাঁরা এ যমীনে পদার্পণ করতেন। হযরত শাহজালাল ও স্থির করলেন যে, তিনি ইসলামের মশাল নিয়ে অন্ধকার

ভারতে আগমন করবেন। তাই তিনি তার মুরশিদের অনুমতি নিয়ে হিন্দুস্থানের দিকে রওয়ানা হন। মুরশিদ ৭০০ শিষ্যকে শাহজালালের অনুগামী করে দিয়েছিলেন।

হযরত শাহজালাল (র.) হিন্দুস্থানে গমন প্রসঙ্গে প্রচলিত আলোচনা যা অধিকাংশ লেখক উল্লেখ করেছেন তা হলো বিচার প্রার্থী হরিণীর ফরিয়াদ শুনে শাহজালাল যখন বাঘিনীকে চপেটাঘাত করেছিলেন, তখন তাঁর মামা হুজরায় বসে ভগ্নিপুত্রের কাণ্ড অবলোকন করছিলেন। আর এ ঘটনার পরই মামা ভাগিনার কামালিয়াতের পূর্ণতা দেখে অন্যত্র গিয়ে দ্বীনের খিদমত করার নির্দেশ দেন, এবং তাঁর হুজরা থেকে একমুষ্টি মাটি দিয়ে বলেন, অনুরূপ মাটি যেথায় পাবে সেখানে গিয়ে আস্তানা গাড়বে। শাহজালাল (র.) তদীয় সঙ্গীদের মধ্য থেকে একজনকে এ মাটি মিলিয়ে দেখার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর নাম দেওয়া হয়েছিল 'চাষনী পীর'। কারণ তিনি মাটি বহন করতেন এবং নতুন যে স্থানে শাহজালাল যেতেন সেখানকার মাটি জিহ্বা দ্বারা চেটে বা আস্বাদন করে দেখতেন যে শাহজালালের মুরশিদ গৃহের মাটির অনুরূপ কি-না। সিলেট শহরে আম্বরখানা গোয়াই পাড়া মহল্লায় তাঁর মাযার বিদ্যমান।

হিন্দুস্থানের পথে রওয়ানা হওয়ার কালে শাহজালালের সাথে ১২জন সঙ্গী ছিলেন বলে বেশ কিছু পুস্তকে উল্লেখ আছে। উক্ত ১২ জনের মধ্যে হযরত হাজী ইউসুফ, হাজী খলিল ও হাজী দরিয়ার নাম উল্লেখযোগ্য।

প্রচলিত আলোচনায় ও বেশ কিছু পুস্তকে উল্লেখ রয়েছে যে শাহজালাল ৩৬০ সহচরসহ সিলেটে আগমন করেছেন। তিনি ১২ জন বা ততোধিক সঙ্গী নিয়ে ইয়ামান থেকে রওয়ানা করলেও সিলেট পৌঁছা পর্যন্ত ৩৬০ জন বা ৩৪০ জন সঙ্গীদের সমাগম ঘটেছিল তাঁর সাথে। শাহজালাল মাতুলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভারতাভীমুখে রওয়ানা হলেন। ইতোমধ্যেই তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তির খ্যাতি বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। তাঁর চলার পথে শত শত লোক তাঁকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য এবং উপদেশ ও দুআর জন্য আসতে থাকে। শাহজালাল (র.) সমকালীন ইয়ামানের সামাজিক এবং রাজনৈতিক জীবন দেখে ব্যথিত হন। বহু অনৈসলামিক-সামাজিক কুসংস্কার ইয়ামানের জাতীয় জীবনে অঙ্গীভূত হয়ে পড়েছিল। আমীর উমরাহগণও ইসলামী জীবন দর্শনের বরখেলাপে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল। শাহজালাল এসব পছন্দ করতে পারেননি। দরবেশের প্রভাবে কিছু কিছু লোক অনৈসলামিক প্রথা পদ্ধতির বিরুদ্ধাচরণ করতে থাকে। দরবেশের অত্যধিক জনপ্রিয়তা তৎকালীন ইয়ামান শাসক এবং আমীর উমরারা সুনজরে দেখেননি। যেহেতু হাজার হাজার লোক শাহজালালের অনুসারী ছিল তাই রাজা প্রকাশ্যভাবে কোনো ক্ষতি করতে সাহস করেননি। চতুর রাজা প্রকাশ করলেন যে, তিনি এমন একজন আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন দরবেশকে মুরশিদ হিসেবে বেছে নিতে চান যিনি তার প্রদত্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারবেন। বাদশাহ একদিন সঙ্গী সাথিসহ দরবেশকে দাওয়াত করলেন। দরবেশ তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে দরবারে হাযির হলেন। বাদশাহ তাঁদের তাযীম তোয়াজের সাথে যথাযোগ্য আসনে বসিয়ে দলপতি শাহজালালের (র.) হাতে শরবতের বাহানায় এক পেয়ালা বিষ তুলে দিলেন। দরবেশ রাজার ষড়যন্ত্র বুঝতে পারলেন। বললেন, 'যারা অপরের অকল্যাণ চায় তাদেরই অকল্যাণ হয়।' এবং বিসমিল্লাহ পাঠ করে সবটুকু পান করে নিলেন। কঠিন বিষ শাহজালালের শরীরে কোনো ক্রিয়া করল না। ঈর্ষাপরায়ণ বাদশাহ তাঁর নিজের বিষের ক্রিয়ায় তখত থেকে ঢলে পড়ে মারা গেলেন।

হযরত শাহজালাল (র.) ইয়ামান ত্যাগ করার কালে মৃত বাদশাহর পুত্র যুবরাজ শাহজাদা আলী নিজ পিতার সিংহাসন ত্যাগ করে তাঁর সঙ্গী হতে চাইলেন। শাহজালাল তাঁর পিতার রাজ্য পরিচালনা করতে তাঁকে নসীহত করলেন। কিন্তু শাহজাদা আলী- কোনো মতেই আর ও মুখো হলেন না। তিনি শেষ পর্যন্ত শাহজালালের সঙ্গী হয়ে দেশ ত্যাগ করলেন। জীবনের সীমানা পেরিয়ে কবরের জীবনেও তিনি দরবেশের সঙ্গী হয়ে থাকলেন। তাঁকে শাহজালালের মাযার শরীফের উত্তর পার্শ্বে সমাহিত করা হয়। শাহজালাল (র.) তার সঙ্গীদের নিয়ে মাঠ-প্রান্তর পাড়ি দিতে থাকলেন। দিল্লির পথ অতিক্রমকালে অনেক লোক তাঁর হাতে বাইআত হয়ে সাহচর্য লাভ করেন। তাঁদের মধ্য যুবরাজ আলী, জাকারিয়া শাহ দাউদ, সৈয়দ উমর, করিম, বাগদাদের নিযামুদ্দীন, কিরামান শাহ, নিযামুদ্দীন সানী, গজনীর মখদুম জাফর ও সায়্যিদ মুহাম্মাদ (র.) এর নাম উল্লেখযোগ্য। শাহজালাল ইয়ামান হতে ভারতের দিকে অগ্রসরকালে বাগদাদ, গজনী প্রভৃতি স্থানে অবস্থান করেন।

দিল্লিতে অবস্থান

হযরত শাহজালাল কোন পথে ভারতে প্রবেশ করেছেন তা নিয়ে মতানৈক্য আছে। কারো কারো মতে তিনি খাইবার পাশ হয়ে, কারো মতে তিনি বেলুচিস্তান হয়ে ভারতে প্রবেশ করেন। ভারতে প্রবেশ করে তিনি দিল্লির পথে অগ্রসর হন। পথিমধ্যে তিনি মুলতানেও অবস্থান করেন। দিল্লিতে প্রবেশ করে শাহজালাল দিল্লির উপকণ্ঠে আস্তানা গাড়েন। অতি অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তির খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে দলে দলে লোক তাঁর খানকায় ভিড় জমাতে থাকে। দিল্লিতে এ সময় হযরত নিযামুদ্দীন (র.) আউলিয়ার অবস্থান ছিল। নিযামুদ্দীন (র.) শাইখ ফরীদুদ্দীন মাসউদ গঞ্জ-ই শকর (র.) এর খলীফা। যিনি কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (র.) এর খলীফা। তিনি সুলতানে হিন্দ খাঁজা মুঈনুদ্দীন (র.) এর খলীফা।

শাহজালাল যখন দিল্লির উপকণ্ঠে আস্তানা গেড়ে অবস্থান করছিলেন, ঐ সময় শাহ নিযামুদ্দীন (র.) এর এক শিষ্য তাঁর নিকট আগমন করেন। তিনি শাহজালালের আস্তানা থেকে ফিরে এসে মুরশিদের কাছে বললেন যে, আরব দেশ থেকে একজন সুদর্শন ফকীর এসেছেন। তিনি বৃদ্ধ নন। পোষাক পরিচ্ছেদে একজন মাগরিবী বলে মনে হয়। তাঁর ধ্যান উপাসনা দেখে মনে হয় তিনি একজন উচ্চস্তরের ফকীর। তিনি সর্বদাই অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে নারী সংসর্গ পরিহার করে চলেন। যখন তিনি পথ চলেন তখন চাদরে মুখ ঢেকে রাখেন। কিন্তু তিনি সর্বদা একটি সুদর্শন তরুণকে তাঁর নিকটে রাখেন। শোনা যায় যে, তরুণটি শিষ্যগণের মধ্যে তাঁর সবচেয়ে প্রিয়।

আরবীয় দরবেশ বয়সে একজন যুবক, অবিবাহিত এবং খানকায় সুদর্শন বালকের উপস্থিতি এসব বর্ণনায় হযরত নিযামুদ্দীন (র.) এর মনে শাহজালাল (র.) সম্বন্ধে খানিকটা কৌতুহলের উদ্রেক করেছিল। তিনি তাঁর দুজন শিষ্যকে বিদেশি ফকীরের খানকায় পাঠিয়ে দেন ভালোভাবে খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য। শিষ্য দুজন অত্যন্ত আগ্রহচিত্তে দরবেশের সাধনা, ধর্মপরায়ণতা ও আধ্যাত্মিকতা এবং চারিত্রিক মাধুর্যের বিভিন্ন দিক পর্যবেক্ষণ করে এসে নিযামুদ্দীন (র.) কে যা অবহিত করলেন, তাতে তিনি তৃপ্ত হলেন। যে সুদর্শন তরুণকে হযরত নিযামুদ্দীন (র.) এর শিষ্য শাহজালালের খানকায় দেখে এসেছিলেন, তিনি আর কেউ নন, তিনি ইয়ামানের যুবরাজ শেখ আলী। এ ইয়াতীম বালককে শাহজালাল নিজের সন্তানের মতো স্নেহ করতেন।

'শ্রীহট্টে ইসলাম জ্যোতি' গ্রন্থে মুফতি আজহার উদ্দিন আহমদ সিদ্দিকী মুনসেফ নাসির উদ্দিন হায়দার লিখিত 'সুহেলিয়্যামন' গ্রন্থের বরাত দিয়ে হযরত শাহজালাল (র.) ও নিযামুদ্দীন (র.) এর পরিচয়ের উপখ্যানটি এরূপ বর্ণনা করেন, 'তিনি দিল্লি পৌঁছার পর হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়ার জনৈক শিষ্য ধর্মগুরুর নিকট হযরত শাহজালালের আধ্যাত্মিকতার বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করিলেন। কিন্তু নিযামুদ্দীন (র.) দৈব বলে তাহার সম্বন্ধে সমস্ত জানিয়া ঐ শিষ্যকে তাড়াইয়া দিলেন এবং অন্য দুইজন শিষ্যের

মারফত তাঁহার কাছে সালাম পাঠাইলেন। হযরত শাহজালাল ইহার উত্তর স্বরূপ একটি ছোট বক্সে অঙ্গারের মধ্যে কিছু তুলা ভরিয়া তাহা তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তিনি বাক্স খুলিয়া দেখিতে পাইলেন যে তুলা অদগ্ধ অবস্থায় রহিয়াছে। ইহা হইতে তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, প্রেরক দুনিয়ার সকল অমঙ্গলের প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখার মধ্যেও নিজের মনুষ্যত্ব রক্ষা করিতে পারিয়াছেন।"

হযরত নিযামুদ্দীন (র.) শাহজালালের প্রকৃত পরিচয় জানতে পেরে এ আরবীয় দরবেশকে তাঁর বাসস্থানে পাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেন। তিনি তাঁর বাসস্থান দিল্লির গিয়াসপুরে শাহজালালকে দাওয়াত করেন। দিল্লিতে অবস্থানকালে পরবর্তী সময় শাহজালাল (র.) নিযামুদ্দীন (র.) এর বাসভবনে অবস্থান করেন। কিছুদিন অবস্থানের পর শাহজালাল (র.) পূর্ব ভারতের দিকে কদম বাড়ান। যাত্রার প্রাক্কালে হযরত নিযামুদ্দীন তাঁর অতিথি দরবেশ বন্ধুকে স্মৃতি স্বরূপ এক জোড়া সুরমায়ী (ধূসর রঙ) রঙের কবুতর দান করেছিলেন। দিল্লি থেকে পূর্ব ভারতে আগমনকালে শাহজালাল কবুতর জোড়া সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। তিনি বন্ধু প্রদত্ত কবুতর জোড়া অতি যত্নের সাথে পালন করতেন। সিলেটে যে কবুতর শাহজালালের (র.) মাযারের উপর এবং অন্যত্র দৃষ্ট হয় সেগুলো নিযামুদ্দীন আউলিয়া প্রদত্ত কবুতর জোড়ারই বংশধর। সিলেট অঞ্চলে এগুলো 'জালালী কবুতর' নামে পরিচিত।

সিলেট আগমনের প্রেক্ষাপট

অধনাতন বাংলাদেশ, পশ্চিম বাংলা ও আসাম নিয়ে 'গৌড়' নামে এক বিশাল রাজ্য গড়ে উঠেছিল এবং তা পাঁচভাগে বিভক্ত ছিল। গৌড় রাজ্যের বিভিন্ন ভাগে স্বতন্ত্র স্বাধীন নরপতিদের কর্তৃত্ব ছিল। বাংলাদেশের উত্তর বাংলার 'পান্ডুয়ায়' সে গৌড়ের রাজধানী ছিল। সুলতান হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯) একবার 'পঞ্চগৌড়ের' অধীশ্বর হয়ে শাসন শৃঙ্খলা ও সুবিচার দ্বারা যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। (পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম, ড. এনামুল হক)

পরবর্তীতে 'গোবিন্দ' নামক এক হিন্দু বীর বর্তমান সিলেটের সদর মহকুমার কতকাংশে অবস্থিত জনৈক খাসিয়া রাজাকে পরাজিত করে 'গৌড়' নামে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। 'গোবিন্দের' পরিচিতি প্রসঙ্গে বিশেষ কোনো কিছু জানা যায় না। বিভিন্ন পুস্তকে শুধু পশ্চিমাগত বলে উল্লেখ আছে।

রাজা গোবিন্দ প্রতিষ্ঠিত 'গৌড় রাজ্যের' গড়দোয়ার এর নিকটবর্তী 'টুলটিকর' মৌজার 'তেররতন' মহল্লায় ১৩ টি মুসলিম পরিবারের (মতান্তরে ১৩ জন) বাস ছিল। শাইখ বুরহানুদ্দীন ছিলেন এ ১৩টি পরিবারের প্রধান। শাইখ বুরহানের পরিবারসহ ১৩টি মুসলিম পরিবার হয় 'ধর্মযাজক' নয় সওদাগর ছিলেন। হিন্দু রাজ্যের অভ্যন্তরে এ স্বল্প সংখ্যক মুসলমানের বাসের কারণ অজ্ঞাত। বলা যায়- আরব বণিকেরা ব্যবসার উদ্দেশ্যে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতেন। কাজেই শাইখ বুরহানুদ্দীন ও তাঁর সঙ্গীয় আরবীয়রা তেজারতির উদ্দেশ্যেই এখানে আসেন এবং কালক্রমে স্থায়ীভাবে অবস্থান করেন। তাই শাইখ বুরহানুদ্দীন ও তাঁর সঙ্গীয় আরবীরা বণিক মুসলমানই সিলেটের প্রথম মুসলমান।

শেখ বুরহানুদ্দীন ছিলেন নিঃসন্তান। একটি সন্তান কামনায় তিনি সর্বদা মুনাজাত করতেন। বুরহান দম্পতি একটি সন্তানের জন্য ব্যাকুল প্রায়। এক সময় আল্লাহ তাদের মিনতি কবূল করলেন। বুরহান পত্নী অন্তঃসত্তা হলেন। তারপর যথাসময়ে ভূমিষ্ট হলো একটি পুত্র সন্তান। বুরহান দম্পতি আল্লাহর শুকরিয়া স্বরূপ একদিন জুমুআর রাত্রিতে ছেলের আকীকায় একটি গরু জবাই করলেন।

গরুর গোশত অন্যান্য মুসলিম পরিবারের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া দিলেন। গরুর চামড়া, নাড়িভুঁড়ি ও হারাম অংশগুলো জঙ্গলে ফেলে দিলেন। এগুলো পড়ল বন্য পশু-পাখির ভাগে। একটি চিল পরিত্যক্ত নাড়িভুঁড়ির অংশ বিশেষ বহন করে নিয়ে যাবার সময় অন্য আরেকটি চিল পিছে পিছে তাড়া করে, একসময় দুটি চিলের মধ্যে কাড়াকাড়ি শুরু হলে গোশতের (নাড়িভুঁড়ির) টুকরা চংগল থেকে ফসকে একেবারে রাজকীয় দেবমন্দিরের সামনেই পড়ে গেল। রাজার কাছে সংবাদ গেলে রাজাতো রেগে অগ্নিশর্মা। রাজা হুকুম দিলেন, গোষ্ঠীশুদ্ধ ধরে এনে দেবতার সামনে বলি দাও। বুঝুক দেবতা হত্যার ফল কত ভয়াবহ?

শাইখ বুরহান দম্পতিকে তাঁদের সন্তানসহ রাজ দরবারে হাযির করা হলো। অপরাধ অস্বীকার করার উপায় নেই। গোবিন্দ রাজার হুকুমে সন্তানকে দেবতার সামনে বলি দেওয়া হলো। আর বুরহান দম্পতির এক এক হাত কেটে দেওয়া হলো। বুরহান মৃত সন্তান ও কর্তিত হাত বাড়িতে নিয়ে গেলেন। মনের দুঃখে ও রক্তক্ষরণে ছেলের 'মা' মারা গেলেন।

ঘটনা এখানেই শেষ হলো না। যে সময়ের ঘটনা সে সময়ে এশিয়া ইউরোপের অধিকাংশই মুসলিম করতলগত। দুনিয়ায় মুসলিম এতো কর্তৃত্ব থাকা সত্ত্বেও এত বড় ঘটনা নীরবে সহ্য করা যায় না। তাই মহল্লাবাসী সবাই এ অত্যাচারের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করলেন। কিন্তু এত বড় রাজশক্তির বিরুদ্ধে মুষ্টিমেয় লোকের বিদ্রোহ কিছুতেই যথেষ্ট নয়। তাদের এ বিদ্রোহের সংবাদ শুনার সাথে সাথে রাজার হুকুমে সরকারি বাহিনীসমূহ মুসলিম বাসিন্দাকে নিধন শুরু করে।

শাইখ বুরহানুদ্দীন সন্তানের লাশসহ বহু কষ্টে বাংলার শাসনকর্তা শামসুদ্দীন ফিরোজ শাহের দরবারে হাযির হন। ততদিনে সন্তানের গায়ের গোশত পচে হাড় থেকে ঝরে গেছে। বুরহানুদ্দীন সুলতানের দরবারে এই লোমহর্ষক ঘটনা বিবৃত ও মৃত সন্তানের হাড়গোড় প্রদর্শন করলে সুলতান ব্যথিত ও মর্মাহত হয়ে আপন পুত্র মতান্তরে ভগ্নিপুত্র সিকান্দর শাহের নেতৃত্বে বিরাট বাহিনী দিয়ে এ যুলুমের প্রতিশোধের জন্য প্রেরণ করেন। সিকান্দর শাহ তাঁর বাহিনী নিয়ে গৌড় রাজ্যের দিকে অগ্রসর হতে থাকলে রাজা চর মুখে এ সংবাদ পেয়ে রাজ্য সীমার বাইরে থাকতেই মুসলিম বাহিনীর গতিরোধ করেন। সিকান্দর শাহ অতি দক্ষতার সাথে গোবিন্দ বাহিনীর মুকাবিলায় যুদ্ধ করতে থাকলেন। অবশেষে তান্ত্রিক রাজা তার তন্ত্রশক্তি লব্ধ 'অগ্নিবান' প্রয়োগ করল। অস্ত্রের দ্বারা অগ্নি সংবরণ করা অসম্ভব। অলক্ষ্য থেকে মুহুর্মুহু অগ্নির হালকা মুসলিম বাহিনীর উপর আপতিত হতে থাকলে অসংখ্য সৈন্য হতাহত হলেন। গাজী সিকান্দর অনন্যোপায় হয়ে পশ্চাদপসরণ করলেন। কিন্তু শাহ সিকান্দর একবারে দমিত হলেন না। তিনি সোনারগাঁয়ে ফিরে না গিয়ে নিজ চেষ্টায় মুজাহিদ বাহিনী সংগ্রহ করে আরও দুবার গোবিন্দ দমনের প্রয়াস চালান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি পরাভব হন গোবিন্দের 'অগ্নিবানের' কাছে।

সিকান্দর শাহের পরাজয় পুত্রহারা বুরহানুদ্দীনকে ব্যাকুল করে তুলে। যালিম গোবিন্দের কিছুই হলো না, বদলা নেয়া হলো না পুত্র হত্যার। দুঃখ ভরা মন নিয়ে তিনি দিল্লি যাবার সিদ্ধান্ত করলেন। অতি কষ্টে শিষ্ঠে তিনি ১৩৫৬ (কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ) সনে গিয়ে পৌছলেন দিল্লির দরবারে। ঐ সময় তুঘলক বংশীয় সম্রাট আলাউদ্দিন ফিরোজ তুঘলক (১৩৫১-৮৮ খ্রিঃ) দিল্লির মসনদে সমাসীন। বুরহানুদ্দীন করুণভাবে সম্রাট সকাশে সমস্ত কাহিনি বর্ণনা করলে সম্রাটের শোণিত ধারা টগবগিয়ে উঠল। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এক জংলী রাজার এত স্পর্ধা? এ আচরণ একেবারে অসহনীয়। তাকে উচিত শিক্ষা দিতেই হবে। সম্রাট নিজ ভগ্নীপুত্র শাহ সিকান্দর গাজীকে (ফিরোজ শাহ প্রেরিত সিকান্দর শাহ নন) অসংখ্য সৈন্য সমেত গোবিন্দ দমনে প্রেরণ করলেন।

বুরহানুদ্দীন কিন্তু মনের দিক থেকে একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিলেন। জয় পরাজয় কার হবে তা অনিশ্চিত। পূর্বেতো অগ্নীবানের সম্মুখে মারা গেছে শত শত সৈন্য। এখনও শাহী ফৌজের পরিণতি কী হবে তা আল্লাহ মালুম। কাজেই এ লোমহর্ষক ঘটনা না দেখাই ভালো। তাই বুরহানুদ্দীন শাহী কাফেলার সঙ্গী না হয়ে মক্কা শরীফ গমনের বাসনা নিয়ে শাহ নিযামুদ্দীন আউলিয়ার হুজরায় অবস্থান করছিলেন।

শাইখ বুরহানুদ্দীন যখন শাহ নিযামুদ্দীন (র.) এর হুজরায় তখন শাহজালাল ও তার সঙ্গী সাথিসহ নিযামুদ্দীন এর হুজরায় তাশরীফ আনেন। বুরহানুদ্দীন শাহজালালকে সব বেদনার কথা শুনালেন। শাহজালাল সব শুনে আল্লাহর রহমতে এর প্রতিকারে আশ্বাস দিলেন। তাই শাইখ বুরহানুদ্দীন মক্কা যাওয়ার বাসনা ত্যাগ করে শাহজালালের কাফেলা ভুক্ত হন।

শাহী ফৌজ পূর্বেই রওয়ানা হয়েছিল, দরবেশ কাফেলা পরে রওয়ানা দিয়ে অগ্রসর হলে বাংলাদেশের হুগলী সপ্তগ্রাম নামক স্থানে উভয় দলের সাক্ষাত ঘটে। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, গৌড় গোবিন্দের সাথে বার বার যুদ্ধ করে পরাজিত বাংলার শাহ সিকান্দরও ঐ সময় সপ্তগ্রামের নিকটে কোথাও ছিলেন। তিনিও সদলবলে এ কাফেলার সাথে মিলিত হয়েছিলেন।

শাহ সিকান্দর বাহিনী গোবিন্দ রাজার কাছে পরাজিত হওয়ার পর বুরহানুদ্দীন আদৌ দিল্লি গিয়েছিলেন কি-না তা নিয়ে ঐতিহাসিকগণ মতবিরোধ করেছেন। কারো কারো মতে তিনি আদৌ দিল্লি যাননি। বরং ব্যর্থ মনোরথ বুরহানুদ্দীন সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে বিচার প্রার্থনা করতে মক্কায় রওয়ানা হন। পথিমধ্যে তিনি হযরত শাহজালাল (র.) এর সাক্ষাতপ্রাপ্ত হন। শাহজালাল পূর্ব ভারতের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। অন্য আরেকটি মত হলো, শাইখ বুরহান বাংলার সুলতান শামসুদ্দীন ইলইয়াছ শাহের নিকট ফিরে যান। তিনি সিকান্দরের ব্যর্থতার কাহিনি বর্ণনা করেন। সিকান্দরের পুনঃপুনঃ পরাজয়ের কথা চিন্তা করে সুলতান তাঁর আরবীয় সেনাপতি সায়্যিদ নাসিরুদ্দীনকে সিপাহসালার নিযুক্ত করে নয়া অভিযানের জন্য প্রেরণ করেন। এ সময় শাহজালাল (র.) ত্রিবেনীতে অবস্থান করছিলেন। কেউ কেউ আবার ত্রিবেনী বলতে এলাহাবাদ বুঝেছেন। প্রকৃতপক্ষে ত্রিবেনী বাংলার সপ্তগ্রামের নিকট অবস্থিত সুলতান কায়কাউসের রাজত্বকালে ৬৯৮ হিজরীতে জাফর খান কর্তৃক ত্রিবেনী বিজিত হয়।

সায়্যিদ নাসিরুদ্দীন সুলতান শামসুদ্দীনের সেনাবাহিনীতে স্বল্প পরিচিত সেনাপতি ছিলেন। তিনি ছিলেন পরম ধর্মপরায়ণ। তাঁর সেনাপতি নিয়োগের সংবাদে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে আনন্দের বন্যা প্রবাহিত হলো। বিধর্মী, অত্যাচারী রাজা গোবিন্দের বিরুদ্ধে একজন আরবকে সেনাপতি নিয়োগে সৈন্যদের উৎসাহ ও আত্মবিশ্বাস অত্যধিক বৃদ্ধি পায়। সায়্যিদ নাসিরুদ্দীন শাহজালালের আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ এবং মহান গুণাবলি সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। শ্রদ্ধা নিবেদন ও অত্যাচারী রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযানে আশীর্বাদ কামনায় সায়্যিদ নাসিরুদ্দীন 'ত্রিবেণীতে' শাহজালালের সাথে সাক্ষাত করেন। অনুমিত হয় সায়্যিদ নাসিরুদ্দীন রাজা গোবিন্দের বিরুদ্ধে অভিযানে নেতৃত্ব দানের জন্য দরবেশ শাহজালালকে অনুরোধ করেছিলেন। অন্যায় অত্যাচার নির্যাতনের বিরুদ্ধে জিহাদ করা দরবেশ শাহজালালের বিশ্বাসের অঙ্গ ছিল। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই সায়্যিদ নাসিরুদ্দীন প্রস্তাবে সম্মত হন।

সিলেট অভিযান

সম্মিলিত বাহিনী ক্রমে গৌড় সীমান্তে হাযির হলে গোবিন্দের কাছে এ খবর পৌঁছল। সম্মিলিত মুসলিম বাহিনী অগ্রসর হচ্ছে জেনে, গোবিন্দ নিজে নেতৃত্ব দিয়ে নিজ রাজ্য সীমা চৌকিতে (বর্তমান নবীগঞ্জ থানাধীন) গিয়ে গতিরোধের চেষ্টা করল। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ শুরু হলো। কিন্তু রাজা গোবিন্দের শৌর্যবীর্য, বাহুবল, সর্বশেষ অগ্নিবান সবই ব্যর্থ। যুদ্ধে অগ্নিবাণ কাজ করে না দেখে রাজা সুরমা নদী পর্যন্ত পিছু হটে গেলো। যুদ্ধে রাজার সেনাপতি 'মনা রায়' নিহত হলে রাজা হতোদ্যম হয়ে পালিয়ে যায়। হযরত শাহজালালের সিলেট বিজয়ের উপাখ্যান প্রাচীন গ্রন্থসমূহে অন্যভাবে বিবৃত হয়েছে। শাহজালাল বালাগঞ্জ থানাধীন, বাহাদুরপুরের সন্নিকটে স্বীয় জায়নামাযের সাহায্যে বরাক নদী পার হয়ে যখন শহরের নিকটবর্তী হলেন, তখন রাজা এই ফকীরের অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার জন্য হাতির পিঠে একটি প্রকাণ্ড লৌহ ধনুক পাঠিয়ে বলে দেয় যে যদি তিনি এর 'জ্যা' একা ছিন্ন করতে পারেন তবে বিনা বাধায় তিনি রাজ্য ছেড়ে চলে যাবেন।

হযরত শাহজালাল তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে এমন এক ব্যক্তিকে খোঁজলেন যিনি জীবনে ফজরের নামায কাযা করেন নি। কেবল মাত্র সায়্যিদ নাসিরুদ্দীন সিপাহসালারের মধ্যেই অভিষ্ট ব্যক্তির সন্ধান মিলল। শাহজালাল তাঁরই উপর এ দুঃসাধ্য কাজের ভার দিলেন। সায়্যিদ নাসিরুদ্দীন অক্লেশে 'জ্যা' ছিন্ন করতে সক্ষম হলেন। এ সংবাদ রাজা গৌড় গোবিন্দের কাছে পৌঁছলে রাজা প্রতিরোধের সমস্ত আশা জলাঞ্জলি দিয়ে শহর থেকে পালিয়ে পেঁচাগড়ের জঙ্গলে ও সেখান থেকে কাছাড়ের জঙ্গলে আশ্রয় নেয়।

মুসাল্লা হলো তরণী

দরবেশ শাহজালাল মুসলিম বাহিনী নিয়ে এবার শহরে প্রবেশ করবেন, সামনে সুরমা নদী। নদী পাড়ি দেবার মতো কোনো উপকরণ নেই। মুজাহিদ বাহিনী নদী পাড়ি দেবেন কী করে। রাজা আগেই পারাপারের সব পথ বন্ধ করে দিয়েছে। শাহজালাল স্বীয় মুসল্লা বা জায়নামায নদীতে ভাসিয়ে দিলেন। সাথিদেরকে ও অনুরূপ করতে বললেন। দরবেশদের 'জায়নামায' সুরমার পানিতে ভেলা হয়ে ভেসে রইল, একে একে পাড়ি দিলেন সবাই ওপারে। মুসলিম বাহিনী শাহজালালের নেতৃত্বে রাজধানী দখল করলেন। রাজা নদীর তীরে ও শহরের প্রত্যেক প্রবেশ পথে পাথর দিয়ে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রেখেছিল। তা দেখে শাহজালাল 'শিলহট' পাথর সরে যাও বললে পাথর গড়িয়ে যেতে লাগল। সে থেকে গৌড়রাজ্যের নাম হলো- শিলহট- শ্রীহট্ট- সিলেট। শাহজালাল (র.) তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তিবলে সিলেট জয় করেছিলেন এবং দেব মূর্তির ধ্বংসস্তূপের উপর ইসলামের আদর্শের সৌধ গড়েছিলেন বলেই সিলেটের অপর নাম হলো তার নামানুসারে 'জালালাবাদ'।

হযরত শাহজালাল (র.) সিলেট পৌঁছে বর্তমানে অবস্থিত তাঁর মাযারের টিলার মাটে তদীয় মাতুল কর্তৃক প্রদত্ত মাটির অনুরূপ পেয়েছিলেন। তাই এ জায়গায়ই তিনি জীবনের শেষ সময়টুকু হুজরা নবিশ অবস্থায় কাটিয়েছেন।

সিলেটে অবস্থান ও ওফাত

হযরত শাহজালাল (র.) এর নাম, পিতার নাম, জন্ম তারিখ, জন্মস্থান ইত্যাদি নিয়ে যেমন মতবিরোধ রয়েছে, তেমনি তার সিলেট আগমনের ও অবস্থানের সময় নিয়েও অত্যধিক মতভেদ দেখা যায়।

কেউ কেউ বলেছেন, তাঁর সিলেটে আগমন ৫৬১ হি. বা ১১৬৬ খ্রি, হবে। আবার কারো মতে তিনি ৭০৩ হি. মুতাবেক ১৩০৩ খ্রিষ্টাব্দে সিলেট বিজয় করেন। কেউ আবার সিলেট বিজয় ১৩৫৫ ও ওফাত ১৩৮৪ খ্রিষ্টাব্দে বলে উল্লেখ করেছেন। কারো মতে তিনি সিলেটে ৩০ বছরকাল অবস্থান করেন আবার কেউ অবস্থানকাল ৩৭ বছর অনুমান করেন।

হযরত শাহজালাল মুজাররাদে ইয়ামানী (র.) ১১৯ মতান্তরে ৬২ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন। ইবনে বতুতা তার ভ্রমণ কাহিনীতে লিখেছেন, ওফাতের সময় হযরতের বয়স হয়েছিল ১৫০ বছর।

যুদ্ধবাজ নাফতালি বেনেট এবং অনিশ্চিত স্বাধীন ফিলিস্তিন

রহমান মোখলেস

যতই দিন যাচ্ছে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বপ্ন ততই ফিকে হয়ে আসছে। বাড়ছে ফিলিস্তিনিদের ওপর ইসরায়েলি দমন-পীড়ন। ফিলিস্তিন-ইসরায়েল ১১ দিন ভয়াবহ যুদ্ধের পর গত ২১ মে আন্তর্জাতিক উদ্যোগে যুদ্ধবিরতির ঘোষণা হয়েছিল দুই তরফে। স্বাক্ষরিত হয়েছিল যুদ্ধবিরতি চুক্তি। আর দুই তরফ থেকেই বলা হয়েছিল তারা সহনশীলতার পরিচয় দিবে এবং সহিংসতার উসকানি থেকে বিরত থাকবে। কিন্তু যুদ্ধবিরতির পর থেকেই প্রায় প্রতিদিনই ইসরায়েলি তরফে চলছে উসকানি। পশ্চিম তীরে অবৈধ বসতি নির্মাণে গুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে একের পর এক ফিলিস্তিনি বাড়ি-ঘর। বাধা দিলেই চলছে নির্বিচার গুলি। নিহত হচ্ছে ফিলিস্তিনি নারী-শিশু-পুরুষ। ইতোমধ্যে ইসরায়েলি পতন ঘটেছে নেতানিয়াহুর সরকারের। নেতানিয়াহুর টানা ১২ বছরের শাসন শেষে এসেছে জোড়াতালির ৮ দলীয় নতুন জোট সরকার। যার প্রধানমন্ত্রী হলেন নাফতালি বেনেট। অনেকে মনে করেছিলেন এবার হয়তো ফিলিস্তিনিদের দুর্ভোগ কিছুটা কমবে। কিন্তু বেনেট প্রমাণ করলেন নেতানিয়াহুর বিদায় মানেই ফিলিস্তিনিদের স্বস্তি কিংবা শান্তি নয়। বরং ফিলিস্তিন গ্রাসে তিনি নেতানিয়াহুর চেয়ে আরো এক ধাপ এগিয়ে। আর সেটাই প্রমাণ করলেন।

বেনেট ১৪ জুন ক্ষমতা গ্রহণ করে পরদিনই ১৫ জুন অনুমতি দিলেন জেরুজালেমে উগ্রবাদী ইয়াহুদীদের মিছিলের। এতে করে উত্তেজনা বাড়ে ফিলিস্তিনিদর মাঝে। আর এই উত্তেজনা থেকেই গাজা থেকে ফিলিস্তিনিদের বেলুন উড়লে সরাসরি আবারও গাজায় বিমান হামলা চালান নাফতালি বেনেট। পরপর দুই দিন চলে বিমান হামলা। গাজায় গুড়িয়ে দেওয়া হয় আবারও বহু ফিলিস্তিনি ভবন।

জোড়াতালির জোট সরকার ও বেনেট

ইসরায়েলে এখন নতুন ৮ দলীয় জোট সরকারের প্রধানমন্ত্রী নাফতালি বেনেট। বেনেট ইয়ামিনা পার্টির নেতা। তিনি নেতানিয়াহুর চেয়েও কট্টর ডানপন্থী। স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের চরম বিরোধী। অবশ্য সরকারের দুই নম্বর ব্যক্তি এবং জোটের মূল নেতা ইয়েস আতিদ দলের প্রধান ইয়ার লাপিড মধ্যপন্থী। তিনি আগে কিছুটা হলেও শান্তি প্রক্রিয়ার পক্ষে ছিলেন। তবে ক্ষমতায় এসে সুর বদলে গেছে। তিনি আট দল নিয়ে গোঁজামিলের যে জোট সরকার গঠন করা হয়েছে তার পররাষ্ট্রমন্ত্রী। শান্তি প্রক্রিয়া শুরুর সম্ভাবনা এখন একেবারেই ক্ষীণ। এই আট দলের মত ও পথের কোনো মিল নেই। এই জোটে কট্টর জাতীয়তাবাদিদের পাশাপাশি মধ্যপন্থীরা থাকলেও তারা ক্ষমতায় টিকে থাকতে কোনঠাসা।

এই জোটে রয়েছে ইউনাইটেড আরব লিস্ট (ইউএএল) নামের একটি ছোট ইসলামপন্থী আরব দলও। এই দলের নেতা মনসুর আব্বাস। আরব লিস্ট ফিলিস্তিনিদের প্রতি সহানুভূতিশীল। কিন্তু এই মুহূর্তে তারা স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের পক্ষে কথা বলবে তেমন সৎসাহস নেই। তাদের এখন মূল লক্ষ্য, ইসরায়েলের ভেতর যে শতকরা ২১ ভাগ আরব নাগরিক রয়েছে, তাদের স্বার্থ রক্ষা করা। চিন্তায় স্বাধীন ফিলিস্তিন নেই। নতুন সরকার ক্ষমতায় এসে পশ্চিম তীরে একের পর এক ফিলিস্তিনি হত্যা এবং গাজায় বিমান হামলা চালানোর পরও ইউনাইটেড আরব লিস্ট-এর নেতা মানসুর আব্বাস কোনো প্রতিক্রিয়াই দেখাননি।

গণ নির্বাচনে ১২০ আসনের পার্লামেন্টে (নেসেট) প্রধানমন্ত্রী বেনেটের দল ইয়ামিনা পার্টি পেয়েছে মাত্র ৬টি আসন। এই ৬ টি আসন নিয়েই তিনি প্রধানমন্ত্রী। অবশ্য ২ বছরের জন্য। পরের দুই বছর প্রধানমন্ত্রী হবেন বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়ার লাপিড। নেসেটের ১২০ আসনের মধ্যে ১৯টি আসন পেয়েছে ইয়ার লাপিডের দল।

নতুন প্রধানমন্ত্রী বেনেট একসময়ের প্রযুক্তি উদ্যোক্তা। ডানপন্থী, উগ্র ধর্মীয় ও জাতীয়তাবাদী বক্তব্যের মধ্য দিয়ে ইসরায়েলের রাজনীতিতে তাঁর আবির্ভাব। বেনেটের দল ইয়ামিনা পার্টি অধিকৃত পশ্চিম তীরের একাংশকে ইসরায়েলের অংশ হিসেবে ঘোষণা করার দাবি জানিয়ে আসছে বহু দিন থেকে। এছাড়া বেনেট নিজেই পশ্চিম তীরের দখলে আগ্রহী। বেনেট ছিলেন, ইসরায়েলের স্পেশাল ফোর্সের সাবেক কমান্ডো। অধিকৃত পশ্চিম তীরে ইয়াহুদী বসতি সম্প্রসারণের মূল সংগঠনের প্রধান ছিলেন তিনি। ফিলিস্তিনি-বিরোধী উগ্র ও বিতর্কিত বক্তব্যের জন্যও বেনেট সমালোচিত।

কে এই মনসুর আব্বাস?

ফিলিস্তিনি হয়েও ইসরায়েলে সরকার গঠনে এবার অন্যতম নির্ধারক হিসেবে আত্মপ্রকাশ মনসুর আব্বাসের। তিনি হিব্রু ইউনিভার্সিটি অব জেরুজালেম থেকে দন্তচিকিৎসা বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন। পরে ইউনিভার্সিটি অব হাইফায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করেন। ছাত্রজীবনে আরব স্টুডেন্টস কমিটির সভাপতি ছিলেন। এ সময়েই সান্নিধ্যে আসেন ইসলামিক মুভমেন্ট অব ইসরায়েলের প্রতিষ্ঠাতা আবদুল্লাহ নিমার দারউইশের। এভাবেই ইসরায়েলের রাজনীতিতে আবির্ভাব মনসুর আব্বাসের। তিনি ২০০৭ সালে ইউনাইটেড আরব লিস্টের (ইউএএল) সাধারণ সম্পাদক হন। তিন বছরের মাথায় তিনি ইসলামিক মুভমেন্টের দক্ষিণাঞ্চলীয় শাখার ডেপুটি চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ২০১৯ সালের এপ্রিলে নেসেটের (ইসরায়েলি পার্লামেন্ট) নির্বাচনে আরব জাতীয়তাবাদী দল বালাদের সঙ্গে জোট বাঁধেন ও নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হন। তবে মতৈক্য না হওয়ায় এবারের নির্বাচনে এককভাবে লড়ে মনসুরের দল ইউএএল। চারটি আসন পায় ইউএএল। ইউএএল মূলত ইসরায়েলের

সংখ্যালঘু মুসলিম নাগরিকদের রাজনৈতিক সংগঠন। ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা নয়, দলটির মূল লক্ষ্য ইসরায়েলি আরব নাগরিকদের স্বার্থ সংরক্ষণ।

ডানপন্থী, বামপন্থী, মধ্যপন্থী- যে নামেই ডাকা হোক না কেন, ইতিহাসে ইসরায়েলের অনেকগুলো সরকারই দেখেছেন ফিলিস্তিনিরা। কিন্তু ফিলিস্তিনি জনগণের অধিকারের কথা এলেই তারা সবাই বৈরী হয়ে যায়। তাদের সব সরকারই ফিলিস্তিন বিরোধী। সব সরকারই চেয়েছে ফিলিস্তিন গ্রাস করতে। এটাই ইসরায়েলের রাজনীতি।

সৌদি আরবের নীরবতা ও নানা প্রশ্ন

ইসরায়েল-ফিলিস্তিন প্রতিটি সংঘর্ষে ফিলিস্তিনিদের পক্ষে সোচ্চার কণ্ঠ দেখা গেছে সৌদি আরবকে। কিন্তু এবার তাদের মুখবন্ধ। কোনো উচ্চবাচ্য নেই। ভাবনায় আদৌ নেই ফিলিস্তিন। সৌদি আরব এখন ব্যস্ত অঞ্চলে নিজের আধিপত্য রক্ষা ও ইরানকে ঠেকানো। ইরানের বিরুদ্ধে উপসাগরীয় দেশগুলোকে নিয়ে জোট গড়ে তুলেছেন। এ লক্ষ্যে মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য আরব দেশগুলোর সাথে সে এমনকি ইসরায়েলকেও পাশে চায়। এর কারণ ইসরায়েল ঘোর বিরোধী ইরানের। এছাড়া ইসরায়েল ইতোমধ্যে বহুবার ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় হামলা চালিয়েছে। কমান্ডার কাসেম সুলাইমানিসহ বহু ইরানি নেতাকে হত্যা করেছে।

অনেক আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকই মনে করেন, গত বছর যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসন আমলে যে চারটি আরব দেশ ইসরায়েলের সঙ্গে শান্তি চুক্তি ও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে আড়ালে তাতে ভূমিকা ছিল সৌদি আরবের। সৌদি আরব প্রকাশ্যে ইসরায়েলের সঙ্গে শান্তি চুক্তিতে না গেলেও তৎকালীন ইসরায়েলি প্রশাসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেনইয়ামিন নেতানিয়াহুর সাথে সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমানের সখ্যতা ছিল। তাদের মধ্যে বহুবার ফোনে যোগাযোগ হয়েছে। এমনকি এও শোনা যায় গণ বছর সৌদি আরবে গোপনে সফরও করেছেন নেতানিয়াহু। বৈঠক করেছেন যুবরাজের সাথে। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়,

নেতানিয়াহু একটি প্রাইভেট জেট বিমানে করে সৌদি আরবের নিওম শহরে গিয়ে গোপনে যুবরাজ মুহাম্মাদ বিন সালমানের সাথে বৈঠক করেছেন। সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফয়সাল বিন ফারহান আল-সউদ টুইট বার্তায়- এরকম কোন বৈঠকের কথা নাকচ করে দিলেও নেতানিয়াহু এ খবরের ওপর কোন মন্তব্য করতে অস্বীকার করে বলেন, আরব দেশগুলোর সাথে 'শান্তির বৃত্তকে আরো বড় করার জন্য' তিনি কাজ করে যাচ্ছেন। আর এভাবেই সৌদি আরবের প্রভাবে ইরান ইস্যুতে আরব দেশগুলো ঝুঁকছে ইসরায়েলের দিকে। তাদের কাছে উপেক্ষিত ফিলিস্তিন। সেই প্রবাদ বাক্যের মতো 'আমার শত্রুর শত্রু, আমার বন্ধু'। ইরান ইস্যুতে এই কথাটিই আরব দেশগুলোর ক্ষেত্রে খাটে। তাই আরব দেশগুলো ফিলিস্তিন নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে ইসরায়েলের সঙ্গে সখ্য গড়তেই বেশি আগ্রহী।

ইরান প্রসঙ্গ

এদিকে ইরানে ইবরাহীম রাইসী নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ায় তাঁকে কট্টরপন্থীবলে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে যেমন হুঁশিয়ারি করেছে, উপসাগরীয় আরব দেশগুলোও নেতিবাচক মনোভাব ব্যক্ত করেছে। তবে ইবরাহীম রাইসী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর প্রথম সংবাদ সম্মেলনে এটা নিশ্চিত করে বলেছেন, উপসাগরীয় আরব দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নই ইরানের পররাষ্ট্রনীতির মূল লক্ষ্য হবে। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, ইরান সৌদি আরবের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক চায়। কিন্তু সৌদি নেতৃত্বাধীন উপসাগরীয় দেশগুলো ইসরায়েলের মতো ইরানবিরোধী নীতিতে এখনও অটল।

আর গাজায় যখন ইসরায়েলের বোমা পড়ছে, পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনি বসতি গুড়িয়ে দিচ্ছে ও ফিলিস্তিনিদের হত্যা করছে, তখন আমিরাত সফর করলেন ইসরায়েলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়ার লাপিড। গত ২৯-৩০ জুন দুই দিনের সফরে তার আমিরাত যাওয়ার কথা। আমিরাতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ আবদুল্লাহ বিন জায়েদ আল-নাহিয়ানের সঙ্গে তার বৈঠকের কথা।

সৌদি শহরে ইসরায়েলি বিনিয়োগ?

এদিকে শোনা যায়, লোহিত সাগরের তীরবর্তী বিলিয়ন বিলিয়ন কোটি ডলারের বিলাস বহুল যে 'দ্য লাইন' (নিওম) শহর সৌদি আরব গড়ে তুলছে তাতে ইসরায়েলি বিনিয়োগও রয়েছে। আর এ নিয়ে সমঝোতা হয়েছে নেতানিয়াহুর সাথে যুবরাজ সালমানের।

সৌদি আরবের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের বিশাল এলাকা জুড়ে লোহিত সাগরের তীরে গড়ে তোলা হচ্ছে এই নিওম শহরে। ১৬টি অঞ্চল নিয়ে গঠিত হবে 'দ্য লাইন' তথা নিওমের আকার হবে ৩৩টি নিউইয়র্ক শহরের সমান। দু'হাজার আঠারো সালের অক্টোবরে সৌদি যুবরাজ মুহাম্মাদ বিন সালমান সংবাদমাধ্যম ব্লুমবার্গকে বলেছিলেন, শহরটির প্রথম পর্যায়ের কাজ প্রায় শেষ। তবে শহরটির সব কাজ শেষ হবে ২০২৫ সালে।

সৌদির তাবুক প্রদেশে ১০,২৩০ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে নিওম শহরটি তৈরির পেছনে বাজেট ধরা হয়েছে ৫০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ৫০ হাজার কোটি ডলার। এটি হবে পুরোপুরি কার্বনমুক্ত শহর। শহরটি পরিচালিত হবে শতভাগ পরিবেশবান্ধব জ্বালানি দিয়ে। আর শহরটির ব্যাপ্তি হবে ১৭০ কিলোমিটার। কমপক্ষে ১০ লক্ষ নাগরিক এখানে বাস করবেন। আন্তর্জাতিক অনেক বিশেষজ্ঞই মনে করেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প আর কিছুদিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতায় থাকলে, কিংবা দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় আসলে ইসরায়েলের সঙ্গে প্রকাশ্যেই গাঁটছড়া বাঁধত সৌদি আরবও।

আরো তিন মুসলিম দেশের দিকে নজর ইসরায়েলের

আরব দেশ ছাড়া এবার দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ তিন দেশের দিকে দৃষ্টি দিয়েছে ইসরায়েল। দেশ তিনটি হলো- ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও ব্রুনেই। এই তিনটি দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগ গ্রহণের আগ্রহের কথা জানিয়েছে ইসরায়েল। সম্প্রতি সিঙ্গাপুরে নিযুক্ত ইসরায়েলের রাষ্ট্রদূত সাগি কারনি এক সাক্ষাৎকারে এই আগ্রহের কথা জানান। তিন মুসলিম দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপনের আগ্রহের কথা জানিয়ে তিনি আরও বলেন, আমরা (ইসরায়েল) আলোচনার জন্য সবসময় প্রস্তুত। দরজা উন্মুক্ত আছে। আমি মনে করি না, সুসম্পর্ক স্থাপনের পথ খুব একটা কঠিন। দুই রাষ্ট্রিক সমাধান এখন শুধু মুখেই, আগে মধ্যপন্থী অনেক ইসরায়েলি নেতার মুখেই ফিলিস্তিন-ইসরায়েল সংকটে 'দুই রাষ্ট্রিক সমাধানে'র কথা শোনা গেছে। এখন ইসরায়েল কেন, অনেক আরব দেশের নেতাও মুখে সহজে রাষ্ট্রিক সমাধানে'র কথা তোলেন না। তারা মাঝে-মধ্যে ইসরায়েলি দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে নিন্দা জানালেও ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতার কথা কেউ বলেন না। এক্ষেত্রে এখন একমাত্র সোচ্চার ইরান ও তুরস্ক। ইসরায়েলি যখন যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে আবারও দফায় দফায় গাজায় বিমান হামলা চালাল তখন তুরস্ক ও ইরান ছাড়া আর কোন আরব দেশই একটি কথাও বলেনি। আন্তর্জাতিক মহল তো সব সময় ইসরায়েলের

দিকেই ঝুঁকে। গাজার হামাস তাদের কাছে সন্ত্রাসী বলে চিহ্নিত। কিন্তু হামাস কেন সন্ত্রাসী, তার উৎস কেউ খুঁজে দেখেন না।

আর এ জন্য থেমে গেছে আন্তর্জাতিক মহলের শান্তি প্রক্রিয়ার উদ্যোগ। জাতিসংঘ শুধু হামলার নিন্দা জানিয়েই তার দায়িত্ব শেষ করছে। এবার গাজায় দ্বিতীয় দফা হামলাকালেও জাতিসংঘকে দেখা গেছে নীরব। ফলে দুই রাষ্ট্রিক সমাধান কিংবা শান্তি প্রক্রিয়া- এখন মরচে পড়ে গেছে।

এখন পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে যে অধিকাংশ ইসরায়েলি রাজনীতিক, যাদের অন্যতম দেশটির নতুন প্রধানমন্ত্রী নাফতালি বেনেট, পশ্চিম তীরের প্রায় পুরোটাই ইসরায়েলের অঙ্গীভূত করে নিতে আগ্রহী। আর এ কাজে ইসরায়েলের পাশে বরাবরই যুক্তরাষ্ট্র। তবে বর্তমান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন মাঝে মধ্যে দ্বি-রাষ্ট্রিক সমাধানের কথা বললেও এ ক্ষেত্রে তার কোন বাস্তব উদ্যোগ নেই। শুধু মুখে বলেই শেষ। একমাত্র যুক্তরাষ্ট্র উদ্যোগ নিলেই এ ক্ষেত্রে কিছুটা ইতিবাচক ফল মিলতে পারে। কিন্তু তেমন কোন লক্ষণ নেই।

নির্বাচন প্রসঙ্গ ও ফাতাহ-হামাস বিরোধ

এদিকে ২০০৬ সালের ফিলিস্তিনের নির্বাচনে গাজা উপত্যকার নিয়ন্ত্রণ চলে যায় হামাসের হাতে। সেই থেকে আর কোন নির্বাচন নেই। ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস নির্বাচনের উদ্যোগ নিয়েও তা থেকে পিছু হটেছেন। হামাস অবিলম্বে নির্বাচন চায়। কিন্তু ইসরায়েল পূর্ব জেরুজালেমে নির্বাচনের কার্যক্রমের অনুমতি না দেওয়ায় মাহমুদ আব্বাস নির্বাচন স্থগিত ঘোষনা করেন। এ নিয়ে ফাতাহ-হামাস বিরোধ এখন তুঙ্গে।

পশ্চিম তীরের নিয়ন্ত্রণকারী ফাতাহর সঙ্গে হামাসের সম্পর্ক বলতে গেলে এখন দা-কুমড়ার মতো। উভয় পক্ষকে নিয়ে ফিলিস্তিনের জাতীয় সরকার গঠনের চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে। কোনো সুফল আসেনি। হামাসের অভিযোগ, মাহমুদ আব্বাসের নেতৃত্বাধীন ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ অদক্ষ ও দুর্নীতিবাজ। তারা ক্ষমতায় টিকে থাকতে ইসরায়েলি দখলদারিত্ব প্রতিরোধ করার পরিবর্তে আপসের পথ বেছে নিয়েছে। নির্বাচন বন্ধ রেখেছে।

এদিকে গাজা হামাসের নিয়ন্ত্রণে থাকায় শান্তি প্রক্রিয়াসহ সব আলোচনাই এখন প্রায় বন্ধ। ইসরায়েলের কাছে এবং আন্তর্জাতিক মহলে হামাস সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত। হামাসের সঙ্গে কেউ আলোচনায় রাজি নয়। যুক্তরাষ্ট্র নিশ্চুপ, আর এর ফায়দা লুঠছে ইসরায়েল।

স্বপ্ন ক্রমেই মিলিয়ে যাচ্ছে

একদিকে নিজেদের মধ্যে বিরোধ অন্যদিকে ইসরায়েলি হামলা এই উভয় সংকটে ফিলিস্তিনের বাসিন্দারা এখন। এ অবস্থায় ফিলিস্তিনিদের স্বাধীনতার স্বপ্ন যেন ক্রমেই দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে।

নতুন করে ইসরায়েলি বিমান হামলার মধ্য দিয়ে ফিলিস্তিনিদের শঙ্কা ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারণাই সত্যে পরিণত হয়েছে। ইসরায়েলে নেতানিয়াহু যুগের অবসান ঘটলেও নিজেদের দুঃখ-দুর্দশার যে অবসান ঘটছে না, সে আশঙ্কাই করেছিলেন ফিলিস্তিনিরা। তাঁরা মনে করছেন, প্রধানমন্ত্রী নাফতালি বেনেট পূর্বসুরি নেতানিয়াহুর মতোই ফিলিস্তিনিদের সমূলে উৎখাতের বিষয়টিই সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। ইসরায়েলে ক্ষমতার পালাবদলে ফিলিস্তিন নিয়ে তাদের নীতিতে কোনোই পরিবর্তন হবে না। বেনেট সম্প্রতি নিজেকে নেতানিয়াহুর চেয়েও 'অধিকতর ডান' হিসেবে আখ্যায়িত করে বলছেন, স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হবে ইসরায়েলের জন্য আত্মঘাতী। অধিকৃত পশ্চিম তীরে অবৈধ ইয়াহুদী বসতি সম্প্রসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার ডাকও দেন তিনি।

শেষের কথা

তবে হতাশার মাঝেও ক্ষীণ আশার দিকও রয়েছে। ১১ দিনের যুদ্ধ ও গাজায় ইসরায়েলি হামলার পর বিশ্বে ফিলিস্তিন প্রশ্নটি আবার নতুন করে উঠে এসেছে। যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসে ইসরায়েলি হামলার সমালোচনা করে কংগ্রেসম্যানদের বক্তব্য শোনা গেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসন চাইলেও ফিলিস্তিন প্রশ্নটি সম্পূর্ণ এড়িয়ে যেতে পারবে না। যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্বকে আলোচনায় ফিরতে হবে। ১৯৪৮ সালেই যে বিষয়টির সুরাহা হওয়ার কথা তা আজও হয়নি। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও জাতিসংঘের উদ্যোগে ১৯৪৮ সালে ইসরায়েল রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হলো, কিন্তু তাদের প্রতিশ্রুতি মাফিক আজ প্রায় আট দশকেও স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের পত্তন হলো না। শুধু একা ফিলিস্তিন নয়, সমগ্র বিশ্বের শান্তির স্বার্থেই শান্তি ফিলিস্তিন প্রক্রিয়া ও দ্বি-রাষ্ট্রিক সমাধানের বিষয়টি ত্বরান্বিত করা উচিৎ।

(৬ পৃষ্ঠার পর)

দ্বীনের মধ্যে নতুন আবিষ্কার

আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন,

مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِي الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ .

-যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোনো উত্তম রীতি চালু করে সে এর সাওয়াব পাবে এবং যারা পরবর্তীতে এর উপর আমল করবে তাদের সাওয়াবও সে পাবে, এতে পরবর্তী আমলকারীদের সাওয়াবের কোনো কমতি করা হবে না। আর যে ইসলামের মধ্যে কোনো মন্দ রীতি চালু করে তার উপর এর গুনাহ বর্তাবে এবং যারা পরবর্তীতে এর উপর আমল করবে তাদের গুনাহও তার উপর বর্তাবে। এতে পরবর্তী আমলকারীদের গুনাহের কোনো কমতি করা হবে না। (সহীহ মুসলিম)

সুতরাং কোনো এক হাদীসের উপর ভিত্তি করে সকল নতুন আবিষ্কারকে গুমরাহী বলা যাবে না। অনুরূপভাবে হাদীসের মর্ম অনুধাবন না করে কোনো এক হাদীসের বিপরীত সকল আমলকে বিদআত বলা যাবে না। আবার এটিও মনে রাখতে হবে যে, কোনো আমল সুন্নাহ না হলেই তা বিদআত নয়; হতে পারে এটি জায়িয কিংবা মুবাহ। আল্লাহ আমাদের সঠিক বোধশক্তি দান করুন। আমীন।

বাংলা জাতীয় মাসিক
পরওয়ানা
বিজ্ঞাপনের হার

শেষ প্রচ্ছদ (চার রং): ৪০,০০০/-
২য় ও ৩য় প্রচ্ছদ (চার রং): ৩০,০০০/-
ভিতরের পূর্ণ পৃষ্ঠা (সাদা কালো): ১৮,০০০/-
ভিতরের অর্ধ পৃষ্ঠা (সাদা কালো): ১০,০০০/-
ভিতরের সিকি পৃষ্ঠা (সাদা কালো): ৬,০০০/-
ভিতরের পূর্ণ পৃষ্ঠা (চার রং) : ২৫,০০০/-
ভিতরের অর্ধ পৃষ্ঠা (চার রং) : ১২,০০০/-
ভিতরের এক কলাম ৩" ইঞ্চি (সাদা কালো): ৩,০০০/-

বি. দ্র: একসাথে তিন মাসের জন্য ২৫%,
ছয় মাসের জন্য ৩৫% ও
এক বছরের জন্য ৫০% ডিসকাউন্ট দেওয়া হবে।

যোগাযোগ
বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
মাসিক পরওয়ানা
মোবাইল: ০১৭৯৯৬২৯০৯০

ইসরায়েলের কাছে আরবদের পরাজয়
নেপথ্য কারণ

মারজান আহমদ চৌধুরী

যুদ্ধে যাওয়ার সময় এক ইসরায়েলি সৈন্যকে তার মা উপদেশ দিচ্ছেন, "শুনো, তুমি অনবরত যুদ্ধ করবে না। তাহলে ক্লান্ত হয়ে যাবে। একবার মাঠে যাবে, দু-একটি মুসলিম হত্যা করবে, এরপর ব্যারাকে ফিরে এসে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নেবে।" ছেলে প্রশ্ন করল, "কিন্তু মুসলিম সৈন্যরা যদি আমাকে মারতে আসে, তখন কী করব?" মা অবাক হয়ে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, "ওরা তোমাকে কেন মারবে? তুমি তাদের কী ক্ষতি করেছ?"

এটি হচ্ছে প্রায় শতাব্দীব্যাপী চলমান আরব-ইসরায়েল সংঘাতের একটি কৌতুকাবহ প্রতিচ্ছবি, যার পরতে পরতে আরব রাষ্ট্রগুলোর উপর্যুপরি পরাজয়, লজ্জাজনক ব্যর্থতা ও মেরুদণ্ডহীনতার কালো ছাপ লেগে আছে। পশ্চিমা মিডিয়া ও রাজনীতিবিদরা শুরু থেকেই এই সংঘর্ষের নাম দিয়েছে আরব-ইসরায়েল সংঘাত। কিন্তু আপামর মুসলমানদের কাছে এটি মুসলিম উম্মাহ'র সংগ্রাম। এই সংগ্রামে আরব রাষ্ট্রগুলোর পরাজয় আরবের ভূমি কিংবা আরব জাতীয়তাবাদের পরাজয় নয়; বরং মুসলিম উম্মাহ'র পরাজয়। আরবরা ওখানে মুসলিম উম্মাহ'র প্রতিনিধিত্ব করেছিল এবং বারবার ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছিল। মুসলিম উম্মাহ'র কাছে ইসরায়েল 'মধ্যপ্রাচ্যের ক্যান্সার' হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। স্বভাবতই প্রশ্ন আসে, মুসলিম উম্মাহ'র শ্রেষ্ঠতম প্রতিনিধি, অর্থাৎ আরব রাষ্ট্রগুলো জনসংখ্যা, রাজনৈতিক স্থায়িত্ব ও প্রাকৃতিক সম্পদের দিক থেকে ইসরায়েলের তুলনায় বহুগুণ শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও আজ পর্যন্ত কেন এই ক্যান্সারকে অপসারণ করতে পারেনি? ১৯৪৮ সালে ইসরায়েল প্রতিষ্ঠার পরপরই আরব লীগভুক্ত রাষ্ট্র মিসর, ট্রান্সজর্দান, সিরিয়া, লেবানন, ইরাক, সৌদি আরব ও ইয়েমেন ইসরায়েলে আক্রমণ করেছিল। উদ্দেশ্য ছিল ইসরায়েলকে ধ্বংস করে দেওয়া। কিন্তু আরব রাষ্ট্রগুলোর এই প্রচেষ্টা চরম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং ইসরায়েল স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকতে সমর্থ হয়। প্রশ্ন আসে, কেন? এই অবিরাম পরাজয়ের নেপথ্যে কারণ কী?

আসলে জয়-পরাজয় হুট করেই নির্ধারিত হয় না। প্রতিটি সফলতার পেছনে থাকে হাজারো পরিকল্পনা, প্রস্তুতি, সমন্বয় এবং সময় ও সুযোগকে কাজে লাগানোর গল্প, যেগুলো বহুলাংশে পর্দার আড়ালেই রয়ে যায়। একইভাবে প্রতিটি ব্যর্থতার পেছনেও লুকিয়ে থাকে এমন শত শত কারণ, যা পরিসংখ্যানে দেখানো হয় না। মধ্যপ্রাচ্যের দৃশ্যমান বাস্তবতা হচ্ছে, ১৯৪৮ সালে ইসরায়েল নামক ইয়াহুদী রাষ্ট্র গঠন হওয়ার পর থেকে প্রতিবেশী আরব রাষ্ট্রগুলোর সাথে ইসরায়েল মোট ৫টি বড় যুদ্ধে জড়িয়েছে এবং প্রতিবারই উল্লেখযোগ্য ব্যবধানে বিজয়ী হয়েছে। এছাড়া ছোটখাটো সংঘর্ষকে হিসেবে ধরলে সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হবে। তবে এ দৃশ্যমান বাস্তবতার পেছনেও ইসরায়েলের সফলতা ও আরবদের ব্যর্থতার শেকড় আরও গভীরে প্রোথিত, আরও ব্যাপক পরিসরে ব্যাপ্তিত। যায়নিস্ট আন্দোলনের সূচনা থেকে ইসরায়েল গঠন এবং ইসরায়েলের পরবর্তী সামরিক বিজয়গুলো ইয়াহুদী যায়নিস্টদের প্রায় এক শতাব্দীর রাতজাগা পরিশ্রমের ফসল। নয়তো সদ্য জন্ম নেয়া একটি অনাকাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্রের কাছে জনবহুল আরব রাষ্ট্রগুলোর ভূমিধ্বস পরাজয় কোনোভাবেই বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। তবে বাস্তবতা তো বাস্তবতাই। আর সেই বাস্তবতা হচ্ছে, আরবরা ইসরায়েলের কাছে প্রতিবারই পরাজিত হয়েছে। তাই বাস্তবতাকে সামনে রেখে আমরা ইসরায়েলের বিপক্ষে আরব রাষ্ট্রগুলোর ব্যর্থতার কারণ খুঁজেছি।

শুরুতেই একটি বিষয় পরিষ্কার করা উচিৎ। যদিও পৃথিবীর রাজনৈতিক ইতিহাসে লেখা থাকবে যে, আরবরা ইসরায়েলের কাছে পরাজিত হয়েছিল, কিন্তু কথাটি চরম বিভ্রান্তিকর। ফিলিস্তিনকে বাদ দিয়ে পৃথিবীতে মোট ২১টি আরব রাষ্ট্র রয়েছে। সেগুলো হচ্ছে সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইয়ামান, ওমান, কাতার, কুয়েত, বাহরাইন, সৌদি আরব, ইরাক, জর্ডান, লেবানন, সিরিয়া, আলজেরিয়া, তিউনিসিয়া, মরক্কো, মিসর, মৌরিতানিয়া, লিবিয়া, সুদান, জিবুতি, সোমালিয়া এবং ভারত মহাসাগরে অবস্থিত আফ্রিকান দ্বীপরাষ্ট্র কমোরোস। এই রাষ্ট্রগুলোর জনগণ ভাষাগত এবং (কিঞ্চিৎ) জাতিগতভাবে আরব হলেও এদের নিজস্ব ইতিহাস-ঐতিহ্য, কৃষ্টি-কালচার, জাতীয় স্বার্থ এবং ভূরাজনৈতিক বিচার-বিবেচনা রয়েছে। তাত্ত্বিকভাবে, এই ২১টি আরব রাষ্ট্র (ফিলিস্তিনকে বাদ দিয়ে) যদি একত্রিত হয়ে নিজেদের সামগ্রিক শক্তি ইসরায়েলের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করত, তাহলে ইসরায়েলের পক্ষে এক মুহূর্ত টিকে থাকার সুযোগ ছিল না। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, এই রাষ্ট্রগুলোর অধিকাংশই কখনও ইসরায়েলের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেনি। যে কয়েকটি রাষ্ট্র ইসরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, তন্মধ্যে অর্ধেকই ছিল প্রতীকী বা লোক দেখানো। উলটো মরোক্কো সেই প্রথম দিন থেকে ইসরায়েলের একনিষ্ঠ সমর্থক। তলে তলে সৌদি আরব, আমিরাত, ওমান ও বাহরাইন একই তাবুতে ঠাঁই নিয়েছিল। আজ এরা সবাই লজ্জার মাথা খেয়ে ইসরায়েলের কাছে বন্ধুত্বের নামে দান-দক্ষিণা চেয়ে বেড়াচ্ছে। কেবল ৪টি আরব রাষ্ট্র ইসরায়েলের বিরুদ্ধে প্রকৃত অর্থে যুদ্ধ করেছিল এবং ইসরায়েলের কাছে যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত হয়েছিল। এই রাষ্ট্রগুলো হচ্ছে- মিসর, সিরিয়া, জর্ডান ও ইরাক। সুতরাং ইসরায়েল কখনও পুরো আরব বিশ্বকে পরাজিত করেনি, তারা পরাজিত করেছে আরব বিশ্বের একটি ক্ষুদ্র (যদিও উল্লেখযোগ্য) অংশকে।

আরেকটি কথা না বললেই নয়। অধিকাংশ মানুষের ধারণা, এ পর্যন্ত ইসরায়েল ও আরব রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে যতগুলো যুদ্ধ হয়েছে, সবগুলোই ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা ও নির্যাতিত ফিলিস্তিনি মুসলমানদেরকে নিয়ে হয়েছে। এবং অনেকে এটাও ধারণা করেন, এসব যুদ্ধে আরব রাষ্ট্রগুলোর উদ্দেশ্য ছিল ইসরায়েলকে ধ্বংস করে দেওয়া। কিন্তু এই দুইটি ধারণাই কার্যত ভুল। এ পর্যন্ত ইসরায়েল ও আরব রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ৫টি বড় যুদ্ধ হয়েছে। তন্মধ্যে কেবল প্রথম যুদ্ধের (১৯৪৮-৪৯) প্রতিপাদ্য ছিল ফিলিস্তিন এবং কেবল সে যুদ্ধেই আরব রাষ্ট্রগুলোর উদ্দেশ্য ছিল ইসরায়েলকে ধ্বংস করে দেওয়া। অন্য যুদ্ধগুলোর মূল কারণ ফিলিস্তিন ছিল না। ১৯৫৬ সালের যুদ্ধ হয়েছিল সুয়েজ খালের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে; ১৯৬৭ সালের যুদ্ধ হয়েছিল আরব রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে ইসরায়েলের তীব্র দ্বন্দ্ব এবং ইসরায়েলের সম্প্রসারণবাদের কারণে;

১৯৭৩ সালের যুদ্ধ হয়েছিল সিনাই উপদ্বীপ ও গোলান মালভূমি নিয়ে; এবং ১৯৮২ সালের যুদ্ধ হয়েছিল লেবাননের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে। এই চারটি যুদ্ধেই ফিলিস্তিন ছিল খুবই গৌণ ইস্যু। ইসরায়েল ও পশ্চিমাদের মতে, আরব-ইসরায়েল দ্বন্দ্বে আরবরাই বরাবর আগ্রাসি ভূমিকা অবলম্বন করেছে, এবং ইসরায়েল কেবল আত্মরক্ষার জন্য আরব রাষ্ট্রগুলোর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু কার্যত কেবল ১৯৪৮-৪৯ সালের যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোনো যুদ্ধে আরব রাষ্ট্রগুলোকে আগ্রাসি হিসেবে আখ্যায়িত করা যায় না। ১৯৫৬ সালের যুদ্ধে ইসরায়েল, ব্রিটেন ও ফ্রান্স মিসরের ওপর আক্রমণ করেছিল; ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে ইসরায়েল আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ ঘোষণা ব্যতিরেকে মিসর, সিরিয়া ও জর্ডানের ওপর আক্রমণ চালিয়েছিল; ১৯৭৩ সালের যুদ্ধে ইসরায়েল কর্তৃক আগের যুদ্ধে দখলকৃত মিসরীয় ও সিরীয় ভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য মিসর ও সিরিয়া যুদ্ধ করেছিল; এবং ১৯৮২ সালের যুদ্ধে ইসরায়েল লেবাননের ওপর আক্রমণ চালিয়েছিল। অর্থাৎ, আরব-ইসরায়েলি দ্বন্দ্বে প্রথম যুদ্ধটি ছাড়া বাকি প্রতিটি যুদ্ধে ইসরায়েল আগ্রাসি ভূমিকায় ছিল।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, আরব-ইসরায়েল দ্বন্দ্বে আরবদের ব্যর্থতার মূল চিত্রনাট্য রচিত হয়ে গিয়েছিল সেই ১৯৪৮-৪৯ সালের প্রথম যুদ্ধেই। বাকি যুদ্ধগুলো কেবল প্রথম পরাজয়ের প্রতিধ্বনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিজয়ী কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে বিধ্বস্ত ব্রিটেন ফিলিস্তিন থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে নিতে ইচ্ছুক ছিল, যে ফিলিস্তিন তারা দখল করেছিল উসমানী সালতানাতের কাছ থেকে। এজন্য তারা ফিলিস্তিন সমস্যা সমাধান করার জন্য জাতিসংঘের হস্তক্ষেপ আহ্বান করে। ইতোপূর্বে ১৯১৭ সালে ব্রিটিশ ম্যান্ডেটে থাকাকালীন ফিলিস্তিনি ভূমিতে ইয়াহুদীদেরকে বসবাস করার এবং ইয়াহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার অনুমতি দিয়ে রেখেছিল ব্রিটিশ সরকার। প্রথমদিকে ব্রিটেনের এ পদক্ষেপে কারও পক্ষ থেকে তেমন কোনো সমর্থন লক্ষ্য করা যায়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে হিটলারের দ্বারা চরম নির্যাতনের শিকার হওয়ার কারণে ইয়াহুদীদের প্রতি বিশ্বব্যাপী সহানুভূতির সৃষ্টি হয়েছিল। এমতাবস্থায় ১৯৪৭ সালের ২৯ নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ফিলিস্তিনকে তিনভাগে বিভক্ত করার পক্ষে ভোট দেয়। সিদ্ধান্ত হয়, ফিলিস্তিনের ৫৬% ভূমিতে একটি স্বাধীন ইয়াহুদী রাষ্ট্র এবং ৪৩% ভূমিতে একটি স্বাধীন ফিলিস্তিনি আরব রাষ্ট্র স্থাপিত হবে। একই সাথে পবিত্র জেরুজালেম শহর একটি 'আন্তর্জাতিক শহরে' পরিণত হবে। ইয়াহুদীরা এই প্রস্তাব লুফে নেয়। কিন্তু ফিলিস্তিনি আরবরা এবং আরব রাষ্ট্রগুলোর সমন্বয়ে গঠিত 'আরব লীগ' এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। কার্যত এ ধরণের প্রস্তাব গ্রহণ করাও আত্মমর্যাদার বিপরীত ছিল। কিন্তু আরবরা, কিংবা বৃহত্তর অর্থে বললে মুসলমানরা ভুলেই গিয়েছিল যে, আত্মমর্যাদা রক্ষা করে শত্রুর সাথে এক টেবিলে বসে চুক্তি করার সক্ষমতা তারা বহু আগেই খুইয়ে ফেলেছে। মুসলমানরা নিজেদের ঈমান, ঐক্য, বল হারিয়ে ততদিনে ইউরোপের দয়াভিক্ষাকারী হিসেবে পরিণত হয়েছে। পরাজয়ের পেছনের যে গল্পটির কথা আমি আগের কলামে ইঙ্গিত করে এসেছিলাম, এটিই হচ্ছে সেই গল্প। আরবদের একটি বুনিয়াদি এলাকাকে কেটে-ছিড়ে ব্রিটেন ও জাতিসংঘ এর বৃহদাংশ ইয়াহুদীদেরকে দিয়ে দিচ্ছে, অথচ মুসলমানরা কিছুই করতে পারছে না- এটিই ছিল মূল পরাজয়।

জাতিসংঘের ঘোষণার পর ফিলিস্তিনে ইয়াহুদী-আরব সংঘাত ক্রমশ তীব্র আকার ধারণ করে। এমতাবস্থায় ১৯৪৮ সালের ১৪ মে ফিলিস্তিনে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটে এবং একই দিনে ইয়াহুদী নেতা ডেভিড বেন গুরিয়ন স্বাধীন ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়। শুরু হয় মুসলিম গণহত্যা, যা চলেছিল পরবর্তী কয়েক বছর। ইসরায়েল প্রতিষ্ঠার পরদিনই মিসর, জর্ডান, সিরিয়া, ইরাক, লেবানন, সৌদি আরব ও ইয়ামানের সৈন্যরা ফিলিস্তিনে প্রবেশ করে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ইসরায়েলকে ধ্বংস করে দেওয়া।

যুদ্ধের প্রাথমিক পর্যায়ে আরব রাষ্ট্রগুলো আংশিক সাফল্য অর্জন করে। কিন্তু ইসরায়েলিরা তাদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে। দু'দফা জাতিসংঘের যুদ্ধবিরতি চুক্তির পর যুদ্ধের মোড় ঘুরে যেতে শুরু করে। আরব সৈন্যরা পিছু হটতে শুরু করে এবং ইসরায়েলিরা একের পর এক অঞ্চল দখল করতে থাকে। ইসরায়েলিদের পরাজিত করতে ব্যর্থ হয়ে আরব রাষ্ট্রগুলো ১৯৪৯ সালে একে একে যুদ্ধ থেকে নিজেদেরকে প্রত্যাহার করে নেয়। ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে মিসর, মার্চে লেবানন, এপ্রিলে জর্ডান এবং জুলাইয়ে সিরিয়া ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। এর মধ্য দিয়ে প্রথম আরব-ইসরায়েলি যুদ্ধের অবসান ঘটে। এই যুদ্ধে ইসরায়েল যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয় অর্জন করে এবং জাতিসংঘ তাদেরকে ফিলিস্তিনের যে ৫৬% ভূমি প্রদান করেছিল, সেটি তারা নিজেদের অধিকারে রাখতে সক্ষম হয়। এর পাশাপাশি জাতিসংঘ ফিলিস্তিনি আরবদেরকে ফিলিস্তিনের যে অংশ প্রদান করেছিল, তার প্রায় ৬০% ভূমিও ইয়াহুদীরা দখল করে নেয়। পশ্চিম জেরুজালেম ইসরায়েলের হস্তগত হয়। অন্যদিকে আরব রাষ্ট্রগুলো যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু জর্ডান ও মিসরের এই যুদ্ধে তেমন কোনো ক্ষতি হয়নি। বরং এই যুদ্ধের সময় জর্ডান ৫,৬৫৫ বর্গ কি.মি. আয়তনবিশিষ্ট পশ্চিম তীর (ডবংঃ ইধহশ) ও পূর্ব জেরুজালেম দখল করে নেয় এবং এগুলোকে নিজস্ব ভূমি হিসেবে ঘোষণা করে। মিসর ৩৬৫ বর্গ কি.মি. আয়তনবিশিষ্ট গাজা ভূখণ্ড দখল করে। গাজাকে আনুষ্ঠানিকভাবে মিসরের সঙ্গে অঙ্গীভূত করে না নিলেও এ অঞ্চলটি মিসরের সামরিক উপনিবেশে পরিণত হয়।

এবার আসে এই প্রবন্ধের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন- আরব রাষ্ট্রগুলো তাদের জনসংখ্যা ও সম্পদের দিক থেকে ইসরায়েলের তুলনায় শক্তিশালী হয়েও কেন এই যুদ্ধ এবং এর পরবর্তী যুদ্ধসমূহে পরাজিত হয়েছিল? এর নানাবিধ কারণ রয়েছে।

প্রথমত, ৭টি আরব রাষ্ট্র এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেও যুদ্ধ চলাকালে যুদ্ধক্ষেত্রে ইসরায়েলি সৈন্যসংখ্যা ছিল আরবদের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। ১৯৪৮-৪৯ এর যুদ্ধে ইসরায়েল মোট ১,১৭,৫০০ সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়েছিল। ওদিকে ৭টি আরব রাষ্ট্র সম্মিলিতভাবে মাত্র ৫১,১০০ থেকে ৬৩,৫০০ সৈন্যকে ফিলিস্তিনে প্রেরণ করেছিল। অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতি ২ জন ইসরায়েলি সৈন্যের বিপরীতে মাত্র ১ জন আরব সৈন্য ছিল। এবং এটিই স্বাভাবিক যে, যুদ্ধক্ষেত্রে যে পক্ষের সৈন্যসংখ্যা কম, তারা তুলনামূলকভাবে অসুবিধাজনক অবস্থানে থাকবে।

শুধু তাই নয়, এই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আরব রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে প্রকৃত অর্থে যুদ্ধ করেছিল মিসর, ইরাক, জর্ডান এবং সিরিয়া। লেবানন, সৌদি আরব ও ইয়েমেনের অংশগ্রহণ ছিল সম্পূর্ণভাবে প্রতীকী বা লোক দেখানো। যুদ্ধের সময় মিসর ফিলিস্তিনে প্রেরণ করেছিল প্রায় ২০,০০০ সৈন্য, ইরাক প্রেরণ করেছিল প্রায় ১৮,০০০ সৈন্য, জর্ডান প্রেরণ করেছিল প্রায় ১০,০০০ সৈন্য এবং সিরিয়া প্রেরণ করেছিল প্রায় ৫,০০০ সৈন্য। অপরদিকে মাত্র ১,২০০ সৌদি এবং ৩০০ ইয়ামানি সৈন্য এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। ১৯৪৮ সালের জুন মাসে সংঘটিত একটি খণ্ডযুদ্ধ ছাড়া কার্যত লেবানন এই যুদ্ধে অংশগ্রহণই করেনি।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠতে পারে, আরব রাষ্ট্রগুলোর কি যুদ্ধক্ষেত্রে এরচেয়ে বেশি সংখ্যক সৈন্য

প্রেরণের সামর্থ্য ছিল না? জবাব হচ্ছে, তাদের সামর্থ্য ছিল, কিন্তু সেই সামর্থ্যকে তারা কাজে লাগায়নি। কারণ, ফিলিস্তিন বা ফিলিস্তিনি মুসলমানদের স্বার্থরক্ষা কখনও এই আরব রাষ্ট্রগুলোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। মিসর, জর্ডান, সিরিয়া ও ইরাকের ফিলিস্তিন সংক্রান্ত নিজস্ব স্বার্থ ছিল, এজন্যই তারা ফিলিস্তিনে তুলনামূলকভাবে বড় সৈন্যদল পাঠিয়েছিল। অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে লেবাননের এবং ভৌগোলিক দূরত্বের কারণে সৌদি আরব ও ইয়ামানের ফিলিস্তিন নিয়ে বিশেষ আগ্রহ ছিল না। এজন্য তারা নামকাওয়াস্তে এই যুদ্ধে অংশ নিয়ে দায় সেরেছিল।

দ্বিতীয়ত, একে তো আরবদের সৈন্যসংখ্যা ছিল কম, তদুপরি আরব সৈন্যদের তুলনায় ইসরায়েলি সৈন্যদের মনোবল ছিল অনেক বেশি। এ মনোবলই দুই দলের মধ্যে সমুদ্রসম পার্থক্য গড়ে দিয়েছিল। মাত্র কয়েক বছর আগেই ইয়াহুদীরা ইউরোপে ভয়াবহ গণহত্যার শিকার হয়েছিল। সেই আতঙ্কের রেশ তাদের মধ্যে তখনও স্পষ্টভাবে বিদ্যমান ছিল। আরব রাষ্ট্রগুলো যখন ইসরায়েলকে আক্রমণ করে, তখন ইসরায়েলিদের অনেকেই এই ভেবে আতঙ্কিত হয়েছিল যে, তারা নতুন করে একটি গণহত্যার শিকার হতে যাচ্ছে। ফলে প্রাণ রক্ষার তাগিদে তারা যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের চূড়ান্ত সামর্থ্য ব্যবহার করেছিল। অন্যদিকে আরব রাষ্ট্রগুলোর সৈন্যদের এই যুদ্ধের লক্ষ্যবস্তু সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো ধারণাই ছিল না। অন্তত ইয়াহুদীদের ন্যায় এই যুদ্ধে প্রাণ রক্ষার কোনো তাগিদ আরব সৈন্যদের মধ্যে ছিল না, থাকার কথাও নয়। স্বভাবতই তারা তাদের সর্বোচ্চ সামর্থ্য দিয়ে লড়াই করার প্রচেষ্টা চালায়নি। এটি তাদের পরাজয়ের একটি বড় কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

তৃতীয়ত, ইসরায়েল ছিল একটি সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র। এজন্য তাদের কাছে এই যুদ্ধে আরব রাষ্ট্রগুলোর পরাজয়কে একটি 'অতিমানবীয়' ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করা হয়। কিন্তু কার্যত যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আরব রাষ্ট্রগুলোও তেমন সুপ্রতিষ্ঠিত বা স্থিতিশীল ছিল না। এদের মধ্যে মিসর ১৯২২ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্রিটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু কার্যত এই যুদ্ধের সময়েও মিসর ছিল ব্রিটেনের একটি আধা-উপনিবেশ (ংবসর-পড়ষড়হু)। ১৯৫২ সালের পূর্বে মিসর প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা অর্জন করেনি। ইরাক ১৯৩২ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন হয়, কিন্তু কার্যত ইরাকও এই যুদ্ধের সময় ব্রিটেনের একটি আধা-উপনিবেশই ছিল। ১৯৫৮ সালের পূর্বে তাদের প্রকৃত স্বাধীনতা আসেনি। অনুরূপ সিরিয়া ও লেবানন যথাক্রমে ১৯৪৫ ও ১৯৪৩ সালে ফ্রান্সের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা লাভ করে, কিন্তু ১৯৪৬ সালের আগে তারা প্রকৃত স্বাধীনতা পায়নি। জর্ডান কেবল ১৯৪৬ সালেই ব্রিটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে, এবং এই যুদ্ধের সময়েও জর্ডানের সেনাবাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তারা ছিলেন ব্রিটিশ। সৌদি আরব ও ইয়ামান রাজ্য দুইটি যথাক্রমে ১৯৩২ ও ১৯১৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু প্রথম আরব-ইসরায়েলি যুদ্ধের সময়ে এরাও সেরকম অর্থে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল না। সুতরাং, প্রথম আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের সময় সদ্য প্রতিষ্ঠিত ইসরায়েল কার্যত সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত এবং আধা-উপনিবেশ প্রকৃতির কতিপয় আরব রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। এজন্য গুণগতভাবে উভয় পক্ষের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল না। তার ওপর ইসরায়েলি সৈন্যদের মধ্যে এরকম বহুসংখ্যক সৈন্য ছিল, যারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সশস্ত্রবাহিনীর পক্ষে যুদ্ধ করেছিল এবং তাদের আধুনিক যুদ্ধে বিস্তৃত অভিজ্ঞতা ছিল। অনুরূপ কোনো অভিজ্ঞতা আরব রাষ্ট্রগুলোর সৈন্যদের ছিল না।

চতুর্থত, মধ্যপ্রাচ্য বিষয়ক সামরিক বিশ্লেষকদের মতে, ইসরায়েলের প্রকৃত সামরিক সক্ষমতা সম্পর্কে আরব রাষ্ট্রগুলোর কোনো ধারণা ছিল না। বিশেষত মিসরের রাজা ফারুক এবং সিরিয়ার রাষ্ট্রপতি শুকরি আল-কুওয়াতলির উপদেষ্টারা তাদেরকে আশ্বস্ত করেছিলেন, যুদ্ধে আরবরা সহজেই বিজয়ী হতে পারবে। তাই মিসর ও সিরিয়া যুদ্ধে এসেছিল এক প্রকার অন্ধ অবস্থায়। এমতাবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত হওয়াটাই ছিল তাদের জন্য স্বাভাবিক।

পঞ্চমত, আরব রাষ্ট্রগুলো যুদ্ধের সময় তাদের সামরিক কার্যক্রম সমন্বিত করতে পারেনি। ফলে একটি যৌথ সামরিক অভিযানের পরিবর্তে এটি এক একটি বিচ্ছিন্ন সামরিক অভিযানে পরিণত হয় এবং ইসরায়েলিরা একে একে প্রতিটি আরব সৈন্যদলকে পরাজিত করতে সমর্থ হয়। এ বিষয়টি সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়েছে ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে। দেখা গেছে মিসর যখন পশ্চিম দিক থেকে ইসরায়েলে আক্রমণ করেছে, পূর্বদিকের জর্ডান ও উত্তর-পূর্বদিকে অবস্থিত সিরিয়া তখন আক্রমণ না করেই বসে আছে। আবার যখন ইসরায়েল সিরিয়ার সাথে যুদ্ধ করছে, তখন মিসর হাত গুটিয়ে বসে আছে। এই অহেতুক অকর্মণ্যতা ইসরায়েলকে বিশাল সুযোগ এনে দিয়েছিল।

আরবদের সমন্বয়হীনতার মূল কারণ ছিল তাদের পরস্পরবিরোধী লক্ষ্য। এই যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আরব রাষ্ট্রগুলোর প্রত্যেকের ফিলিস্তিন নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্য ছিল। জর্ডানের রাজা প্রথম আব্দুল্লাহ নিজেকে সমগ্র 'উর্বর অর্ধচন্দ্র' (ঋবৎঃরষব ঈৎবংপবহঃ) অঞ্চলের শাসক হিসেবে দেখতে চেয়েছিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে ফিলিস্তিন দখল করতে ইচ্ছুক ছিলেন। যুদ্ধে জর্ডানের মূল উদ্দেশ্য ছিল জেরুজালেমসহ ফিলিস্তিনের যত বেশি সম্ভব ভূমি দখল করে নেওয়া এবং নেগেভ মরুভূমির মধ্য দিয়ে ভূমধ্যসাগরের সঙ্গে ট্রান্সজর্ডানের সরাসরি সংযোগ স্থাপন করা। গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী, যুদ্ধ চলাকালে এ বিষয়ে জর্ডান ও ইসরায়েলের মধ্যে গোপন সমঝোতা হয়েছিল। ইরাক এক্ষেত্রে জর্ডানকে সমর্থন করেছিল। শুনতে অবাক লাগলেও সত্য যে, জর্ডানের রাজপরিবার মক্কার শরীফ (সায়্যিদ) বংশের অংশ। ১ম বিশ্বযুদ্ধের সময় মক্কার শাসনকর্তা শরীফ (সায়্যিদ) হুসাইন ইবন আলী ব্রিটিশদের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে উসমানী সালতানাতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। যেরকম বিদ্রোহ দেড়শ বছর আগে করেছিলেন মুহাম্মদ ইবন আবদুল ওয়াহাব নজদী ও মুহাম্মদ ইবন সৌদ। সেবার পুরস্কারস্বরূপ নজদীরা নজদ এলাকার কর্তৃত্ব পেয়েছিল। এবার পুরস্কারস্বরূপ উসমানী সালতানাত ভেঙ্গে যাওয়ার পর ব্রিটিশরা হুসাইন ইবন আলীর বড় পুত্র আলীকে হিজাযের কর্তৃত্ব দিয়েছিল। কিন্তু মাত্র এক বছরের মাথায় সেই ব্রিটিশদের সহযোগিতায় আবদুল আযীয ইবন সৌদ মক্কার শাসনকর্তা (যিনি নিজেকে রাজা বলতেন) আলী ইবন হুসাইন ইবন আলীকে সরিয়ে দিয়ে মক্কা দখল করে নিয়েছিলেন। শরীফ হুসাইন ইবন আলীর দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন আবদুল্লাহ, যাকে ব্রিটিশরা উপহারস্বরূপ জর্ডানের কর্তৃত্ব দিয়েছিল। তার বংশধররা এখনও জর্ডান শাসন করছেন। শরীফ হুসাইন ইবন আলীর তৃতীয় পুত্র ছিলেন ফায়সাল, যাকে ব্রিটিশরা উপহারস্বরূপ ইরাকের কর্তৃত্ব দিয়েছিল। কিন্তু ইরাকের সেনাবাহিনী ফায়সালের পুরো পরিবারকে হত্যা করে ক্ষমতা দখল করে নিয়েছিল। ইতিহাস কখন কার ভাগ্যে পাল্টায়, বলা মুশকিল।

অন্যদিকে, মিসরের রাজা ফারুক নিজেকে সমগ্র আরব বিশ্বের নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে আগ্রহী ছিলেন। তার লক্ষ্য ছিল দক্ষিণ ফিলিস্তিনের অংশবিশেষ দখল করে নেওয়া। ট্রান্সজর্ডানের প্রভাব হ্রাস করার উদ্দেশ্যে সৌদি আরব মিসরকে সমর্থন দিচ্ছিল। রাজা ফারুকের পরে মিসর যখন জামাল আবদুল নাসিরের হাতে এসেছিল, তখন মিসর থেকে আরব জাতীয়তাবাদের স্লোগান উঠেছিল।

নাসিরের একটি পদক্ষেপও ইসলাম কিংবা মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্য ছিল না। বরং তিনি সবই করেছিলেন তার তথাকথিত আরব জাতীয়তাবাদী চেতনাকে গতি দেয়ার জন্য। অনুরূপ সিরিয়া ও লেবাননের উদ্দেশ্য ছিল উত্তর ফিলিস্তিনের অংশবিশেষ দখল করে নেওয়া। প্রথম আরব-ইসরায়েল যুদ্ধে সিরিয়া ছিল ফ্রান্সের হাত থেকে মুক্ত হওয়া সদ্য স্বাধীন দেশ। পরবর্তীতে বাথ পার্টির নেতৃত্ব সিরিয়া একটি অতি-সেক্যুলার সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আরব রাষ্ট্রগুলোর প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন লক্ষ্য ছিল এবং সকলেই একে অপরকে তীব্র সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখত। এমতাবস্থায় কোনো জোটই কার্যকরী হয় না। যুদ্ধক্ষেত্রে আরব জোটও কার্যকরী কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি। উল্টো কলেবর বাড়িয়ে বদনাম ডেকে এনেছে।

ষষ্ঠত, ইসরায়েলের সেনাবাহিনীর মধ্যে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল, যা আরব রাষ্ট্রগুলোর সেনাবাহিনীর মধ্যে বিন্দুমাত্র উপস্থিত ছিল না। ইসরায়েল সরকার ও সামরিক নেতৃবৃন্দ যুদ্ধের মূল পরিকল্পনা করলেও যুদ্ধক্ষেত্রে তেমন একটা খবরদারি করত না, এখনও করে না। বরং মাঠ পর্যায়ে ছোট ছোট পরিকল্পনা এবং আচমকা আপতিত পরিস্থিতি মুকাবিলায় মাঠের নেতারাই সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এতে করে ইসরায়েল সেনাবাহিনীকে কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় বসে গতি হারাতে হয় না। পক্ষান্তরে আরব রাষ্ট্রগুলো তখনও এবং আজও চরম একনায়কতন্ত্রিক ব্যবস্থায় পরিচালিত হয়। তাই তাদের সেনাবাহিনীও অতিমাত্রায় কেন্দ্রীভূত। প্রতিটি ছোটখাটো সিদ্ধান্ত একেবারে সরাসরি রাজপ্রাসাদ থেকে আসতে হয়। এতে করে আচমকা পরিস্থিতি মোকাবিলা করার বদলে আরব সেনাবাহিনীকে রাজা-বাদশার মর্জির দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। তার ওপর আরব রাষ্ট্রগুলোর সশস্ত্রবাহিনীর মধ্যে চলমান দুর্নীতি এক্ষেত্রে আরও বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। যুদ্ধ পরবর্তী গবেষণায় উঠে এসেছে, মিসর সরকার তাদের সশস্ত্রবাহিনীকে নিম্নমানের সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ করত। এ পরিস্থিতিতে ইসরায়েল যুদ্ধক্ষেত্রে সংখ্যাগত আধিক্য ও দৃঢ় মনোবলের পাশাপাশি অস্ত্রশস্ত্রের ক্ষেত্রেও গুণগত আধিপত্য অর্জন করে আরবদেরকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়।

সপ্তমত, ইসরায়েল প্রথম দিন থেকেই একটি শক্তিশালী গোয়েন্দা ব্যবস্থা তৈরি করতে মনোনিবেশ করেছিল। প্রথমদিকে নাতিভ ও লেকেম নামে ইসরায়েলের দুটি গোয়েন্দা সংস্থা ছিল। আজকে সেগুলো উন্নত হয়ে মোসাদ, আমান ও শাবাক নামে তিনটি বিশ্বমানের গোয়েন্দা সংস্থায় পরিণত হয়েছে। বিশ্বরাজনীতি সম্পর্কে ধারণা আছে অথচ মোসাদের নাম শুনেননি, এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। আজকের ইসরায়েল টিকে থাকার পেছনে মোসাদের অবদান কতটুকু, তা বলে বুঝানো সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে আরব রাষ্ট্রগুলোর উল্লেখযোগ্য কোনো গোয়েন্দা তৎপরতা ছিল না। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে দেখা গেছে, মিসর ইসরায়েলে হামলা করার জন্য উপযুক্ত স্থানে যুদ্ধবিমান জড়ো করেছে। যেদিন হামলা করবে, তার আগের রাতে ইসরায়েলি যুদ্ধবিমান এসে মিসরের বিমান বাহিনীর স্থাপনা গুঁড়িয়ে দিয়ে গেছে। শুধু সেদিনের কথা নয়; বরং আজকের দিনেও পাকিস্তান ও তুরস্ক ব্যতীত মুসলিম বিশ্বের অন্য কোনো দেশে বহিঃবিশ্বে গোয়েন্দা তৎপরতা পরিচালনা করার মতো শক্তিশালী কোনো সংস্থা নেই।

অষ্টমত, যুদ্ধ চলাকালে ইসরায়েল বহির্বিশ্বের সমর্থন ও অস্ত্র-সহযোগিতা লাভ করেছিল, আজও করে আসছে। কিন্তু আরব রাষ্ট্রগুলো অনুরূপ কোনো সমর্থন বা সহযোগিতা লাভ করেনি। তৎকালীন বিশ্বের দুই পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয়েই নিজ নিজ স্বার্থে ইসরায়েলকে সহায়তা করেছিল। যুক্তরাষ্ট্র বরাবরই চোখ-কান বন্ধ করে ইসরায়েলের পক্ষপাতিত্ব করে আসছে। অর্থ, প্রযুক্তি, অস্ত্র সব দিক থেকেই ইসরায়েল যুক্তরাষ্ট্রের সরাসরি মদদপুষ্ট। যুদ্ধ চলাকালে জাতিসংঘ উভয় পক্ষের ওপর অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলেও ইসরায়েল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রগুলো থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়। এছাড়া প্রথমদিকে সোভিয়েত মিত্ররাষ্ট্র চেকোস্লোভাকিয়াও ইসরায়েলকে অস্ত্র সরবরাহ করত। আরব রাষ্ট্রগুলো অনুরূপভাবে অস্ত্র সংগ্রহ করতে পারেনি।

এই ৮টি কারণ ছিল বাহ্যিক, যা ইসরায়েলের কাছে আরব রাষ্ট্রগুলোর উপর্যুপরি পরাজয়ের ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ কারণগুলো যে কোনো সমর-বিশেষজ্ঞের গবেষণায় পাওয়া যাবে। আমিও এগুলো রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও সমরবিদদের গবেষণা থেকে সংগ্রহ করেছি। কিন্তু এর বাইরেও আরব রাষ্ট্রগুলোর বারংবার ব্যর্থতার একটি বড়, সবচেয়ে বড় কারণ ছিল, যা কোনো রাজনৈতিক বিশ্লেষক বা সমরবিদদের লেখনিতে আমি খুঁজে পাইনি। পেয়েছি আল্লাহর পাক কালাম কুরআন শরীফে। সেই কারণটি হচ্ছে, আল্লাহর সাহায্যের অনুপস্থিতি।

আরব রাষ্ট্রগুলো এসব যুদ্ধে জড়িয়েছিল প্রধানত নিজেদের স্বার্থে। কারও স্বার্থ ছিল ভূমি দখল করে নিজেদের কর্তৃত্ব বৃদ্ধি করা, কারও স্বার্থ ছিল বিরোধী কোনো আরব রাষ্ট্রের ক্ষমতা খর্ব করা, কারও স্বার্থ ছিল আরব জাতীয়তাবাদ। একে অন্যের প্রতি তীব্র সন্দেহ ও অনাস্থা পোষণ করত। মুসলিম উম্মাহ'র ধারণা (ঈড়হপবঢ়ঃ) ভেঙ্গে ব্রিটিশরা মুসলমানদেরকে ভৌগলিক বা নৃতাত্ত্বিক জাতীয়তাবাদের যে পাঠ পড়িয়েছিল, সেটি ছিল আরবদের কাছে ধর্মগ্রন্থের ন্যায় পূজ্য। একটি আরব রাষ্ট্রও ইসলামের জন্য যুদ্ধে যায়নি। ভাবখানা এমন, যেন ইসলামের জন্য যুদ্ধ করা নেহায়েত লজ্জার বিষয়। এমনকি নির্যাতিত ফিলিস্তিনি মুসলমানদের জন্য কেবল প্রথম যুদ্ধেই খানিকটা তাড়না ছিল। পরবর্তী যুদ্ধগুলোতে ফিলিস্তিনি মুসলমানদের স্বার্থ আরবদের কাছে খুবই গৌণ ছিল। অথচ আরবরা ভুলে গিয়েছিল যে, আল্লাহ পাক একটিবারও আরবের ভূমি, আরব রাজা-বাদশাদের ক্ষমতালিপ্সা কিংবা আরব জাতীয়তাবাদকে সাহায্য করার ঘোষণা দেননি। বরং ঘোষণা দিয়েছেন মুসলমানদেরকে সাহায্য করার। আল্লাহ স্পষ্টভাবে বলেছেন, وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ-আর মুমিনদেরকে সাহায্য করা তো আমার দায়িত্ব। (সূরা আর-রূম, আয়াত-৪৭)

তোতাপাখির মতো পশ্চিমাদের শেখানো বুলি মুখে নিয়ে আরব রাষ্ট্রগুলো ইসরায়েলের সাথে যুদ্ধগুলোকে আরব-ইসরায়েল সংঘাত ভেবেছিল। ইসলাম প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে ভৌগলিক কর্তৃত্ব এবং নিপীড়িত মুসলিম ভাই-বোনদের রক্তের বিনিময়ে পশ্চিমাদের সন্তুষ্টি কিনতে বসেছিল। তাই তারা 'মুসলিম' হিসেবে যুদ্ধে যায়নি, গিয়েছিল 'আরব' হিসেবে। ফলাফলস্বরূপ যৎসামান্য কিছু ইয়াহুদীর কাছে বারবার মুখ কালো করে ফিরে এসেছে। ঈমানের দুর্বলতা আরবদের মুখে বারবার পরাজয়ের কালিমা লেপন করে দিয়েছে। আজ যখন আরব রাষ্ট্রগুলো এক এক করে ইসরায়েলের সাথে বন্ধুত্বের ঘোষণা দিচ্ছে, সেই ঘোষণার প্রতিটি বাক্যে, প্রতিটি শব্দে, প্রতিটি অক্ষরে মিশে আছে উপর্যুপরি পরাজয়, লজ্জাজনক ব্যর্থতা ও মেরুদণ্ডহীনতার কালো ছাপ।

মাওলানা রূমীর মসনবী শরীফ

আগে নফসের ইঁদুর দমন কর

ড. মাওলানা মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী

যালিম ইয়াহুদী বাদশাহর প্রতারক উজির। খ্রিষ্টানদের মাঝে অনৈক্যের, রক্তপাতের আগুন জ্বালানোর কৌশল হিসেবে নিজের নাক কান কেটে প্রচার করলেন যে, আসলে আমি খ্রিষ্টান। যীশুর অলৌকিক জ্ঞানের ভান্ডার আমি। বাদশাহ বুঝতে পেরে আমাকে এভাবে নাক কান কেটে নির্বাসনে দিয়েছেন। কুটকৌশলে উজির খ্রিষ্টানদের পরম শ্রদ্ধাভাজন ধর্মীয় নেতায় পরিণত হলেন। নানা উপদেশ-নসীহত শুনে পুরো খ্রিষ্টান সমাজ তার অনুগত হয়ে গেল। এভাবে ছয়টি বছর কেটে যায়। দলে দলে ধর্মপ্রাণ খ্রিষ্টানরা তার ফাঁদে, প্রতারণার জালে আটকা পড়তে লাগল। তার ভালোবাসায় এখন তারা পাগলপারা। তাকে মনে করে এ যুগে ঈসার খলিফা, যুগের ত্রাতা। অথচ প্রকৃত প্রস্তাবে সে ছিল দাজ্জাল। মসনবী শরীফে ঘটনার এতদূর বর্ণনায় মাওলানার (রূমীর) ধ্যান চলে গেল আল্লাহর দরবারে।

صد هزاران دام و دانه ست ای خدا
ما چو مرغان حریص بی نوا.

"সাদ হেযা'রা'ন দা'ম ও দা'না'স্ত আয় খোদা'
মা' চো মুর্গা'নে হারীচে বী নওয়া"

'শত-সহস্র ফাঁদ ও দানা ছড়ানো হে খোদা!
আমরা লোভাতুর ক্ষুধার্ত পাখির মত নিঃস্ব।'

হে খোদা! এই জগতে শত-হাজারো ফাঁদ পাতা রয়েছে। সেই ফাঁদে আটকানোর জন্য পাখির আহার শষ্যদানা ছড়ানো-ছিটানো। এখানে আমাদের অবস্থা ক্ষুধার্ত পাখির মতো অসহায় অক্ষম। সামান্য আহারের লোভে শিকারির ছড়ানো দানা খেতে পাখির মতো কখন যে উড়ে পড়ব, জানা নাই। তুমিই আমাদের একমাত্র সহায়।

دم بدم ما بستۀ دام نویم
هریکی گر باز و سیمرغی شویم.

"দম বদম মা' বস্তেয়ে দা'মে নভীম
হার য়্যকী গর বা'য ও সীমোর্গী শভীম"

'প্রতি নিঃশ্বাসে নিত্য নতুন ফাঁদে আমাদের পা বাঁধা,
প্রত্যেকে যদি বাজপাখি, বিহঙ্গমা হই, তবুও যে অসহায়।'

হে আল্লাহ! আমরা প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন ফাঁদে আটকা পড়ছি। আমরা প্রত্যেকে যদি দূর দিগন্তের দুরন্ত বাজপাখি বা পক্ষিরাজ বিহঙ্গমাও হই, বড় জ্ঞানী হই, বিচক্ষণ নেতা হই, কিংবা সাধক তাপসও হই; দেখা যায় নফসের প্রতারণার জালে হঠাৎ আটকে পড়ি। সর্বস্ব হারিয়ে ফেলি। তুমি একটি ফাঁদ থেকে উদ্ধার কর বটে; আবারো মনের অজান্তে আরেক ফাঁদে আটকা পড়ি। আমাদের কলবের যে গুদামঘর। এই গুদামে নেক আমল ও ইবাদতের ধান-গম জমা করি। কিন্তু আমরা নিজেরাই সে ধান-গম হারিয়ে যাবার ব্যবস্থা করি। নফসের কামনা-বাসনা, লোক দেখানো সৎকর্ম, শয়তানী চিন্তা ও কাজেকর্মে ইবাদতসমূহ কলুষিত করি। নিজের বিবেককে কাজে লাগাই না। চিন্তা করি না যে, আমলের গুদামে এই যে লোকসান যাচ্ছে, তা ইঁদুরের কারসাজির ফল। নফসের ইঁদুর সৎকর্মের গোলায় ছিদ্র করেছে। তাই সব সৎ আমল ভেতরে ভেতরে চুরি হয়ে যাচ্ছে। কাজেই-

اول ای جان دفع شر موش کن
وآنگهان در جمع گندم جوش کن

"আউয়াল আই জা'ন দাফএ শররে মূশ কুন
ওয়ান গাহা'ন দর জামএ গান্দুম জূশ কুন"

'ও মন! আগে ইঁদুরের উৎপাত বন্ধ কর
তারপরে গমের মজুদ গড়তে উদ্যোগী হও।'

মূল মসনবীতে পূর্বাপর বয়েতের উপমায় গুদাম বা গোলা বলতে বুঝানো হয়েছে মানুষের ক্বলব ও আত্মা, গম বলতে ইবাদত ও নেক আমলের সঞ্চয়, ইঁদুর মানে শয়তানের কুমন্ত্রণা, নফসের প্ররোচনা। শয়তান তার দোসর নফসে আম্মারার যোগসাজসে মানুষের মনে প্রবেশ করে সন্তর্পণে আধ্যাত্মিক সঞ্চয় ও সম্পদগুলো নষ্ট করে দিচ্ছে। তাই মাওলানার উপদেশ, আগে ইঁদুরের উৎপাত বন্ধ কর। তারপরে ফসল মজুদ গড়ার চেষ্টা কর। সেই চেষ্টা হলো হৃদয়মন একাগ্র হয়ে আল্লাহর দিকে নিবেদিত হওয়া। হুযুরী ক্বলবের সঙ্গে ইবাদত করা।

بشنو از اخبار آن صدر صدور
لا صلوة تم الا بالحضور.

"বেশনো আয আখবা'রে অ'ন সদরে সুদূর
লা সালাতা তাম্মা ইল্লা বিল হুযূর"

'শোনো সেই শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষের এই বাণী আজ
হুযুরী ক্বলব ব্যতিরেকে পূর্ণতা পায় না নামায।'

মসনবী গল্পের পর গল্প দিয়ে সাজানো কাব্যগ্রন্থ। কিন্তু প্রচলিত অর্থে গল্পের বই নয়; বরং গল্পের ছলে মানুষের মনযোগ ধরে রেখে আধ্যাত্মিক রহস্য ব্যাখ্যার অতুলনীয় গ্রন্থ। খ্রিষ্টান বিদ্বেষী প্রতারক উজিরের পরিকল্পনার বর্ণনায়ও মাওলানা সেই নীতি অনুসরণ করেছেন। পাঠকদের গল্পের মাঝ পথে দাঁড় করিয়ে ইবাদত-বন্দেগীর প্রাণসত্তা হুযুরী ক্বলব বা একাগ্রমনে আল্লাহকে হাযির নাযির জেনে ইবাদত করার গুরুত্ব বুঝিয়েছেন। নফসের প্রতারণা সম্পর্কে সদা সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়ে বলেছেন-

گر نه موشی دزد در انبار ماست
گندم اعمال چل ساله کجاست.

"গর না মূশী দুয্‌দ দর আম্বা'রে মা'স্ত
গন্দুমে আ-মা'লে চেল সা'লে কুজা'স্ত"

'আমাদের গুদামে যদি চোর-ইঁদুর না ঢুকেছিল
বল, চল্লিশ বছরের ইবাদতের সঞ্চয় কোথায় গেল?'

হে আল্লাহ্! আমরা প্রতি মুহূর্তে নতুন নতুন ফাঁদে আটকা পড়ছি। আমাদের প্রত্যেকে যদি দূর দিগন্তের দুরন্ত বাজপাখি বা বিহঙ্গও হই, তবুও শিকারির পাতানো ফাঁদে আটকা পড়ে যাই। বাজপাখির আহার উর্ধ্ব আকাশে। বিহঙ্গ তো পক্ষীরাজ, আহারের জন্য নিচে নামে না। আমরা যদি নিজেদের সেই দুই পক্ষীর মত উন্নত শক্তিমান বলেও ভাবি, তবুও দেখা যায় লোভে বরাবর নফসের প্রতারণার জালে আটকা পড়ে যাই। আমাদের অবস্থা হল :

می‌رهانی هر دمی ما را و باز
سوی دامی می‌رویم ای بی‌نیاز
"মী রাহা'নী হারদামী মা'রা' ও বা'য
সূয়ে দা'মী মী রাভীম এই বে নিয়া'য"
তুমি প্রতি মুহূর্তে আমাদের ফাঁদ থেকে উদ্ধার কর
কিন্তু আরেক ফাঁদের দিকে দৌড়াই, হে অমুখাপেক্ষী!

হে বেনিয়ায-অমুখাপেক্ষী খোদা! আপনার অপার দয়া ও রহমতে আমাদেরকে প্রতি মুহূর্তে একেক ফাঁদ থেকে উদ্ধার করেন বটে, কিন্তু আমরা আবারো নতুন ফাঁদের দিকে দৌড়ে যাই। উদাহরণ স্বরূপ-

ما درین انبار گندم می کنیم
گندم جمع آمده گم می کنیم
"মা' দারঈন আম্বা'র গান্দুম মী কুনীম
গান্দুমে জাম্ আ'মাদে গুম মী কুনীম"
আমরা এই গুদামে গম জমা করি বটে
কিন্তু জমানো গম যে আবার হারিয়ে ফেলি!

আমাদের ক্বলবের গুদাম ঘরে আমরা নেকআমল ও ইবাদতের গম জমা করি; কিন্তু আমরা নিজেরাই সেই গম হারিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করি। নফসের খাহেশ, (প্রবৃত্তির তাড়না) জৈবিক চাহিদা ও শয়তানী চাল-চরিত্রে আমাদের আমলসমূহ বরবাদ হয়ে যায়।

می‌نیندیشیم آخر ما بهوش
کین خلل در گندمست از مکر موش
মী নয়ান্দীশীম আ'খের মা' বেহুঁশ
কিন্ খলল্ দার গান্দুমাস্ত আয্ মকরে মূশ
আমরা বিবেকের সাহায্যে চিন্তা করে দেখি না,
গমের মধ্যে এই যে ঘাটতি, তা ইঁদুরের প্রতারণার ফল।

আমাদের ক্বলব হচ্ছে আমল ও ইবাদতের গুদাম। এ যেন গমের গুদামঘর। গুদামের গম যে ভেতরে ভেতরে চুরি হয়ে যাচ্ছে, তার কারণ আমরা চিন্তা করে দেখি না। তাহলে বুঝতে পারতাম যে, ইঁদুররূপী শয়তান আমাদের ক্বলবের গুদামে প্রবেশ করেছে।

موش تا انبار ما حفره زدست
واز فنش انبار ما ویران شدست
মূশ' তা আম্বা'রে মা' হুফ্রে যাদাস্ত
ওয়ায্ ফানাশ্ আম্বা'রে মা' ওয়েইরা'ন শুদাস্ত
যখন থেকে ইঁদুর আমাদের গুদামে গর্ত খুঁড়েছে,
তার কূট-কৌশলে আমাদের গুদাম উজাড় হয়ে যাচ্ছে।

গমের গোলায় ইঁদুর প্রবেশের মত আমাদের ক্বলবে শয়তান প্রবেশ করে ভেতরে ভেতরে সব শেষ করে দিচ্ছে। অথচ আমরা তা বুঝতে পারছি না।

ریزه‌ریزه صدق هر روزه چرا
جمع می‌ناید درین انبار ما
রীযে রীযে সিদ্‌ক্বে হার রূযে চেরা'
জাম্ মী না'য়াদ দারঈন আম্বা'রে মা'
প্রতিদিনের সততা ও সাওয়াবের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা
আমাদের এই গুদামে কেন সঞ্চিত হয় না?

জীবনের এতটি বছর চলে গেল। এত ইবাদত-বন্দেগী, নেককাজ আঞ্জাম দিলাম। এরপরও আমাদের ক্বলবের গুদাম পূর্ণ হল না কেন? প্রতিদিনই তো সৎকর্মের কণা জমানো হচ্ছে। এর মজুদ দেখা যাচ্ছে না কেন?

بس ستارهٔ آتش از آهن جهید
وان دل سوزیده پذرفت و کشید
বস্ সেতা'রে আ'তাশ আয আ'হান জাহীদ
ওয়া'ন দেলে সূযীদে পায্‌রোফত্ ও কাশীদ
আগুনের বহু ঝিলিক পাথর থেকে উত্থিত হয়
তা গ্রহণ ও বরণ করে দগ্ধীভূত হৃদয়।

সৎকর্ম ও সৎ চিন্তার প্রভাব প্রথমত মানুষের হৃদয়পটে অগ্নি স্ফুলিঙ্গের মত জ্বলে ওঠে। এই স্ফুলিঙ্গ যতই চমকায় ততই হৃদয়ে স্থিতি লাভ করে। তখন হৃদয় আলোকিত হয়ে যায়। 'দগ্ধীভূত বা পোড়া হৃদয় তা গ্রহণ ও বরণ করে' বলতে তাই বুঝানো হয়েছে।

لیک در ظلمت یکی دزدی نهان
می‌نهد انگشت بر استارگان
লে-কে দার যুলমাত য়্যকী দুয্‌দী নেহা'ন
মী নাহাদ আঙ্গোশ্‌ত্ বার এস্তা'রেগা'ন
কিন্তু আঁধারে চুপিসারে কোনো চোর এসে
সেই স্ফুলিঙ্গের উপর আঙ্গুল চাপা দেয়।

মাওলানা গ্রাম্য জীবনের একটি অভিজ্ঞতা ও প্রবাদ দিয়ে অতি উচ্চমানের আধ্যাত্মিক বিষয়ের দীক্ষা দিয়েছেন। গ্রামে ছিঁচকে চোর সিঁদ কেটে গৃহস্থের বাড়িতে ঢোকে। কীসের একটি শব্দ শুনে গৃহস্থের ঘুম ভেঙ্গে যায়। তখনো দিয়াশলাইয়ের প্রচলন হয়নি। গৃহস্থ চকমকি পাথর ঘষে আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করে। চোর গৃহস্থের সতর্কতা টের পেয়ে যায়। চুপিসারে গৃহস্থের সামনে অন্ধকারে বসে প্রদীপ জ্বালানোর চেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়। পাথরে ঘষা দিতেই অগ্নি স্ফুলিঙ্গ জ্বলে ওঠে; কিন্তু চোর তা বারবার হাতের হাওয়া দিয়ে নিভিয়ে দেয়। মানব হৃদয়ে সৎকর্মের আলো জ্বালানোর চেষ্টার মুখে শয়তানের কারসাজিকে মাওলানা এই অতি সাধারণ উদাহরণ দিয়ে চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন।

می‌کشد استارگان را یک به یک
تا که نفروزد چراغی از فلک
মী কুশদ এস্তা'রেগা'ন রা' য়্যক ব য়্যক
তা'কে নাফরূযাদ্ চেরা'গ্বী আয্ ফালাক
আগুনের স্ফুলিঙ্গগুলো কেটে দেয় একে একে নিভিয়ে
আসমানী কোনো বাতি যেন জ্বলে উঠতে না পারে।

নফস শয়তান তথা কামনা-বাসনার চোর আঙ্গুল হেলনের কায়দায় আলোর স্ফুলিঙ্গগুলো নিভিয়ে দিচ্ছে, যাতে আধ্যাত্মিক কোনো বাতি তার হৃদয়ে প্রজ্বলিত হতে না পারে। মানুষ যখন ইবাদত-বন্দেগী করে তখন ক্বলবে আলোর ঝলক সৃষ্টি হয়। আধ্যাত্মিক প্রেমিক সাধকের পোড়া হৃদয় সেই আলো গ্রহণ করে। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে চোরের মত নফস শয়তান সেই আগুনের ঝলক, লোক দেখানোর প্রবণতা, অহংকার, খারাপ চরিত্র প্রভৃতির ওয়াসওয়াসা সৃষ্টি করে বার বার নিভিয়ে দেয়। মাওলানা বলছেন, হৃদয় রাজ্যে যে আলোক বাতি জ্বলে উঠে তা উর্ধ্বজগত হতেই হয়। কিন্তু শয়তানের নানা প্রতারণায় সে আলো জ্বলে উঠতে দেয় না। তোমার সতর্কতাই শয়তানের প্রতারণাকে দমন করতে পারে।

(মাওলানা রূমীর মসনবী শরীফ, ১খ. বয়েত: ৩৭৪-৩৮৬)

স্মরণ

আল্লামা ছালিক আহমদ (র.)
ইলমে হাদীসের এক দীপ্তিমান তারকা

আখতার হোসাইন জাহেদ

হযরত মাওলানা ছালিক আহমদ (র.) ছিলেন একজন নিভৃতচারী আলিমে দ্বীন, প্রাজ্ঞ মুহাদ্দিস ও আশিকে রাসূল। সৃষ্টির চিরায়ত নিয়মে গত ২৪ জুন, ২০২১ বৃহস্পতিবার তিনি মাওলায়ে হাকীকীর সান্নিধ্যে পাড়ি জমিয়েছেন। তিনি সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলাধীন লামাকাজী ইউনিয়নের ভূরকী (পীর বাড়ী) গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত ধার্মিক পরিবারে ১৯৬৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা পীর আবুল লেইছ ছিলেন এলাকার একজন স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব।

গ্রামের মসজিদের মক্তবে হযরত মাওলানা ছালিক আহমদ (র.) এর লেখাপড়ার হাতেখড়ি। এরপর পার্শ্ববর্তী কাজীবাড়ি মাদরাসায় প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে তিনি ভর্তি হন সৎপুর টাইটেল মাদরাসায়। তিনি এ মাদরাসা থেকে পর্যায়ক্রমে দাখিল, আলিম ও ফাযিল পাশ করে ১৯৯০ সালে প্রথম বিভাগে কৃতিত্বের সাথে কামিল জামাত সমাপন করেন এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৯৭ সালে ইসলামিক স্ট্যাডিজে প্রথম বিভাগে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন।

১৯৯০ সালে কামিল পাশ করার পর ১৯৯১ সাল থেকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত সিলেটের জকিগঞ্জ সিনিয়র ফাযিল মাদরাসা ও ইছামতি কামিল মাদরাসায় ৪ বছর শিক্ষকতার পর তিনি নিজ প্রতিষ্ঠান সৎপুর কামিল মাদরাসায় ১৯৯৫ সালে আরবী প্রভাষক হিসাবে যোগদান করেন। এ প্রতিষ্ঠানে তিনি পর্যায়ক্রমে প্রভাষক, সহকারী অধ্যাপক ও মুহাদ্দিস, সর্বশেষ ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত উপাধ্যক্ষ পদে দায়িত্ব পালন করেন।

প্রথিতযশা এ আলিমে দ্বীন ছিলেন উপমহাদেশের প্রখ্যাত ওলীয়ে কামিল শামসুল উলামা হযরত আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) এর একজন সুযোগ্য অনুসারী ও অনুগামী। তাঁর নিকটই তিনি ইলমে তাসাওউফের দীক্ষা গ্রহণ করেন। হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহর কাছ থেকে তিনি ইলমে কিরাত, ইলমে হাদীস ও দালাইলুল খাইরাত শরীফের সনদ লাভে ধন্য হন। শাইখুল হাদীস আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী বড় ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী'র নিকট থেকেও তিনি ইলমে হাদীস ও দালাইলুল খাইরাত শরীফের সনদ লাভ করেছেন। তাছাড়া শাইখুল হাদীস হযরত আল্লামা হবিবুর রহমান ছাহেব এর কাছ থেকেও ইলমে হাদীসের সনদ লাভ করেন। তাঁর হাদীসের উল্লেখযোগ্য উস্তাযগণের মধ্যে রয়েছেন, হযরত মাওলানা আব্দুল হাই ছাতকী, হযরত আল্লামা রইছ উদ্দিন হামজাপুরী (র.), হযরত মাওলানা শফিকুর রহমান পাকিছিরী ও মাওলানা কমরুদ্দীন আগিরামী (র.) প্রমুখ।

মাওলানা ছালিক আহমদ (র.) সারা জীবন ইলমে দ্বীনের খিদমতে কাটিয়েছেন। তাঁর হাদীসের দরসগুলো ছিল পাণ্ডিত্যপূর্ণ। হাদীসের প্রতি তাঁর এতো অনুরাগ ছিল যে, তাঁর ধ্যানে, মন-মননে সবসময় ছিল হাদীসে নববী। তাঁর এক বর্ণনায় জানা যায়, একবার হজ্জের সফরে মসজিদে নববীতে চল্লিশ ওয়াক্ত নামাযের ফযীলত সম্পর্কিত হাদীসের সনদের সবলতা ও দুর্বলতা নিয়ে তাঁর মনে প্রশ্ন জাগলে রাত্রে স্বপ্নে দেয়ালে সনদসহ হাদীসখানা দেখতে পেয়ে তিনি প্রশান্ত হন। একদিন সৎপুর মাদরাসায় কামিল জামাতের হাদীসের দরসে হুযুরের মধ্যে হঠাৎ একটু কাঁদো কাঁদো ভাব আসে, ছাত্ররা এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে বললেন, এটা মুসালসাল বিষয়। সব শাইখগণ এরকম করতেন। সহীহ বুখারীর প্রতি তাঁর এমন অগাধ আস্থা ছিল যে, তিনি বলেছেন, বুখারী শরীফের খতমের বদৌলতে তিনি কঠিন রোগ থেকে মুক্তি লাভ করেছিলেন।

হাদীসে নববীর খিদমতের পাশাপাশি দ্বীনের একজন দাঈ-মুবাল্লিগ হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর তালীম-তরবিয়ত, বয়ান-নসীহত ছিল দালিলিক এবং মাধুর্যপূর্ণ। যে কাউকে তার বয়ান মুগ্ধ করত। এক্ষেত্রে তাঁর পথিকৃৎ ছিলেন হযরত আল্লামা রইছ উদ্দিন হামজাপুরী (র.)।

ইলমে কিরাতের খিদমতেও তিনি আজীবন নিবেদিত ছিলেন। তিনি ১৯৮১ সালে হযরত ফুলতলী ছাহেব কিবলাহ (র.) এর কাছ থেকে ইলমে কিরাতের সনদ লাভ করে দারুল কিরাত মজিদিয়া ফুলতলী ট্রাস্টের খিদমতে নিজেকে আজীবন নিয়োজিত রেখেছিলেন। ছাহেব কিবলাহ ফুলতলী (র.) ছাড়াও তিনি আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী, আল্লামা নজমুদ্দীন চৌধুরী ও আল্লামা গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলীর কাছে কিরাতের তালীম ও বিশেষ সান্নিধ্য লাভ করেন। তিনি দারুল কিরাতের ভূরকী হাবিবিয়া হাফিজিয়া দাখিল মাদরাসা শাখার দীর্ঘদিনের প্রধান কারী ও নাযিম এবং ট্রাস্টের পরিদর্শক ও প্রধান কেন্দ্রের পরীক্ষক হিসেবে জীবনের শেষ অবধি কাজ করে গেছেন। ইন্তিকালের আগের সপ্তাহ পর্যন্ত তিনি ট্রাস্টের প্রধানকেন্দ্র ফুলতলী ছাহেব বাড়ি'র ছাদিছ জামাতের পরীক্ষা গ্রহণে নিয়োজিত ছিলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রতি তাঁর মুহাব্বাত এত বেশি ছিল যে, সকল কাজেই তিনি সুন্নতে রাসূলের অনুসরণ করতেন। তিনি ছিলেন সীরতে-সুরতে, আমলে-আখলাকে সুন্নতে নববীর একজন যোগ্যতম উত্তরাধিকার। সবসময় তাকে বিভিন্ন দুরুদ শরীফ পাঠ করতে দেখা যেত এবং তিনি তাঁর প্রতিটি বয়ানেই দুরূদ শরীফের ফযীলতের বিষয়টি রাখতেন। তিনি ছিলেন একজন খাঁটি আশিকে রাসূল। বিশ্বস্থ সূত্রে জানা যায়, দীদারে মুস্তফা তাঁর নসীব হয়েছিল।

তিনি একজন সফল সংগঠকও ছিলেন। তিনি বাংলাদেশ আনজুমানে আল ইসলাহর কেন্দ্রীয় সদস্য ও লতিফিয়া কারী সোসাইটি বিশ্বনাথ উত্তর উপজেলা শাখার দীর্ঘদিনের সফল সভাপতি হিসেবে ইন্তিকালের আগ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেছেন।

তিনি ছিলেন একজন সুলেখক। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, স্মারক, ম্যাগাজিনে প্রকাশিত তাঁর লেখাগুলো পড়লে এবং তাঁর জীবন ও কর্ম পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে তিনি কতটা সব্যসাচী ছিলেন। ইন্তিকালের চার/পাঁচ দিন আগে মাসিক পরওয়ানায় পাঠানো স্বহস্তে লিখিত ২৩ পৃষ্ঠার প্রবন্ধটি ছিল তাঁর সর্বশেষ গবেষণাকর্ম (পরওয়ানা বর্তমান সংখ্যা, জুলাই ২০২১-এ মুদ্রিত)। তাঁর হস্তলিপি এত সুন্দর এবং নিখুঁত ছিল যে, দেখলে যে কারো চোখ জুড়াতো।

ক্ষণজন্মা এ মনীষী আমাদের থেকে চলে গেলেও তাঁর রেখে যাওয়া ইলিম-আখলাক সিনায় সিনায় প্রবহমান থাকবে কিয়ামত অবধি। আল্লাহ তাঁকে জান্নাতের সর্বোচ্চ মাকাম দান করুন। আমীন।

ইসলামের দৃষ্টিতে বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব

আফতাব চৌধুরী

কোনও স্থানের প্রাকৃতিক পরিবেশ বলতে আমরা সাধারণত সে স্থানের মাটি, বায়ু, পানি, জীব ও জড় জগতের অবস্থানকেই বুঝি। মানুষ ও প্রাণীর জীবন ধারণের জন্য বিশুদ্ধ বায়ু, পানি ও মাটি যেমন অপরিহার্য তেমনই উদ্ভিদ জগতের সহাবস্থানও অত্যাবশ্যক। পৃথিবীতে জনবিস্ফোরণ, ব্যাপক শিল্পায়ন তথা বড় বড় কলকারখানা স্থাপন, যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক সম্পদের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার, কৃষি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে রাসায়নিক দ্রব্যের প্রয়োগ, এমনকি অনেক কাজে বিশেষভাবে যুদ্ধকালীন তেজস্ক্রিয় পদার্থের অমানবিক ব্যবহার ইত্যাদি মাটি, পানি, বায়ু ও উদ্ভিদ জগতের উপর ব্যাপক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে। ফলে বায়ুদূষণ, পানি দূষণ, মাটি দূষণ এমনকি শব্দ দূষণজনিত মারাত্মক সমস্যাবলীর সৃষ্টি হয়ে মানব জাতির জন্য সমূহ বিপদ ডেকে আনছে। ব্যাপক দূষণের ফলে গ্রিনহাউস এফেক্টের জন্য গেন্ডাবাল ওয়ার্মিং বৃদ্ধি হচ্ছে। এতে পৃথিবীপৃষ্ঠে প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রবণতা অপ্রত্যাশিতভাবে বেড়ে চলেছে। এমনকি বরফ গলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে সমুদ্র উপকূলের দেশগুলো কালক্রমে সমুদ্রের পানিতে তলিয়ে যেতে পারে। বায়ুদূষণের ব্যাপক প্রভাবে ঐতিহাসিক কীর্তিচিহ্ন গুলোরও ক্ষতিসাধন হচ্ছে। যেমন আগ্রার তাজমহলে মার্বেল পাথরের ক্ষতির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

যাই হোক, পরিবেশ ধ্বংস ও এর কুপ্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা বক্ষ্যমান নিবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। আজ বিশ্বসম্প্রদায় এ অপ্রত্যাশিত সঙ্কট নিয়ে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। বলা যেতে পারে, মানবজাতি আজ অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন। একদিকে অর্থ, সম্পদ, বিলাসিতা ও ক্ষমতার লোভ ইত্যাদি মানবিক প্রবৃত্তি অন্যদিকে, নিজেদের অস্তিত্বের সঙ্কট। এ সঙ্কট নিরসনে মানবজাতিকে সতর্ক করতে সমগ্র বিশ্বজুড়ে পরিবেশ সুরক্ষা নিয়ে জনমত গঠন করা হচ্ছে। ১৯৯২ সালের জুন মাসে ব্রাজিলের রিও ডি জেনেরো শহরে হয়েছিল United Nations Conference on Environment and Development যেটি Earth summit হিসেবে ব্যাপকভাবে পরিচিত। পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রই এখন এ ব্যাপারে গভীরভাবে সচেতন। প্রকৃতিপ্রেমী অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনও পরিবেশ সুরক্ষা আন্দোলনে শামিল হচ্ছে। দূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশে নানা আইন প্রবর্তন করা হয়েছে এবং গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে চলেছে। প্রতি বছর ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করে গণজাগরণ সৃষ্টির প্রয়াস চালানো হচ্ছে। বিভিন্ন পর্যায়ে এত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও পরিবেশ সুরক্ষা আন্দোলন অদ্যাবধি গণআন্দোলন বা গণসচেতনতার আকার নিতে পারেনি বরং বলা যায় যে, শুধু জ্ঞান বা সচেতনতা কোন সমস্যার জন্য সমাধান হতে পারে না, যদি না তার মধ্যে মূল্যবোধ সৃষ্টি হয়। অতএব, পরিবেশ সুরক্ষার জন্য ধর্ম, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও ঐতিহ্যের প্রভাব নিয়ে চিন্তাচর্চা করার প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ ধর্মীয় বিশ্বাস ও শিক্ষার দ্বারা পরিচালিত বা নিয়ন্ত্রিত, যদিও ধর্মীয় মূল্যবোধ শিক্ষা ভোগবাদী সমাজ কর্তৃক অনেক ক্ষেত্রে পরিত্যক্ত। তবে বাস্তব কথা হল, বিশ্বের সকল ধর্ম শিক্ষায়ই পরিবেশ সুরক্ষার জন্য সতর্ক থাকতে মানবজাতিকে দিক নির্দেশনা দিয়েছে। এখানে এ বিষয়ে ইসলাম ধর্মের শিক্ষা ও দৃষ্টিকোন নিয়ে আলোচনা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়।

ইসলাম শুধু একটি আচার সর্বস্ব ধর্ম নয়, বরং এক মহান জীবন বিধান। মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলাম ধর্ম যথোপযুক্ত দিক নির্দেশনা দিয়েছে। আজ থেকে ১৪০০ বছরেরও অধিককাল পূর্বে মরু আরবের মাটিতে ইসলামের শান্তি বার্তা নিয়ে এসেছিলেন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ। তখনকার দিনে হয়তো পরিবেশ সুরক্ষার চিন্তা মানুষের চেতনায় বা চিন্তনে আসেনি। তথাপিও ঐশীগ্রন্থ পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন বাণীতে প্রাকৃতিক পরিবেশ নিয়ে মানব জাতিকে সতর্ক করা হয়েছে। ইসলামের শিক্ষানুযায়ী আল্লাহ তাআলা মানব জাতিকে প্রাণী, উদ্ভিদ, পানি, মাটি, বায়ু প্রভৃতি প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা প্রদান করেননি। শুধুমাত্র যথা প্রয়োজনে পরিমিত ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন যাতে তাঁরই প্রতিনিধি (মানুষ) পৃথিবীতে সুস্থ জীবন যাপন করতে পারে। বিশ্বপ্রভু এ জগতকে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতির মধ্যে সৃষ্টি করেছেন যার পরিবর্তন, সঙ্কোচন বা পরিবর্ধন মানুষের হাতে দেওয়া হয়নি। এ মর্মে পবিত্র কুরআনের ঘোষণা তুমি (মুহাম্মাদ) একনিষ্টভাবে নিজেকে ধর্মে প্রতিষ্ঠিত কর, আর আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর প্রকৃতির কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সঠিক ধর্ম (সূরা রূম, আয়াত-৩০)। কুরআনে আরও ঘোষণা করা হয়েছে, নিশ্চয়ই, আমি (আল্লাহ) প্রত্যেক বস্তুকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছি (সূরা আল কামার, আয়াত-৪৯)। অন্যত্র আল্লাহ তাআলা বলেন, পৃথিবীকে আমি (আল্লাহ) বিস্তৃত করেছি এবং এতে পর্বতমালা সৃষ্টি করেছি। আমি পৃথিবীতে প্রত্যেক বস্তু সুপরিমিতভাবে সৃষ্টি করেছি (সূরা আল হিজর, আয়াত-১৯)।

তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানা করে দিয়েছেন। তিনি আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন এবং তা দিয়ে বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন করেন জোড়া জোড়া হিসেবে (সূরা ত্বা-হা, আয়াত-৫৩)। পৃথিবীতে বিচরণশীল এমন জীব নেই অথবা নিজ ডানার সাহায্যে এমন পাখি উড়ে না যারা তোমাদের মত একটি দল নয়। (সূরা আনআম, আয়াত-৩৮)

মহানবী হযরত মুহাম্মাদ ﷺ মাটি ও পানির সংরক্ষণ এবং পশু-পক্ষী, উদ্ভিদ, এমনকি কীট-পতঙ্গের প্রতি সদ্ব্যবহারের জন্য অতিশয় সচেষ্ট ছিলেন। তিনি বলেছেন, এ পৃথিবী আমার জন্য একটি মসজিদ রূপে সৃষ্টি করা হয়েছে, তা দিয়ে আমি যেন আত্মশুদ্ধি করে নিই। প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষার প্রধান মাধ্যম হল বৃক্ষরোপণ। এ প্রসঙ্গে হযরত মুহাম্মাদ ﷺ বলেছেন, যখন কোনও বিশ্বাসী গাছের চারা রোপণ করে বা শস্য বুনে এবং এ থেকে মানুষ, পাখি বা পশু তাদের আহার্য গ্রহণ করে তখন তা তার (রোপণকারীর) জন্য একটি সাদকাহ (দান) হিসেবে বিবেচিত হয়। রাসূল ﷺ বৃক্ষরোপণে মানবজাতিকে উৎসাহিত করে আদেশ করেছেন, যদি নিশ্চিতভাবে জানো যে কিয়ামত সন্নিকটে এবং তোমার হাতে একটি চারা বা বীজ আছে, তথাপি-ও তা রোপণ কর। অপ্রয়োজনে গাছের একটি পাতাও ছিড়তে বারণ করেছেন আল্লাহর রাসূল ﷺ। তিনি ঘোষণা করেছেন প্রত্যেক জীবিত পাতাই আল্লাহর গুণগান করে। যেখানে অহেতুক একটি পাতাও ছিড়তে বারণ করা হয়েছে সেখানে নির্বিচারে বৃক্ষচ্ছেদন নিশ্চিতভাবে অপরাধ। যুদ্ধকালীন অবস্থায় গাছপালা তথা বনাঞ্চল ধ্বংস করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছিলেন তিনি। প্রাণীর সংরক্ষণের উপর সতর্ক দৃষ্টি দিয়েছে শান্তির ধর্ম ইসলাম। পবিত্র কুরআনে একটি প্রাণীর অহেতুক হত্যাকে সমগ্র মানবতার হত্যা হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে এবং একটি প্রাণীর রক্ষাকে সমস্ত মানবতার রক্ষার সমতুল্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে (সূরা মায়িদা, আয়াত-৩২)। পশুদের প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়ে এদের ক্ষুধার্ত রাখতে নিষেধ করেছেন আল্লাহর রাসূল ﷺ। তিনি বলেছেন মূক প্রাণীদের বেলায় আল্লাহকে ভয় কর। পশুদের পিঠকে তোমাদের আসন বানিয়ে নিও না। পক্ষী কূলের সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব আরোপ করে রাসূল ﷺ বলেছেন, যদি কেউ অন্যায়ভাবে একটি চড়ুই পাখিকে হত্যা করে তবে এর জন্য তাকে আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি হতে হবে। এমনকি অন্যায়ভাবে পিপীলিকা পর্যন্ত মারতে নিষেধ করেছেন আল্লাহর রাসূল ﷺ।

হযরত মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর সৃষ্টিকে ভালোবাসতে প্রেরণা দিয়ে ঘোষণা করেছেন, আল্লাহকে জানার পর তার সৃষ্টিকে ভালোবাসাই প্রকৃত জ্ঞানের পরিচায়ক। মাটি, পানি, বন ও বন্য প্রাণী সংরক্ষণের জন্য তিনি সংরক্ষিত এলাকা গঠন করার কথা ভেবেছিলেন আজ থেকে চৌদ্দশত বছর আগে। তাঁর আদেশে পবিত্র মক্কায় গঠিত বনরাজি আজও স্বমহিমায় বিদ্যমান। পরবর্তী কালে এ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইসলামী বিশেষজ্ঞগণ শিকার করা বন্ধ রেখেছেন। এমনকী জ্বালানী কাঠ আহরণ ও পশুচারণ পর্যন্ত কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত।

পানি সম্পদের গুরুত্ব সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, এ পৃথিবীর প্রাণবান সবকিছু পানি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে (সূরা আম্বিয়া, আয়াত-৩০)। বৃষ্টির পানির প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সম্পর্কে অনেক বেশি কথা রয়েছে পবিত্র এ গ্রন্থে। আল্লাহ বলেন, তিনি আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন। এতে তোমাদের জন্য রয়েছে পানীয় এবং তা হতে তোমাদের জন্মায় উদ্ভিদ যাতে তোমরা পশুচারণ করে থাক। তিনি ওর দ্বারা শস্য জন্মান, জয়তুন, খর্জুর বৃক্ষ, দ্রাক্ষা এবং সর্বপ্রকার ফল। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে (সূরা নাহল, আয়াত-১০-১১)। আমি বৃষ্টি এবং বায়ু প্রেরণ করি, অতঃপর আকাশ হতে বারি বর্ষণ করি এবং তোমাদের তা পান করতে দেই, এর ভান্ডার তোমাদের নিকট নেই (সূরা হিজর, আয়াত-২২)। মেঘ হতে আমি প্রচুর বৃষ্টিপাত করি, তা দিয়ে উৎপন্ন করি শস্য, উদ্ভিদ ও নথ, সন্নিবিষ্ট উদ্যান (সূরা নাবা, আয়াত-১৪-১৬)। এভাবে পানি সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের গুরুত্ব বুঝাতে আরও অনেক কথা রয়েছে এ ঐশীগ্রন্থে। পানি দূষণ সম্পর্কে সতর্ক থাকতে হযরত মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর অনুসারীদের স্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে গেছেন। এমনকি বদ্ধ পানিতে প্রস্রাব করা পাপ বলে ঘোষণা করেছেন। পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে মুসলমানদের সতর্ক থাকতে বলেছেন তিনি। এজন্য ইসলামী বিধানে যত্রতত্র আবর্জনা ফেলা, মানুষের চলাফেরার রাস্তার পাশে প্রস্রাব করা, বাহ্য ত্যাগ করা হারাম (মহাপাপ) বলে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মানুষের জন্য মাটি কত গুরুত্বপূর্ণ তা পবিত্র কুরআনের অনেক বাণী থেকে অনুধাবন করা যায়। আল্লাহ তাআলা বলেন, তিনিই (আল্লাহ) তোমাদের (মানুষ) মৃত্তিকা হতে সৃষ্টি করেছেন (সূরা আনআম, আয়াত-২)। মাটি হতে তোমাদের সৃষ্টি করেছি, তাতেই তোমাদের ফিরিয়ে নেব এবং ঐ হতে তোমাদের পুনর্বার বের করব (সূরা ত্বা-হা, আয়াত-৫৫)। তিনি তার প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে উত্তমরূপে সৃজন করেছেন এবং মাটি হতে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন (সূরা সাজদাহ, আয়াত-৭)। সুতরাং মাটির গড়া মানুষকে মাটির ধরায় বাঁচতে হলে মাটির সুষ্ঠু সংরক্ষণ করতে হবে, অন্যথায় প্রকৃতির কোলে বেঁচে থাকা বিষময় হয়ে উঠবে।

আল্লাহর অকৃপণ দান বিশুদ্ধ বায়ু দ্বারা শ্বসনক্রিয়া চালানো প্রতিটি জীবের জন্মগত অধিকার। তাই বায়ু দূষণ নিশ্চিত রূপে আল্লাহর নিআমত-ধ্বংস করা তুল্য অপরাধ এবং 'হক্কুল ইবাদ' নষ্ট করার মত পাপ কাজ বলা যায়। এমনকি শব্দ দূষণও ইসলামের দৃষ্টিতে একটি অনৈতিক ও কাণ্ডজ্ঞানহীন কাজ। শব্দ দূষণের মাধ্যমে মানব সমাজে শান্তিপূর্ণ সুস্থ পরিবেশ বিঘ্নিত হয় এবং বিশেষভাবে রোগীর উপর এর কুপ্রভাব অতিশয় অনিষ্টকর।

মহান আল্লাহর সৃষ্টি শুধুমাত্র মানুষকে নিয়ে নয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, 'সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং এর মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুই তার পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। কিন্তু তোমরা তা অনুধাবন করতে পার না (সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত-৪৪)। তাই পৃথিবীতে মানুষের উপস্থিতির জন্য সর্বপ্রকারের প্রাণী ও বৃক্ষরাজির অস্তিত্ব ও বিকাশ একান্ত প্রয়োজন। বিশেষভাবে প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষায় বৃক্ষরাজির গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাণী জগতের শ্বসন প্রক্রিয়ায়, ভূমিক্ষয় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ হ্রাসে, সুস্থ, মনোরম ও সুশীতল পরিবেশ সৃষ্টি উদ্ভিদের উপর নির্ভরশীল। পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, 'আকাশ ও পৃথিবী এবং যা উভয়ের অন্তবর্তী, তা আমি (আল্লাহ) ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি' (সূরা আম্বিয়া, আয়াত-১৬)। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত মানবজাতি প্রকৃতির নিয়ম মেনে এ সৃষ্টিকে সংরক্ষিত রাখবে, পৃথিবীতে জীবনের স্বাভাবিক গতি বিঘ্নিত হতে পারে না। অতএব প্রকৃতির ধর্ম ইসলামের মূল্যবোধকে ভিত্তি করে প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষায় সমগ্র মানবজাতির এগিয়ে আসা প্রয়োজন এবং এটাই সময়ের আহবান।

সফরনামা

ইবনে বতুতার বাংলা সফর ও হযরত শাহজালালের সাক্ষাৎ লাভ

ইবনে বতুতা

সমুদ্রের বুকে তেতাল্লিশ রাত্রি কাটিয়ে অবশেষে বাঙ্গালায় পৌঁছলাম। বিশাল এই দেশে প্রচুর চাল উৎপন্ন হয়। এতো সস্তা দ্রব্যমূল্য আমি দুনিয়ার আর কোথাও দেখিনি। তবে এ এক অন্ধকারের দেশ। খোরাসানিরা এ দেশের নাম দিয়েছে 'নিআমতে ভরপুর দুযখ'। স্থানীয় এক রৌপ্য মুদ্রায় (যা আট দিরহামের সমান) এ দেশে দিল্লির হিসাবে ২৫ রতল (ওজনের পরিমাপ) চাল পাওয়া যায়। দিল্লির ১ রতল মরক্কোর ২০ রতলের সমান। স্থানীয়দের মুখে শুনেছি, তাদের নিকট তখন না-কি বাজার দর চড়া ছিল। মাহমুদ আল-মাসমুদী আল-মাগরিবী নামের এক নেককার ব্যক্তি অনেক আগে এ দেশে বসবাস করতেন, দিল্লিতে আমার সাথে থাকাকালে তার ইন্তিকাল হয়। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে তিনি স্ত্রী ও খাদিমকে নিয়ে এ দেশে বসবাস করতেন, এবং তিনজনের পুরো বছরে খাবার মাত্র আট দিরহাম দিয়ে কিনতেন।

বাংলাদেশে আমি মাত্র তিন রৌপ্য দিনারে দুধের গাভি ও মহিষ আর এক দিরহামে আটটি হৃষ্টপুষ্ট মুরগি বিক্রি হতে দেখেছিলাম। ১৫টি কবুতর বিক্রি হতো মাত্র ১ দিরহামে, মোটাসোটা ভেড়া পাওয়া যেতো দুই দিরহামে, এক রতল (দিল্লির পরিমাপ অনুযায়ী) চিনির দাম ৪ দিরহাম, ১ রতল গোলাপজল ৮ দিরহাম, ৪ দিরহামে ১ রতল ঘি, ২ দিরহামে ১ রতল তিলের তেল পাওয়া যেতো। মাত্র ২ দিনারে ৩০ গজ উন্নতমানের সূক্ষ্ম ও মসৃণ কটনের কাপড় বিক্রি হতে দেখেছি, সুশ্রী ক্রীতদাসী বিক্রি হতে দেখেছি মাত্র ১ স্বর্ণ দিনারে (স্থানীয় ১ দিনার মরক্কোর আড়াই দিনারের সমান)। এই দামে আমি আশুরা নাম্নী এক দাসী কিনেছিলাম, সে ছিল খুবই রূপবতী, আমার এক সঙ্গী ২ স্বর্ণ দিনারে অল্প বয়স্ক সুদর্শন দাস কিনেছিলেন, সে দাসের নাম ছিল লু'লু'। বাংলাদেশের যে শহরে প্রথম প্রবেশ করেছিলাম, সে শহরের নাম চাটগাঁও।[১] বিশাল সমুদ্রের তীরে অবস্থিত বিরাট এক শহর চাটগাঁও। আর এ সমুদ্রে মিশেছে গঙ্গা ও জুন নদী। গঙ্গায় হিন্দুরা তীর্থ যাত্রা করে। এ নদীতে তাদের বিশাল নৌবহর রয়েছে, এই নৌবহরের সাহায্যে তারা লক্ষ্মণাবতীর অধিবাসীদের সাথে যুদ্ধ করে।

বাংলার সুলতান ছিলেন ফখরুদ্দীন। তিনি মহৎ শাসক ছিলেন, মুসাফিরদের পছন্দ করতেন, বিশেষত সূফী-দরবেশদেরকে ভালোবাসতেন। এ দেশের রাজত্ব ছিল দিল্লির সুলতান গিয়াসুদ্দীন বলবনের ছেলে সুলতান নাসিরুদ্দীনের (যিনি বুগরা খান নামে পরিচিত); নাসিরুদ্দীন তাঁর বাবার মৃত্যুর পর ছেলে মুঈযযুদ্দীনকে দিল্লির শাসক নিযুক্ত করেন। পরবর্তীতে নাসিরুদ্দীন তার পুত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন, একটি নদীর তীরে পিতা-পুত্রের বাহিনী মুখোমুখি হয়েছিল। নাসিরুদ্দীন শেষ পর্যন্ত পুত্রের হাতে দিল্লির রাজত্ব ছেড়ে দিয়ে বাংলায় ফিরে আসেন, মৃত্যু পর্যন্ত তিনি বাংলাতেই স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। তাঁর পর তাঁর পুত্র শামসুদ্দীন রাজত্ব লাভ করেন এবং মৃত্যু অবধি রাজত্ব করেন। এরপর ক্ষমতায় আসেন সুলতান শামসুদ্দীনের পুত্র শিহাবুদ্দীন। পরবর্তীতে তাঁকে পরাজিত করে ক্ষমতা দখল করেন তাঁর ভাই সুলতান শামসুদ্দীনের আরেক পুত্র সুলতান গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহ (ইবনে বতুতা বাহাদুরপুর লিখেছেন, তবে বাংলার ইতিহাসে ইনি বাহদুর শাহ নামেই পরিচিত)। শিহাবুদ্দীন ভাইয়ের বিরুদ্ধে দিল্লির সুলতান গিয়াসুদ্দীন তুঘলকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করলে তুঘলক শিহাবুদ্দীনকে সহযোগিতা করেন এবং বাহাদুর শাহকে আটক করেন। তুঘলকের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে মুহাম্মাদ বিন তুঘলক শিহাবুদ্দীনকে এই শর্তে মুক্তি দেন যে, শিহাবুদ্দীন তাঁর অর্ধেক রাজত্ব মুহাম্মাদ বিন তুঘলককে প্রদান করবেন। মুক্তি পেয়ে শিহাবুদ্দীন চুক্তিভঙ্গ করেন, ফলে মুহাম্মাদ বিন তুঘলক যুদ্ধ করে তাঁকে নিহত করেন এবং তাঁর এক জামাতাকে বাংলার শাসক নিযুক্ত করেন। সৈন্যরা এই শাসককে হত্যা করেন, এরপর ক্ষমতায় আসেন আলী শাহ। আলী শাহ তখন লকনৌতি বা লক্ষ্মণাবতীতে ছিলেন। ফখরুদ্দীন (মুবারক শাহ) ছিলেন সুলতান নাসিরুদ্দীনের বংশের অনুগত। তিনি যখন দেখলেন বাংলা নাসিরুদ্দীনের বংশধরদের হাতছাড়া হয়ে গেছে, তখন চাটগাঁও ও বাংলায় আলী শাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এর ফলে আলী শাহ ও ফখরুদ্দীনের মধ্যে তুমুল বিরোধ দেখা দেয়। ফখরুদ্দীন ছিলেন নৌশক্তিতে শক্তিশালী, তাই তিনি বর্ষাকালে লক্ষ্মণাবতীতে আক্রমণ করতেন। আলী শাহের স্থলবাহিনী শক্তিশালী ছিলো, তাই শুকনো মৌসুমে তিনি বাংলায় ফখরুদ্দীনের উপর আক্রমণ করতেন।

সুলতান ফখরুদ্দীনের ফকির-দরবেশ প্রীতির অবসান ঘটে একবার তাঁর কোন এক শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাওয়ার সময় এক দরবেশকে চাটগাঁওয়ে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করার পর। সেই ফকীরের নাম ছিল শায়দা। শায়দা সুলতান ফখরুদ্দীনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং রাজত্ব দখল করতে চান। এমনকি তিনি সুলতানের একমাত্র পুত্রকে হত্যা করেন। সুলতান খবর পেয়ে ফিরে এসে শায়দাকে আক্রমণ করেন, শায়দা তার অনুগামীদেরকে নিয়ে পালিয়ে সাতগাঁওয়ে চলে যান। সাতগাঁও খুবই সুরক্ষিত নগরী ছিল। সুলতান শায়দাকে সাতগাঁও অবরোধ করার জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন। সাতগাঁওবাসী তখন নিজেদের প্রাণভয়ে শায়দাকে বন্দি করে সুলতানের বাহিনীর নিকট সমর্পণ করেন এবং সুলতানের নিকট এ বিষয়ে তাঁর নির্দেশ জানার জন্য চিঠি লিখেন। সুলতান তাঁর নিকট শায়দার মস্তক প্রেরণ করার নির্দেশ দেন। তারা সুলতানের নিকট শায়দার মস্তক প্রেরণ করেন। এ কারণে বহু ফকীর-দরবেশ নিহত হয়েছিলেন। আমি চাটগাঁওয়ে প্রবেশ করে সুলতানকে দেখিনি, তার সাথে সাক্ষাৎও করিনি। কারণ ভারতবর্ষের বাদশাহের সাথে তাঁর বিরোধ ছিল, তাই তাঁর সাক্ষাতের পরিণতি সম্পর্কে আমি ভয় করছিলাম। চাটগাঁও থেকে আমি কামরূপ[২] পর্বতমালার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিই। চাটগাঁও থেকে কামরূপ ছিল এক মাসের পথ। কামরূপের বিস্তীর্ণ পর্বতমালা চীন অবধি পৌঁছেছে। এই পর্বতমালা তিব্বতের সাথেও মিলেছে। এ পর্বতমালার বাসিন্দারা দেখতে তুর্কিদের মতো, সেবার ক্ষেত্রে তারা বিশেষ পারদর্শী, এ অঞ্চলের একজন দাস অন্য অঞ্চলের কয়েক জন দাসের অনুরূপ। এরা যাদুটোনার জন্য বেশ বিখ্যাত। এই পর্বতমালায় আমার সফরের উদ্দেশ্য ছিল এক আল্লাহর ওলীর সাক্ষাৎলাভ। তিনি হলেন শাইখ জালালুদ্দীন তিবরিযী (হযরত শাহজালাল র.)।

এই শাইখ ছিলেন অনেক বড় এক ওলী এবং অনন্য ব্যক্তিত্ব। তাঁর অনেক প্রসিদ্ধ কারামত রয়েছে, এবং বিরাট প্রভাব রয়েছে। তিনি ছিলেন দীর্ঘজীবীদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি আমাকে বলেছেন যে, তিনি বাগদাদে খলীফা মু'তাসিম বিল্লাহকে পেয়েছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর সঙ্গীরা আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি ১৫০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেছেন। আর তিনি টানা চল্লিশ বছর ধারাবাহিকভাবে রোযা রাখতেন। একটানা দশদিন রোযা রেখে তারপর রোযা ছাড়তেন। তার একটি গাভি ছিল, সে গাভির দুধ দিয়ে ইফতার করতেন। সারা রাত নামায পড়তেন। তিনি ছিলেন ছিপছিপে ও ছোটোখাটো গড়নের মানুষ। ঐ পাহাড়ের মানুষ তাঁর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেছিল, এ জন্য তিনি তাদের মধ্যেই বসবাস করতেন।

তাঁর এক সাথি আমাকে জানিয়েছিলেন, তিনি তাঁর মৃত্যুর একদিন আগে তাদের সকলকে ডাকেন। তাদেরকে আল্লাহভীতির ওসীয়ত করেন এবং বলেন, আমি আগামীকাল তোমাদেরকে ছেড়ে চলে যাবো ইনশাআল্লাহ। পরের দিন যুহরের নামায আদায়কালে শেষ সিজদায় আল্লাহ তাঁর রূহ কবজ করেন। তিনি যে গুহায় বসবাস করতেন, সেই গুহার পাশে তাঁরা একটি খননকৃত কবর, কাফন ইত্যাদি পেলেন। তখন তাঁরা তাঁকে গোসল করিয়ে কাফন পরিয়ে জানাযার নামায আদায় করে দাফন করেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি রহম করুন।

আমি যখন এই শাইখের সাথে সাক্ষাৎ করার ইচ্ছা পোষণ করলাম, তাঁর আবাসস্থলের দুই দিনের পথ অবশিষ্ট থাকতেই তাঁর চারজন সঙ্গী আমার সাথে দেখা করলেন। তাঁরা আমাকে জানালেন, শাহ জালাল (র.) তাঁর সাথে থাকা দরবেশদেরকে বলেছেন, তোমাদের নিকট মরক্কো থেকে এক আগন্তুক আসছেন, তোমরা তাঁকে অভ্যর্থনা জানাও। আমার সম্পর্কে তাঁর নিকট কোন তথ্য ছিল না, বরং তিনি কাশফের মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন। আমি তাদের সঙ্গে শাইখের নিকট গেলাম, এবং গুহার বাইরে তাঁর খানকায় পৌঁছলাম। সেখানে কোন দালান ছিল না। কাফির-মুসলিম নির্বিশেষে সে দেশের অধিবাসীরা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতো। তারা তাঁর জন্য হাদিয়া-তোহফা নিয়ে আসতো। তাঁর সাথে থাকা সূফী-দরবেশ ও অন্যরা এসকল খাবার খেতেন। আর তিনি কেবল তাঁর গাভির দুধ দিয়েই ইফতার করতেন, যেমনটা এর আগেও আমরা আলোচনা করেছি। আমি যখন তাঁর দরবারে প্রবেশ করলাম, তিনি আমাকে দেখে দাঁড়িয়ে আমার সাথে মুয়ানাকা করলেন। তিনি আমাকে আমার স্বদেশ সম্পর্কে এবং আমার সফরের বিষয়ে জানতে চাইলে আমি তাঁকে জানালাম। তিনি আমাকে বললেন, 'আপনি আরবের মুসাফির'। তখন তার সঙ্গীরা বললেন, তিনি আজমেরও মুসাফির। শাইখ বললেন, হ্যাঁ, আজমেরও, তোমরা তাঁর কদরদানি করো। তাঁরা আমাকে তাঁর খানকায় নিয়ে গেলেন এবং তিন দিন মেহমানদারি করলেন।

আমি যেদিন শাহ জালাল (র.) এর সাথে প্রথম দেখা করি, সেদিন চমৎকার একটি আলখাল্লা দেখে আমার খুবই পছন্দ হয়। আমি মনে মনে বলছিলাম, হায়! শাইখ যদি এটি আমাকে দান করতেন!! আমি যেদিন তাঁর নিকট বিদায় নিতে গেলাম, তিনি গুহার এক পাশে গিয়ে আলখাল্লাটি খুললেন, এবং আমাকে পরিয়ে দিলেন। তাঁর মাথার টুপিটিও আমাকে পরিয়ে দিলেন। এরপর তিনি তালিওয়ালা পোশাক পরলেন। দরবেশগণ আমাকে জানালেন যে, শাইখ সাধারণত এই আলখাল্লাটি পরেন না। আমার আগমন উপলক্ষ্যেই তিনি এটি পরেছিলেন। তিনি তাদেরকে বলেছিলেন যে, মাগরিবি (মরক্কোর অধিবাসী তথা ইবনে বতুতা) আলখাল্লাটি চাইবেন, কাফির সুলতান এটি তার নিকট থেকে নিয়ে যাবে, এবং সে এটি আমাদের ভাই বুরহানুদ্দীন আস-সাগিরজীকে দান করবে। আর আলখাল্লাটি তাঁরই। দরবেশদের কাছ থেকে এ খবর জেনে আমি তাদেরকে বললাম, শাইখ তাঁর পোশাক আমাকে পরিয়ে দিয়েছেন, এর মধ্য দিয়ে আমি তাঁর বরকত লাভ করেছি। আমি এ আলখাল্লা নিয়ে কাফির-মুসলিম কোন সুলতানের দরবারেই প্রবেশ করবো না। এরপর আমি শাহ জালাল (র.) এর নিকট থেকে প্রস্থান করলাম। বহুকাল পর আমি চীন দেশে প্রবেশ করি। এক পর্যায়ে *খানসা* শহরে পৌঁছি। ভীড়ের কারণে সেখানে আমার সঙ্গীরা আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আলখাল্লাটি তখন আমার নিকট ছিল। আমি কোন এক রাস্তায় ছিলাম, হঠাৎ সে রাস্তায় মন্ত্রীর বিশাল বহর এসে পৌঁছে। আমার উপর মন্ত্রীর চোখ পড়লে তিনি আমাকে ডেকে নেন এবং আমার আগমনের কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি আমার থেকে আলাদা হওয়ার আগেই আমি তার সাথে সুলতানের প্রাসাদে পৌঁছি। আমি তখন সরে যেতে চাইলে মন্ত্রী আমাকে নিষেধ করেন এবং আমাকে সুলতানের নিকট নিয়ে যান। সুলতান আমাকে মুসলিম সুলতানদের বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে আমি তাকে উত্তর দিই। এক পর্যায়ে তিনি আলখাল্লাটির দিকে তাকান, এবং এটি তার ভালো লেগে যায়। মন্ত্রী তখন আমাকে আলখাল্লাটি খুলতে বলেন, তখন আমার পক্ষে সে কথা না শুনে কোন উপায় ছিল না। সুলতান তখন আমার আলখাল্লাটি নিয়ে নির্দেশ দিলেন যেন আমাকে দশটি খেলাত (বিশেষ রাজকীয় পোশাক), সুসজ্জিত ঘোড়া, এবং খরচপাতি প্রদান করা হয়। আমি মনে কষ্ট পেলাম। হঠাৎ মনে পড়লো, শাইখ তো বলেছিলেন যে এটি আমার নিকট থেকে এক কাফির সুলতান কেড়ে নেবে। আমি আরো বিস্মিত হলাম। আরেক বছর যখন আমি চীনের খান বালিক শহরে প্রবেশ করলাম, শাইখ বুরহানুদ্দীন আস-সাগিরজীর খানকায় গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখি, তিনি পড়ছেন আর তাঁর পরনে সেই আলখাল্লাটি! আমি বিস্মিত হয়ে হাত দিয়ে আলখাল্লাটি নেড়ে দেখলাম। তিনি আমাকে বললেন, আপনি এটি কেন নাড়ছেন, আপনি এটি চিনেন না-কি? আমি বললাম হ্যাঁ, এই আলখাল্লাটিই তো খানসার সুলতান আমার থেকে নিয়েছিলেন। তিনি আমাকে বললেন, আলখাল্লাটি আমার ভাই জালালুদ্দীন (শাহ জালাল র.) আমার জন্য বানিয়েছিলেন। এবং আমাকে চিঠি লিখেছিলেন যে অমুকের মাধ্যমে আলখাল্লাটি আপনার নিকট পৌঁছবে। এরপর তিনি চিঠিটি বের করে আমাকে দেখালেন। আমি চিঠিটি পড়ে শাহ জালাল (র.) এর দৃঢ় বিশ্বাস দেখে অবাক হলাম। আমি তাঁকে প্রথম ঘটনাটি জানালাম। তিনি বললেন আমার ভাই জালালুদ্দীন এসবের উর্ধ্বে আল্লাহর রহমতের আশ্রয়ে চলে গেছেন। এরপর তিনি আমাকে বললেন, 'আমার কাছে খবর পৌঁছেছে যে তিনি (শাহ জালাল র.) প্রতিদিন ভোরে (ফজরে) মক্কা শরীফে নামায আদায় করতেন, প্রতিবছর হজ্জ আদায় করতেন; কারণ, তিনি আরাফার দিন ও ঈদুল আদহার দিন লোকচক্ষুর আড়ালে চলে যেতেন, এবং তিনি কোথায় যেতেন তা কেউই জানতো না।

[বিশ্ববিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতার কালজয়ী ভ্রমণকাহিনি 'রিহলাতু ইবনু বতুতা'। ইবনে বতুতা এ বইটিতে তাঁর বাংলাদেশ সফরের কাহিনিও আলোচনা করেছেন। মাসিক পরওয়ানার পাঠকদের জন্য আরবী ভাষায় রচিত ইবনে বতুতার বাংলাদেশ সফরের অভিজ্ঞতা ও হযরত শাহজালাল (র.) সম্পর্কে তাঁর স্মৃতিচারণের অংশটুকু ***মিফতাহ তালহা*** *কর্তৃক অনুবাদ করে দেওয়া হলো। -সম্পাদক]*

১. মূল আরবীতে ইবনে বতুতা এ শহরের নাম লিখেছেন সাদকাওয়ান। মূলত চট্টগ্রাম বা চাটগাঁও-এর নামই আরবীতে তিনি এভাবে প্রতিবর্ণায়িত করেছেন।

২. মূল আরবীতে ইবন বতুতা "কামারু" লিখেছেন। মূলত চট্টগ্রাম থেকে তিনি সিলেটের উদ্দেশ্যেই সফর করেন। সেকালে সিলেট আসাম তথা কামরূপ অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

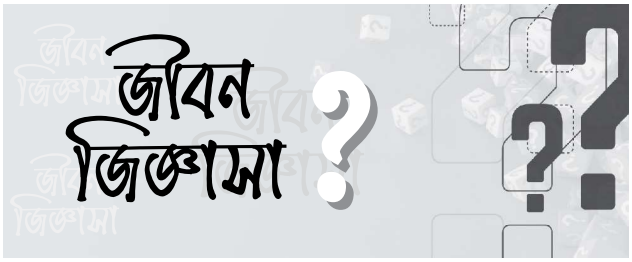

জবাব দিচ্ছেন-
মাওলানা আবূ নছর মোহাম্মদ কুতুবুজ্জামান তাফাদার
প্রিন্সিপাল ও খতীব, আল ইসলাহ ইসলামিক সেন্টার
মিশিগান, আমেরিকা।

আবুল হোসেন
ফেঞ্চুগঞ্জ মোহাম্মদিয়া কামিল মাদরাসা

প্রশ্ন: ঈদের নামাজে ভুল হলে সাহু সিজদাহ দিতে হবে কি?

জবাব: ঈদ, জুমুআ কিংবা অন্যান্য নামাযের জামাআতে অত্যধিক লোকের উপস্থিতির কারণে যেথায় সাহু সিজদাহ দিলে মুসল্লিদের মধ্যে ফিতনার আশংকা প্রবল সে রকম পরিস্থিতিতে সাহু সিজদাহ না দেওয়া উত্তম। অন্যথায় ঈদ, জুমুআ ও অন্যান্য সকল নামাযে সাহু সিজদার হুকুম অভিন্ন। এ সম্পর্কে আদ্দুররুল মুখতার কিতাবে লিখেছেন-

والسهو في صلاة العيد والجمعة والمكتوبة والتطوع سواء

-ঈদ, জুমুআ, ফরয ও নফল সকল নামাযে সাহু সিজদার বিধান সমানভাবে প্রযোজ্য। (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১০০)

এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা মারাকিল ফালাহ ও হাশিয়াতুত তাহতাবী কিতাবে উল্লেখপূর্বক আছে-

الأصل "ولا يأتي الإمام بسجود. السهو في الجمعة والعيدين" دفعا للفتنة بكثرة الجماعة

-মূলনীতি হচ্ছে, জুমুআ ও ঈদের নামাজে অত্যধিক লোকের উপস্থিতির কারণে সাহু সিজদাহ দিলে ফিৎনার আশংকা থাকলে ইমাম সাহু সিজদা দিবেন না। (মারাকিল ফালাহ ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৭৯; তাহতাবী ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৬৫)

সারকথা হলো, জামাতে অত্যধিক লোকের উপস্থিতির শর্ত যা ফিতনার সাথে সম্পর্কিত হয়েছে। সুতরাং সেরূপ লোকের উপস্থিতি না হলে ফিতনার আশংকামুক্ত হওয়াতে সাহু সিজদা করা বাহ্যত করনীয় হিসেবে বিবেচিত হবে। (হাশিয়াতু তাহতাবী: ১/৪৬৬)

এ সম্পর্কে ফাতাওয়ায়ে শামী কিতাবে বর্ণনার সারকথা হলো, ঈদ ও জুমুআর নামাযে ফিতনার আশংকায় সাহু সিজদা না করার মর্মার্থ এটা নয় যে, সাহু সিজদা নাজায়িয। বরং না করা উত্তম এজন্য যে, যাতে লোকেরা ফিতনার সম্মুখীন না হয়। আর অত্যধিক লোকের উপস্থিতি না ঘটলে সাহু সিজদা ছেড়ে দেওয়া যাবে না। (ফাতাওয়ায়ে শামী:২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৯২)

মোছা: সুরাইয়া ইসলাম (ফাহিজা)
লালাবাজার, বিশ্বনাথ, সিলেট

প্রশ্ন:১ ব্যাংকে ডিপোজিট টাকার লাভ থেকে কুরবানী দেয়া যাবে কি?

প্রশ্ন:২ কুরবানীর গরু জবাই করার সময় কুরবানী দাতার নাম উল্লেখ না করে পরিবারের সকলের পক্ষ থেকে বলে জবাই করলে কুরবানী হবে কি?

জবাব-১: ব্যাংকের ডিপোজিট টাকার লাভ যদি শরীয়াহ ভিত্তিক হালাল হয় তবে তা দিয়ে কুরবানী আদায় জায়িয। আর সেটা শরীআতে হারাম হলে তা দিয়ে কুরবানী আদায় জায়িয নয়।

উল্লেখ্য যে, বর্তমানে প্রচলিত ব্যাংকসমূহে সিংহভাগই শরীয়াভিত্তিক পরিচালিত হয় না। কোনো কোনো ব্যাংক ইসলামী শরীয়াভিত্তিক ব্যাংকিং এর দাবি করলেও তা কার্যত কতটুকু শরীআত অনুসরণ করে তা সুস্পষ্ট নয়।

জবাব-২: কুরবানীর জন্তু জবাই করার সময় যাদের পক্ষ থেকে কুরবানী করা হচ্ছে তাদের নাম উচ্চারন না করে জবাইকারীর নিয়তের মধ্যে থাকলেও কুরবানী আদায় হয়ে যাবে। তবে একটি গরু দ্বারা কুরবানী আদায় করলে সর্বোচ্চ ৭ জনকে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। এর অধিক হলে জায়িয হবে না। তাই পরিবারের কুরবানী আদায়কারীদের সংখ্যা ৭ জন পর্যন্ত হলে তাদের বিষয়কে নিয়তে রেখে একটি গরু দ্বারা কুরবানী আদায় করা জায়িয হবে। এমর্মে হাদীস শরীফে এসেছে-

عن جابر بن عبد الله أنه قال :نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة

-হযরত জাবির ইবনে আব্দিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি বলেছেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে হুদায়বিয়ার বৎসরে একটি উট সাত জনের পক্ষ থেকে এবং একটি গরু সাত জনের পক্ষ থেকে কুরবানী করেছি। (মুয়াত্তা ইমাম মালিক: باب الشركة في الضحايا وعن كم تذبح البقرة والبدنة)

সাইফুল ইসলাম
লামারগ্রাম, জকিগঞ্জ, সিলেট

প্রশ্ন: একটি গরুর দ্বারা কয়জন ছেলে-মেয়ের আকীকা করা সম্ভব?

জবাব: আকীকার ক্ষেত্রে প্রত্যেক ছেলের জন্য ২টা বকরী এবং প্রত্যেক মেয়ের জন্য ১টি বকরী যবেহ করতে হয়।

এ সম্পর্কে মুসনাদে আহমদে বর্ণিত হাদীস শরীফে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন,

من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة

-তোমাদের কেউ তার সন্তানের পক্ষ থেকে (আকীকা) যবেহ করলে ছেলে সন্তানের জন্যে দুটি ছাগল ও মেয়ে সন্তানের জন্যে একটি ছাগল যবেহ করবে। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ৬৭১৩)

আর গরু কিংবা উট দিয়ে আকীকা করলে একজন ছেলে বা একজন মেয়ের আকীকা একটি গরু বা উট দিয়ে করা যায়। আর চাইলে উপরোল্লেখিত নিয়মে প্রত্যেক ছেলের জন্য উট বা গরুর সাত অংশের দুই অংশ এবং প্রত্যেক মেয়ের জন্য সাত অংশের এক অংশ হিসাবে ধরে নিয়ে সে হিসেবেও করা যায়। এতে তিন ছেলের ও এক মেয়ের কিংবা ২ ছেলের ও ৩ মেয়ের কিংবা ১ ছেলের ও ৫ মেয়ের আকীকা দেয়া যাবে।

এ সম্পর্কে আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়্যাহ কিতাবে আছে-

يجب أن يعلم أن الشاة لا تجزئ إلا عن واحد، وإن كانت عظيمة، والبقر والبعير يجزي عن سبعة إذا كانوا يريدون به وجه الله تعالى، والتقدير بالسبع يمنع الزيادة، ولا يمنع النقصان، كذا في الخلاصة.

-ছাগল বড় হলেও কেবল একজনের পক্ষ থেকে আদায় করা যায়। আর গরু ও উট সর্বোচ্চ সাত জনের পক্ষ থেকে আদায় করা যায়, যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে সকলে তা আদায় করেন। কোনো অবস্থায় সাত জনের চেয়ে অধিক লোক শরীক হওয়া যাবে না। তবে সাত জনের চেয়ে কম সংখ্যক লোক শরিক হতে বাঁধা নেই। (৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩০৪)

উল্লেখ্য, সামর্থ্য না থাকলে একটি ছাগল দিয়ে বা একটি গরুর এক অংশ দিয়ে ছেলে সন্তানের আকীকা করা হলে তাতে আকীকা হয়ে যাবে।

এমরান হোসেন
গোবিন্দপুর, জুড়ী, মৌলভীবাজার

প্রশ্ন: একজন দরিদ্র ব্যক্তি কয়েক বাড়ি থেকে কুরবানীর গোশত সংগ্রহ করে। উক্ত গোশত থেকে কি সে কিছু গোশত বিক্রয় করতে পারবে?

জবাব: সকল ইমামের ঐকমত্যে কুরবানী দাতা তার কুরবানীর পশুর গোশত বিক্রি করতে পারবেন না। তবে কুরবানীর গোশত কাউকে দান করা হলে এর গ্রহীতা সে গোশত বিক্রয় করতে পারবে কি না, এ সম্পর্কে ইমামগনের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর অভিমত অনুযায়ী তার জন্যে বিক্রয় জায়িয রয়েছে। ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এর মতানুসারে জায়িয নয়। এ সম্পর্কে মাজমাউল আনহুর কিতাবে লিখেছেন-

أما البيع جائز لقيام الملك والقدرة على التسليم هذا قول الإمام وعن أبي يوسف بيع الأضحية أو جلدها أو لحمها باطل لأنه بمنزلة الوقف

-ইমাম আবূ হানীফা (র.) এর মতানুসারে কোনো বস্তুর উপর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়া সহ ইহা হস্তান্তর করার সক্ষমতা থাকলে সে বস্তু বিক্রয় করা বৈধ। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (র.) এর নিকট কুরবানীর জন্তু, এর চামড়া কিংবা এর গোশত বিক্রয় করা অগ্রাহ্য। কেননা তা ওয়াকফের স্থলাভিষিক্ত। (মাজমাউল আনহুর: ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৫২২)

হাফিয নজরুল ইসলাম
কুইন্স, নিউইয়র্ক

প্রশ্ন: বিতর নামায কত রাকআত এবং কীভাবে পড়তে হয়? এর সঠিক নিয়ম দলীলসহ জানতে চাই।

জবাব: বিতর নামাযের রাকআত সংখ্যা নিয়ে হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনা থাকলেও রাসূলুল্লাহ ﷺ এর শেষ ও চূড়ান্ত আমল থেকে তা তিন রাকাআত পড়ার বিষয় সাব্যস্ত। তাই হানাফী মাযহাবের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিতর তিন রাকাআত পড়তে হবে। এতে কম বা বেশি করা যাবে না। মুস্তাদরাকে হাকিম গ্রন্থে হযরত আয়িশা (রা.) থেকে এ সম্পর্কে বিশুদ্ধ বর্ণনা এসেছে-

عن عائشة، قالت :كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن» وهذا وتر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعنه أخذه أهل المدينة

-রাসূলুল্লাহ ﷺ তিন রাকাআতে বিতর আদায় করতেন এবং কেবল শেষ রাকআতেই সালাম ফিরাতেন। এভাবে হযরত উমর (রা.)ও বিতর আদায় করতেন। তার থেকেই মদীনাবাসী এই আমল গ্রহণ করেছেন।

বিতর নামায সম্পর্কীয় যে সকল বর্ণনায় এক, তিন, পাঁচ ও সাত ইত্যাদি সংখ্যার কথা এসেছে সেগুলো প্রাথমিক সময়কার অবস্থা সম্পর্কীয়। তখন পর্যন্ত কোনো নির্দিষ্ট রাকআত স্থির হয়নি। পরবর্তীতে এর রাকআত সংখ্যা তিন হওয়া নির্দিষ্ট হয়েছে। যা বহু বর্ণনায় সাব্যস্ত ও মদীনাবাসীগণের স্থায়ী আমল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। এ সম্পর্কে হাদীসের বর্ণনাসমূহের মধ্যে রয়েছে-

১। হযরত আয়িশা (রা.) এর উপরিউক্ত বর্ণনা, যা রাসূল ﷺ এর বিতর নামায আদায় সম্পর্কীয়।

২। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) এর ঐ বর্ণনা যেখানে তিনি তার মাতাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বিতর নামায গভীরভাবে পর্যবেক্ষণের জন্যে পাঠিয়েছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন, যা আল ইসতিআব ফী মা'রিফাতিল আসহাব গ্রন্থে এসেছে। হাদীসটি হলো-

عن عبد الله قال: أرسلت أمي ليلة لتبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فتنظر كيف يوتر فباتت عند النبي فصلى ما شاء الله أن يصلي، حتى إذا كان آخر الليل وأراد الوتر قرأ بسبح اسم ربك الأعلى في الركعة الأولى، وقرأ في الثانية قل يا أيها الكافرون. ثم قعد، ثم قام، ولم يفصل بينهما بالسلام، ثم قرأ [قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد حتى إذا فرغ كبر ثم قنت، فدعا مما شاء الله أن يدعو ثم كبر وركع. وروى وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن مصعب ابن سعد، قال: فرض عمر بن الخطاب للنساء المهاجرات في ألفين ألفين، منهن أم عبد

৩। অনুরূপ হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) এর বর্ণনা, যা সহীহ মুসলিম গ্রন্থে باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه অধ্যায়ে এসেছে। অনুরূপ মুসনাদে আহমদ, সুনানে কুবরা ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে উক্ত বর্ণনা এসেছে-

عن عبد الله بن عباس، أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول: {إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب} [آل عمران: ١٩٠] فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة، ثم قام فصلى ركعتين، فأطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انصرف فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك ثلاث مرات ست ركعات، كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات، ثم أوتر بثلاث، فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة

উপরিউক্ত সকল বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ বিতর তিন রাকাআত পড়তেন বলে উল্লেখ রয়েছে।

৪। তাছাড়া হযরত উমর (রা.) সা'দ (রা.) কে এক রাকআত বিতর আদায় করতে দেখে এরূপ করতে নিষেধ করে শাস্তির ধমক দিয়েছেন বলে হাদীসের বর্ণনায় রয়েছে। (আল মাবসূত: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬৪)

৫। হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, কোনো নামায যদি এক রাকআত করে পড়া যেত তাহলে ফজরের ফরয মুসাফিরের জন্য এক রাকআত করা হতো। (আল মাবসূত: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬৪)

বিতর নামায পড়ার নিয়ম: রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বিতর নামায আদায়ের পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা সম্পর্কীয় উপরে বর্ণিত হযরত ইবনে মাসউদ (রা.) এর মাতা থেকে যে রিওয়ায়াত এসেছে এর সারাংশ হচ্ছে: অন্যান্য নামাযের ন্যায় দুই রাকআত নামায পড়ে প্রথম বৈঠকে বসে তাশাহ্হুদ পড়া। তারপর তৃতীয় রাকাআত পড়ার জন্য উঠে সূরা ফাতিহার সঙ্গে অন্য কোনো সূরা বা আয়াত মিলানো। অতঃপর তাকবীর বলে দুই হাত কান পর্যন্ত উঠিয়ে হাত বাঁধা। তারপর (নিঃশব্দে) দুআয়ে কুনূত পড়া। দুআয়ে কুনূত পড়ে পূর্বের ন্যায় রুকু, সিজদার পর শেষ বৈঠকের তাশাহ্হুদ, দুরূদ ও দুআয়ে মাসুরা পড়ে সালাম ফিরানোর মাধ্যমে বিতরের নামায সমাপ্ত করতে হয়। (আল ইসতিআব ফী মা'রিফাতিল আসহাব: অধ্যায়: ام عبد بنت صويم بن قويم ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৯৪৬)

জাবির আহমদ ইয়াহইয়া
সিলেট

প্রশ্ন: ফজরের নামাযের জামাত আরম্ভ হলে ফরয নামাযে দাঁড়াব নাকি আগে সুন্নাত পড়ব?

জবাব: ফজরের সুন্নাত পড়ে যদি ইমামের সাথে এক রাকআত পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে মসজিদের বারান্দায় কিংবা জামাতের কাতার থেকে যথাসম্ভব দূরে সরে সুন্নাত আদায় করে জামাআতে শরীক হবে।

এ সম্পর্কে বিদায়াতুল মুবতাদী কিতাবে লিখেছেন-

ومن انتهى إلى الإمام في صلاة الفجر وهو لم يصل ركعتي الفجر إن خشي أن تفوته ركعة ويدرك الأخرى يصلي ركعتي الفجر عند باب المسجد ثم يدخل وإن خشي فوتهما دخل مع الإمام

-কেউ ফজরের নামাজের সুন্নাত আদায় করেনি অথচ ইমামকে ফরয

আদায়রত অবস্থায় পায় তাহলে যদি সুন্নাত পড়লে এক রাকাত ফরয ছুটে যাবে এবং একরাকাত পেয়ে যাবে এরূপ মনে করে, তাহলে মসজিদের দরজার নিকট ফজরের দুরাকাত সুন্নাত পড়ে নিবে, অতঃপর ইমামের সাথে ফরজে শামিল হবে। (বিদায়াতুল মুবতাদী: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২২; হিদায়াহ: ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৭১)

কিন্তু এক রাকআত পাওয়ার তথা রুকুতে শরীক হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে সুন্নাত না পড়েই জামাআতে শরীক হবে। এরপর সূর্যোদয়ের পর নিষিদ্ধ সময় চলে গেলে এ সুন্নাত পড়ে নিবে।

রীদা চৌধুরী
সাদাপুর, রাজনগর, মৌলভীবাজার

প্রশ্ন: নামাযে পুরুষদের জন্যে বুকের উপর হাত বাঁধা এবং রাফউল ইয়াদাইন করা কি সুন্নাত? সুন্নাত না হলে এমনটা করলে কোনো ক্ষতি হবে কি?

জবাব: নামায দ্বীনের অপরিহার্য ইবাদাত। এতে মনগড়া নীতির অনুসরণ চলে না। দালিলিক বিশ্লেষণে যা সঠিক বলে প্রমাণিত তাই এক্ষেত্রে অনুসরণীয়। আর উপরোক্ত বিষয় দুটি সুন্নাত হওয়া নিয়ে শরীয়ত বিশেষজ্ঞ ইমামগণের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান। ইমাম শাফিঈ (র.) ও অন্য কোন কোন ইমাম কতিপয় হাদীসের আলোকে যদিও বিষয় দুটিকে সুন্নাত বলেছেন, কিন্তু এর বিপরীতে নাভির নীচে হাত বাধার ও তাকবীরে তাহরীমাহ ব্যতীত অন্য কোথাও রাফউল ইয়াদাইন না করার হাদীস অধিক শক্তিশালী প্রমাণিত হওয়ার কারণে ইমাম আবূ হানীফা (র.) শেষোক্ত আমলদ্বয়কে সুন্নাত বলে রায় দিয়েছেন। তাই অমুজতাহিদের জন্যে বিষয় দুটি নিজ নিজ ইমামের অভিমতের উপর আমলে নেয়া উচিত। কেননা পরস্পর বিপরীতমুখী বর্ণনার ক্ষেত্রে অমুজতাহিদের পক্ষে নিজস্ব মনগড়া কোনো পথ বের করার সুযোগ নেই। এমনকি এটা সরাসরি নফসের অনুসরণের শামিল হওয়াতে পরিত্যাজ্য। পবিত্র কুরআন মজীদে মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون -তোমাদের জানা না থাকলে জ্ঞানীগনের নিকট জিজ্ঞাসা করো। (সূরা আম্বিয়া, আয়াত-০৭)

সালাহ উদ্দীন
ভুকশিমইল, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার

প্রশ্ন: এক ব্যক্তি ফজরের নামায প্রতিদিন সূর্যোদয় হবার দুই ঘণ্টা পরে পড়তে অভ্যস্ত। এতে কি তার নামায হবে? বিনা ওযরে নামায বিলম্বিত করার কারণে তার কোনো গুনাহ হবে কি?

জবাব: যেকোনো ফরয নামায তার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় করা ফরয। বিনা ওযরে ফরয নামায ছেড়ে দেওয়া কিংবা সময়ের মধ্যে আদায় না করা কবীরা গুনাহ। আর ফজরের নির্দিষ্ট সময় হচ্ছে সুবহে সাদিক থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত। তাই কেউ সর্বদা সূর্যোদয়ের পর ফজরের নামায পড়তে অভ্যস্ত হয়ে থাকলে প্রথমত তার পূর্বে কৃত কবীরা গুনাহের জন্যে তাওবা করা উচিত। আর যেহেতু অসময়ে হলেও কাযা হিসেবে সে নামাযগুলো পড়েছে, তাই পূণর্বার কাযা করার প্রয়োজন নেই। তবে পরবর্তীতে তাকে এ বদভ্যাস পরিহার করত যথাসময়ে নামায আদায়ের অভ্যাস করে নেয়া আবশ্যক।

হাফিয মো. সজীব
শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার

প্রশ্ন: সালাতুত তাসবীহ পড়ার বিধান কী? সালাতুত তাসবীহ পড়াকে কেউ কেউ বিদআত বলে উল্লেখ করেন, তা কি সঠিক? সালাতুত তাসবীহ নামায পড়া সম্পর্কে কোনো হাদীস আছে কি? দয়া করে জানাবেন।

জবাব: সালাতুত তাসবীহ নামায অতি ফযীলতপূর্ণ নফল নামাযের অন্তর্ভুক্ত। এটি বিদআত নয়। কেননা রাসূল ﷺ এ নামাযের ফযীলত বর্ণনা করে তা পড়তে উৎসাহিত করেছেন বলে হাদীস শরীফে উল্লেখিত হয়েছে। এ সম্পর্কে বর্ণিত হাদীস সুনান আবূ দাউদ, সুনান তিরমিযী, সুনান ইবন মাজাহ, মুসতাদরাকে হাকিমসহ বহু হাদীস গ্রন্থে এসেছে। নিম্নে ইবন মাজাহ কিতাবে উল্লেখিত হাদীস উল্লেখ করা হলো-

عن أبي رافع، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس :يا عم ألا أحبوك، ألا أنفعك، ألا أصلك» قال: بلى، يا رسول الله، قال: "فصل أربع ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة، فإذا انقضت القراءة فقل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة قبل أن تركع، ثم اركع فقلها عشرا، ثم ارفع رأسك فقلها عشرا، ثم اسجد فقلها عشرا، ثم ارفع رأسك فقلها عشرا، ثم اسجد فقلها عشرا، ثم ارفع رأسك فقلها عشرا قبل أن تقوم، فتلك خمس وسبعون في كل ركعة، وهي ثلاثمائة في أربع ركعات، فلو كانت ذنوبك مثل رمل عالج غفرها الله لك" قال: يا رسول الله ومن لم يستطع يقولها في يوم؟ قال قلها في جمعة، فإن لم تستطع فقلها في شهر» حتى قال قلها في سنة«

(سুনান ইবন মাজাহ; অধ্যায়: باب ما جاء في صلاة التسبيح)

উল্লেখ্য যে, উপরিউক্ত বর্ণনার সাথে অন্যান্য বর্ণনার শব্দগত ও অর্থগত ভিন্নতা রয়েছে। কোনো কোনো মনীষী এ সম্পর্কীয় হাদীসের বর্ণনাকে দুর্বল বলেছেন। তবে ফযীলতের ব্যাপারে দুর্বল হাদীসও গ্রহণযোগ্য। তাছাড়া কেউ কেউ আবার সহীহ বলেও আখ্যায়ন করেছেন। যেমন- এ সম্পর্কীয় একটি হাদীসকে ইমাম হাকিম ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ বলেছেন। ইমাম যাহাবীও তাতে সহমত পোষন করেছেন।

শাহ আব্দুল আজিজ জায়েদ
প্যারিস, ফ্রান্স

প্রশ্ন-১: কোনো নামাযে দুই কিংবা ততোধিক ওয়াজিব ছুটে গেলে সাহু সাজদার নিয়ম কী?

প্রশ্ন-২: নামাযে সাহু সাজদাহ ওয়াজিব হওয়ার পর ভুলে সাহু সাজদাহ আদায় না করে নামায শেষ করে ফেললে কী করণীয়?

জবাব-১: নামাযের মধ্যে একাধিক ওয়াজিব ছুটে গেলে তার দুটি সাজাদায়ে সাহু আদায়ই যথেষ্ট। এ সম্পর্কে মাজমাউল আনহুর কিতাবে লিখেছেন, وإن سها مرارا يكفيه سجدتان -নামাযী তার নামাযে কয়েকটি ভুল করলে তার জন্য দুটি সাহু সাজদাহ যথেষ্ট। (মাজমাউল আনহুর, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪৯)

জবাব-২: ভুলে সাহু সাজদাহ আদায় না করে নামায শেষ করে ফেললে মসজিদ থেকে বের না হওয়া কিংবা কথা না বলা পর্যন্ত কিংবা নামায ভঙ্গের কোনো কারণ সংগঠিত না হওয়া পর্যন্ত সাহু সাজদাহ আদায় করা যাবে। এ সম্পর্কে হাশিয়াতুত তাহতাবী কিতাবে লিখেছেন,

وفي الدر ولو نسي السهو أو سجدة صلبية أو تلاوية يلزم ذلك ما دام في المسجد اهـ يعني ولم يأت بمناف فإن وجد منه مناف أو خروج من المسجد قبل قضاء ما نسيه فسدت صلاته

-আদ-দুররুল মুখতার গ্রন্থে আছে, যদি কেউ সাহু সাজদাহ, সাজদায়ে সুলবী কিংবা তিলাওয়াতের সাজদাহ ভুলে যায় তবে মসজিদে থাকাবস্থায় নামায ভঙ্গকারী কিছু না করা পর্যন্ত উক্ত সাজদা করে নেয়া আবশ্যক। উক্ত সাজদা আদায়ের পূর্বে নামায ভঙ্গের কারণ ঘটলে কিংবা মসজিদ থেকে বের হলে তার নামায নষ্ট হবে (তখন নামায দুহরানো আবশ্যক হবে)। (তাহতাবী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৬৩)

রদ্দুল মুহতার কিতাবে আছে,

أن السجود لا يسقط بالسلام ولو عمدا إلا إذا فعل فعلا يمنعه من البناء بأن تكلم أو قهقه أو أحدث عمدا أو خرج من المسجد أو صرف وجهه عن القبلة وهو ذاكر له لأنه فات محله وهو تحريمة الصلاة فسقط ضرورة فوات محله

-সালাম ফিরানোর দ্বারা সাজদাহ রহিত হয় না, যদিও সালাম ইচ্ছা করে ফিরানো হয়। তবে এমন কোনো কাজ করলে যা নামায বহাল থাকার পরিপন্থি হয়, যেমন: কথা বলা, সজোরে হাসি দেওয়া, ইচ্ছাকৃতভাবে উযূ নষ্ট করা, মসজিদ থেকে বের হওয়া কিংবা সাজদাহর কথা স্মরণ থাকা অবস্থায় কিবলার দিক থেকে মুখ ফিরানো ইত্যাদি, তখন নামায নষ্ট হয়ে যাবে (তাই এমতাবস্থায় সাহু সাজদাহ দেওয়া যাবে না, বরং নামায দুহরাতে হবে)। (রদ্দুল মুহতার, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৯১)

মো: আব্দুল আলীম
ভালকী, লালাবাজার, সিলেট

প্রশ্ন: আযানের গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে জানতে চাই।

জবাব: ইসলামের অন্যতম শিআর তথা সৌন্দর্য ও নিদর্শন হলো আযান। আযানের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তাআলার একত্ববাদ ও বড়ত্বের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়, পাশাপাশি ফরয নামাযের দিকে আহ্বান করা হয়। দৈনিক পাঁচবার আযানের সুমধুর তানে মুমিনের হৃদয়ে ঈমানের জোয়ার আসে, খোদাপ্রেমে সিক্ত হয় মুমিনের অন্তরাত্মা। মুসলিম সমাজে শান্তি, সম্প্রীতি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠায় আযানের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আযানের তাৎপর্য সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন, وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون -আর যখন তোমরা নামাযের দিকে আহ্বান কর (আযান দাও), তখন তারা (কাফিররা) একে হাসি-তামাশা ও ক্রীড়া-কৌতুক হিসেবে গ্রহণ করে। এর কারণ হচ্ছে তারা এমন সম্প্রদায়, যাদের বুদ্ধি-বিবেক নেই। (সূরা মায়িদা, আয়াত-৫৮)

মহান আল্লাহ তাআলা এ সম্পর্কে আরও ইরশাদ করেন,

يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون

-হে মুমিনগণ! যখন জুমুআর দিনে নামাযের জন্য আহ্বান করা হয় (আযান দেওয়া হয়), তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে (নামাযের দিকে) ধাবিত হও। আর ক্রয়-বিক্রয় বর্জন কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা জানতে। (সূরা জুমুআহ, আয়াত-০৯)

হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, যখন আযান দেওয়া হয়, তখন শয়তান বায়ু নির্গমন করতে করতে এত দূরে চলে যায় যে, যেখান থেকে আযান শোনা যায় না। (সহীহ বুখারী)

প্রিয়নবী ﷺ আরও ইরশাদ করেন, যখন নামাযের সময় হয়, আর তোমরা দুজন ব্যক্তি থাক, তাহলে তোমাদের থেকে একজন আযান ও ইকামাত দেবে এবং দুজনের মধ্যে যে বড় সে ইমামতি করবে। (সহীহ বুখারী)

যে ব্যক্তি আযান দেয়, শরীআতের পরিভাষায় তাকে মুআযযিন বলা হয়। আমাদের সমাজে কতিপয় মানুষ আযান দেওয়াকে নিচু কাজ মনে করে, অথচ আযান দেওয়া অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও মহিমান্বিত একটি আমল। কিয়ামত দিবসে মুআযযিনগণ বিশেষ মর্যাদাবান হবেন। মুআযযিনের জন্য রয়েছে অফুরন্ত নিআমত, সুউচ্চ মর্যাদা ও জান্নাতের সুসংবাদ।

মহান আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين -তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা কার, যে আল্লাহর দিকে আহ্বান করে, সৎকর্ম করে এবং বলে, আমি একজন মুসলমান। (সূরা হা মীম সিজদাহ, আয়াত:৩৩)

সহীহ মুসলিমের হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة -মানুষের মধ্যে মুআযযিনগনের গর্দান কিয়ামত দিবসে সর্বাধিক লম্বা হবে। (باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه)

শরিফুল ইসলাম
আটগ্রাম, জকিগঞ্জ

প্রশ্ন: বিবাহ উপলক্ষ্যে পুরুষের (বরের) হাতে মেহেদি ব্যবহার শরীআতসম্মত কি না? জানতে চাই।

জবাব: পুরুষের জন্যে সৌন্দর্য তথা রং প্রকাশার্থে হাতে মেহেদি ব্যবহার সর্বাবস্থায় নাজায়িয, চাই সেটা বিবাহ উপলক্ষ্যে হোক কিংবা অন্য যেকোনো কারণে হোক।

অবশ্য মাথার চুল কিংবা দাড়ি সাদা হলে খিজাব হিসেবে চুল ও দাড়িতে পুরুষের জন্যে মেহেদি ব্যবহার বৈধ। উল্লেখ্য যে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে পুরুষের জন্য যেকোনো অঙ্গে মেহেদি ব্যবহার জায়িয।

এ সম্পর্কে ফাতাওয়া আলমগীরী কিতাবে লিখেছেন-

ولا ينبغي أن يخضب يدي الصبي الذكر ورجله إلا عند الحاجة ويجوز ذلك للنساء كذا في الينابيع.

-বিশেষ কোনো প্রয়োজন ব্যতীত কোনো বালকের হাতে ও পায়ে রং ব্যবহার করা যাবে না। তবে নারীদের ক্ষেত্রে তা জায়িয। (আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়্যাহ: ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫৯)

উক্ত কিতাবে আরো লিখেছেন-

اتفق المشايخ رحمهم الله تعالى أن الخضاب في حق الرجال بالحمرة سنة وأنه من سيماء المسلمين وعلاماتهم

-মনীষীগণ এ বিষয়ে একমত যে, পুরুষের জন্যে (চুল ও দাড়িতে) লাল রংয়ের খিজাব ব্যবহার সুন্নাত এবং অবশ্যই মুসলমানদের বিশেষ প্রতীক ও নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। (আল ফাতাওয়াল হিন্দিয়্যাহ: ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৫৯)

এহসান আহমদ
বিশ্বনাথ, সিলেট

প্রশ্ন: কুরআন মাজীদের উপর কোনো ফিকহের কিতাব রাখা যাবে কি?

জবাব: পবিত্র কুরআন মাজীদ মহান আল্লাহ তাআলার মহাপবিত্র গ্রন্থ। এর অতুলনীয় মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বহু আয়াতে বর্ণনা করেছেন। উপরন্তু তা আল্লাহর ঐ সকল নিদর্শনের অন্যতম, যেগুলোর সম্মান প্রদান ঈমান ও তাকওয়ার জন্যে অপরিহার্য। পবিত্র কুরআনের কপি (মুসহাফ) অন্য সকল ধর্মীয় জ্ঞান সম্বলিত গ্রন্থাবলির উপর মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ। সুতরাং এর উপর হাদীস, তাফসীর কিংবা ফিকহের কোনো কিতাব রাখা এর মর্যাদা হানিকর হওয়াতে অসমীচীন।

قال الحكيم الترمذي رحمه الله: ومن حرمته– يعني المصحف– إذا وضع أن لا يتركه منشورا، وأن لا يضع فوقه شيئا من الكتب، حتى يكون أبدا عاليا على سائر الكتب

-হাকীম তিরমিযী বলেন, কুরআন মাজীদের সম্মানের অন্তর্ভুক্ত বিষয়াবলির মধ্যে রয়েছে, তা বিক্ষিপ্তভাবে না রাখা এবং এর উপর অন্য কোনো কিতাব না রাখা যাতে সর্বদা তা অন্য সকল কিতাবের উপরে থাকে। (নাওয়াদিরুল উসূল: ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-২৫৪)

ইমাম বাইহাকী (র.) তদীয় শুআবুল ঈমান গ্রন্থে লিখেছেন:

وَمِنْهَا: أَنْ لَا يُحْمَلَ عَلَى الْمُصْحَفِ كِتَابٌ آخَرُ، وَلَا ثَوْبٌ، وَلَا شَيْءٌ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُصْحَفَانِ، فَيُوضَعَ أَحَدُهُمَا فَوْقَ الْآخَرِ: فَيَجُوزُ

-কুরআন মাজীদের আদবের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে, কুরআন মাজীদের কপির উপর অন্য কোন কিতাব, কাপড়, কিংবা অন্য কোন কিছু না রাখা। তবে কুরআন মাজীদের দুটি কপি থাকলে, তখন একটির উপর অন্যটি রাখলে তা জায়িয হবে। (শুআবুল ঈমান: ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা ৩২৯)

অভ্যন্তরীণ

বাজেটে এমপিওভুক্তিতে সুখবর

২০২১-২২ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির সুযোগ রেখে বরাদ্দ চেয়েছিলো শিক্ষা মন্ত্রণালয়। বরাদ্দ চাওয়ার বিপরীতে অর্থ মন্ত্রণালয় সেই বরাদ্দ সিলিং করে দিয়েছিলো আগেই। সিলিংকৃত বরাদ্দ থেকে প্রায় ৩০০ কোটি টাকা এমপিওভুক্তির জন্য ব্যয় করতে পারবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

গত ৩ জুন বাজেট বক্তব্যে অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য থেকে জানা যায়, আগামী ২০২১-২২ অর্থবছরে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক খাতে ৩৬ হাজার ৪৮৬ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে এবং কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষার জন্য ৯ হাজার ১৫৩ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে। সে হিসেবে মোট বরাদ্দ ৪৫ হাজার ৬৩৯ কোটি টাকা।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সংশ্লিষ্ট উইং থেকে জানা গেছে, নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির জন্য সব মিলিয়ে প্রায় ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ থাকবে। কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগ নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির জন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ চাইলেও ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়।

এবারও হজ্জে যেতে পারবেন না বাংলাদেশিরা

মহামারি করোনা ভাইরাসের প্রকোপ বাড়ায় সৌদি আরব হজ্জ পালনের অনুমতি দিচ্ছে না এবারও। তাই বাংলাদেশের কোনো হজ্জযাত্রী হজ্জে যেতে পারছেন না। জাতীয় সংসদে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট বক্তৃতাকালে একথা জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল। তিনি বলেন, আগামী বছরগুলোতে সুষ্ঠুভাবে হজ্জের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে। এদিকে সৌদি সরকার জানিয়েছে এবছর হজ্জের জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছে শুধু সৌদিতে বসবাসরত ৬০ হাজার নাগরিককে। যেসকল নাগরিক ব্যাবসা বা অন্য কারণে সৌদিতে বসবাস করে আসছেন তারাও এই সুযোগের আওতাভুক্ত। জুলাই মাসের মধ্যভাগে অনুষ্ঠিতব্য হজ্জে সকল হাজীকে অবশ্যই হজ্জ শুরুর আগেই করোনা টিকা গ্রহণ করতে হবে। ১৮-৬৫ বছর বয়সীরা হজ্জের সুযোগ পাবেন এবং হজ্জযাত্রীদের দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্ত ও সুস্থ-সবল থাকতে হবে। পাশাপাশি করোনা সংক্রমণরোধে সামাজিক দূরত্ব ও মাস্ক পরিধান নিশ্চিত করাসহ সবধরনের স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করতে হাজীদের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর খুনিদের খেতাব বাতিল

বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত ও মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত চার খুনির মুক্তিযুদ্ধের খেতাব বাতিল করেছে সরকার। ৬ জুন এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়। যাদের খেতাব বাতিল হয়েছে তারা হলেন, কর্নেল শরিফুল হক ডালিম (বীর উত্তম-গেজেট নম্বর ২৫), লে. কর্নেল এস এইচ এম বি নূর চৌধুরী (বীর বিক্রম- গেজেট নম্বর ৯০), এ এম রাশেদ চৌধুরী (বীর প্রতীক- গেজেট নম্বর ২৬৭) এবং নায়েক সুবেদার মোসলেম উদ্দিন খান (বীর প্রতীক- গেজেট নম্বর ৩২৯), প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের সভার সিদ্ধান্তের আলোকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

দেশ জুড়ে একই রেটে ইন্টারনেট

সারাদেশে ইন্টারনেট সংযোগের মাসিক ফি নির্ধারণ করে দিয়েছে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)। এখন থেকে গ্রাহক পর্যায়ে ৫ এমবিপিএস গতির ইন্টারনেটের সর্বোচ্চ মূল্য হবে ৫০০ টাকা। নতুন এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১০ এমবিপিএসের মূল্য ৭০০ টাকা থেকে ৮০০ টাকা এবং ২০ এমবিপিএসের মূল্য ১০০০ থেকে ১২০০ টাকা। ব্রডব্যান্ডের ট্যারিফ ও মূল্য নির্ধারণের এই কর্মসূচির নাম দেওয়া হয়েছে 'এক দেশ, এক রেট'। কর্মসূচি উদ্বোধনকালে ডাক এ টেলিযোগাযোগমন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার জানান, দেশে বর্তমানে ব্রডব্যান্ড ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ১ কোটি, এই রেটে শুধু ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট বিক্রি হবে। আইআইজি ফোরামের সাধারণ সম্পাদক আহমেদ জুনায়েদ জানান, এর মাধ্যমে প্রান্তিক পর্যায়ের ব্যবহারকারীরা ঢাকার দামে ইন্টারনেট সুবিধা পাবে। এতে করে দেশে বিরাজমান ডিজিটাল বৈষম্য কমবে।

ভূমধ্যসাগর থেকে উদ্ধার ৫৩৯ বাংলাদেশি

লিবিয়া থেকে ইতালি যাওয়ার পথে ভূমধ্যসাগরের বিভিন্ন স্থান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ৪৪৩ বাংলাদেশিকে। উদ্ধারের পর তাদেরকে আটক দেখিয়েছে লিবিয়া ও তিউনিসিয়ার পুলিশ। অপরদিকে তিউনিসিয়ার উপকূল থেকে আটক করা হয় ১৬৪ বাংলাদেশিকে। লিবিয়া ও তিউনিসিয়া থেকে ইউরোপে যাওয়ার পথে নৌকা ডুবে প্রায়ই মৃত্যু হয় বাংলাদেশিদের। তারপরও ভূমধ্যসাগর হয়ে ইউরোপে যাওয়ার প্রবণতা থামছে না। আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) তথ্যানুসারে, চলতি বছরের ১ জানুয়ারি থেকে ১২ জুন পর্যন্ত ভূমধ্যসাগরে ৮১৩ জন অভিবাসন প্রত্যাশীর মৃত্যু হয়েছে। মানব পাচারকারীদের হাত থেকে উদ্ধার হয়েছে ১৬০ জন। ২০১৫ সালের পর থেকে এখন পর্যন্ত ভূমধ্যসাগর থেকে উদ্ধার হয়ে দেশে ফিরেছেন ২ হাজার ৯০০ বাংলাদেশি। এছাড়া লিবিয়ার মরুভূমি থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ৮৬ জনকে।

বান্দরবানে নওমুসলিমকে গুলি করে হত্যা

বান্দরবানের রোয়াংছড়িতে ওমর ফারুক নামে এক নওমুসলিমকে গুলি করে হত্যা করেছে সন্ত্রাসীরা। শুক্রবার (১৮ জুন) রাত ৯ টার দিকে রোয়াংছড়ি সদর ইউনিয়নের তুলাছড়ি আগাপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায়, ওমর ফারুকের পূর্ব নাম বেন্না ত্রিপুরা (৪০)। তিনি ইশার নামায পড়ে ঘরে ফেরার সময় সন্ত্রাসীরা গুলি করে তাকে হত্যা করে। কে বা কারা তাকে হত্যা করেছে এই বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায়নি। তবে বেশ কিছুদিন ধরে জে এসএসের (সন্তু লারমা) কর্মীরা তাকে হুমকি দিয়ে আসছিলো।

জানা যায়, ওমর ফারুক ২০১৪ সালে খ্রিষ্টান ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। সেই সাথে রোয়াংছড়ি পাহাড়ি অঞ্চলে সর্বপ্রথম মসজিদ নির্মাণ করেন। তার দাওয়াতি কাজ বন্ধ করতে বার বার হুমকি দিয়ে আসছিলো সন্তু লারমার কর্মীরা। সবশেষে এই হত্যাকাণ্ডের পর সন্দেহের তির জেএসএসের দিকেই।

জকিগঞ্জে দেশের ২৮ তম গ্যাসক্ষেত্রের সন্ধান

সিলেটের জকিগঞ্জে অনুসন্ধান কূপে দারুণভাবে সফলতার আলামত দেখছেন বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানি (বাপেক্স)। এটি বাংলাদেশের ২৮ তম গ্যাসক্ষেত্র হতে যাচ্ছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সিনিয়র সচিব আনিসুর রহমান জানান, আমরা নতুন একটি ফিল্ডে সফল হতে চলেছি। সেখানে কূপের প্রেসার ৬০ হাজারের অধিক রয়েছে। এটি আমাদের জন্য দারুণ সুখবর হতে পারে।

বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত ২৭ টি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এসব গ্যাসক্ষেত্রে মজুদের পরিমাণ ২১ দশমিক ৪ টিসিএফ। এর মধ্যে প্রায় সারে ১৮ টিসিএফ উত্তোলন করা হয়েছে। সে হিসেবে প্রমাণিত মজুদ অবশিষ্ট রয়েছে মাত্র ৩ টিসিএফ। বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ জানান, ২৮ তম গ্যাসক্ষেত্রের ব্যাপারে আমরা ভালো কিছু আশা করছি। সেখান থেকে আমরা বেশ কিছু গ্যাস পাওয়ার সম্ভাবনা দেখছি।

৫০টি মডেল মসজিদ উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'মুজিব বর্ষ' উপলক্ষে ১০ জুন বৃহস্পতিবার সারা দেশে ৫০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

উদ্বোধন করেছেন। প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে মোট ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিক পর্যায়ে ৫০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উদ্বোধন করা হয়েছে।

উদ্বোধনের সময় দেওয়া ভাষণে ইসলামের প্রকৃত মর্মবাণী প্রচারে এই মসজিদগুলো ভূমিকা রাখবে বলে আশা প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'ইসলামের মর্মবাণী যেন এ দেশের মানুষ জানতে পারে, বুঝতে পারে। আমরা বাংলাদেশের মানুষ ধর্ম নিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করি, স্ব স্ব ধর্ম যত্নসহকারে লালন-পালন করি এবং সংরক্ষণ করি। ইসলাম আমাদের সেই মানবতার শিক্ষাই দিয়েছে।

শাইখুল হাদীস আল্লামা ছালিক আহমদ ছাহেবের ইন্তিকাল

সিলেটের প্রাচীনতম ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি বিদ্যাপীঠ সৎপুর কামিল মাদরাসার উপাধ্যক্ষ মাওলানা ছালিক আহমদ সাহেব ইন্তিকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। গত ২৪ জুন বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে সাতটায় সিলেট নগরীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎধীন অবস্থায় তিনি ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৩ বছর। তিনি স্ত্রী, তিন ছেলে, তিন মেয়ে সহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

আন্তর্জাতিক

রেকর্ড গতিতে বাড়ছে খাবারের দাম

বিশ্বে দ্রুত গতিতে খাবারের দাম বৃদ্ধির রেকর্ড তৈরি হয়েছে বলে জানিয়েছে জাতিসংঘ। জাতিসংঘের তথ্যমতে বিগত এক বছরে খাবারের দাম বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। গত মে মাসে এর আগের বছরের তুলনায় দাম বেড়েছে ৩৭.৫ শতাংশ। মূলত কয়েকটি দেশে চাহিদা বাড়ার সঙ্গে উৎপাদন কমে যাওয়ার ফলেই দাম বেড়েছে। মহামারির মধ্যে উৎপাদন, শ্রমিক এবং পরিবহন বিঘ্নিত হওয়ায় বিপাকে সরবরাহকারীরা। খাবারের দাম বৃদ্ধির কারণে আরও মুদ্রাস্ফীতি এবং মোদি দোকানের অতিরিক্ত বিলের প্রভাবে অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে কেমন প্রভাব ফেলবে তা নিয়ে আশঙ্কাও বাড়ছে। বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, চাহিদা বৃদ্ধি ও কম উৎপাদন অব্যাহত থাকলে মুদ্রাস্ফীতি চরম আকার ধারণ করবে।

ঘুষ নেয়ার দায়ে অভিযুক্ত সু চি

মিয়ানমারের কারাবন্দি নেত্রী অং সান সু চির বিরুদ্ধে ঘুষ নেয়ার অভিযোগ তুলেছে দেশটির সামরিক জান্তা। তাদের দাবি, ইয়াঙ্গুনের সাবেক আঞ্চলিক মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে ছয় লাখ ডলার ও ১১ কেজি স্বর্ণ ঘুষ নিয়েছেন সু চি। খবরটি প্রকাশ করেছে ব্রিটিশ গণমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দাতব্য সংস্থার জন্য ক্ষমতার অপব্যবহার করে সু চি দুটি জমি ব্যবহার করেছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। বেশ কয়েক সপ্তাহের আইনি লড়াইয়ের পর জুন মাসেই সু চির বিরুদ্ধে আনা দুটি মামলার বিচার শুরু হবে। উল্লেখ্য গত ১ ফেব্রুয়ারি সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমাতাচ্যুত করা হয় অং সান সু চিকে।

ভারতে পদত্যাগ করেছেন ৩ হাজার ডাক্তার

ভারতের মধ্যপ্রদেশে জুনিয়র ডাক্তাররা বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলনে নেমেছেন। তাদের দাবি হচ্ছে করোনায় আক্রান্ত হলে তাদের ও পরিবারকে বিনামূল্যে চিকিৎসা দিতে হবে, সেই সাথে বৃত্তিও বাড়াতে হবে। এদিকে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট তাদের এই আন্দোলনকে 'অবৈধ' ঘোষণা করে কাজে ফিরতে নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু আদালতের নির্দেশকে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়ে কাজে ফিরতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন ডাক্তাররা। জানা গেছে, ইতোমধ্যেই প্রায় ৩ হাজার জুনিয়র ডাক্তার পদত্যাগ করেছেন। তারা বলছেন, হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে তারা সুপ্রিম কোর্টে যাবেন। মধ্যপ্রদেশ সরকার জুনিয়র ডাক্তারদের বৃত্তি ১৭ শতাংশ বাড়ানোর কথা জানালেও ডাক্তারদের দাবি ২৪ শতাংশ বাড়াতে হবে। এর আগে গত মে মাসে সরকার তাদের সব দাবি মেনে নেয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও তা কিন্তু বাস্তবায়িত হয়নি। তাই ডাক্তারদের এ ধর্মঘট বলে মনে করছেন অনেকে।

ভারতে মুসলিম বৃদ্ধকে মারধরের পর কেটে দেওয়া হয় দাড়ি

কোনোভাবেই যেন হ্রাস পাচ্ছে না ভারতে মুসলিম নির্যাতন। মসজিদ গুঁড়িয়ে দেয়া, বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা যেন নিয়মিত ঘটনায় পরিণত হয়েছে। এবার ভারতের উত্তরপ্রদেশে ফের মুসলিম বৃদ্ধকে নির্যাতন করেছে স্থানীয় একদল হিন্দু যুবক। নির্যাতিত ব্যক্তির নাম আব্দুস সামাদ। নির্যাতনের বিবরণ দিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন তিনি। ইতোমধ্যে সেই ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। ভারতের সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি অনলাইনকে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ জানিয়েছে, উত্তরপ্রদেশের লোনি শহরে ঘটেছে মুসলিম নির্যাতনের এই ঘটনা। গ্রেফতার করা হয়েছে হামলাকারী এক হিন্দু যুবককে, অন্যদের গ্রেফতারের জন্য চলছে অভিযান।

ভিডিয়ো বার্তায় আব্দুস সামাদ জানান, মসজিদে ইশার নামায আদায় শেষে অটো রিকশার অপেক্ষা করছিলেন তিনি। সে সময় অটো রিকশা করে তিন যুবক তার সামনে এসে থামে এবং বলে তার সাথে জরুরি কথা আছে। কী কথা জানতে চাইলে চড় থাপ্পড় দিয়ে মাটিতে ফেলে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয় একটি কুঁড়েঘরে। ভিডিয়োবার্তায় কাঁদতে কাঁদতে তিনি জানান, ঘরে নিয়ে কাঠ ও বাঁশ দিয়ে আমাকে মারধর করা হয়। তারপর ছুরি দিয়ে কেটে দেয়া হয় দাড়ি। দাড়ি কেটে দিয়ে 'জয় শ্রীরাম' ও 'বন্দে মাতরম' স্লোগান উচ্চারণ করতে বলা হয়। আমি কী অপরাধ করেছি জানতে চাইলে তারা বলে, আমি পাকিস্তানি এজেন্ট। আব্দুস সামাদ আরও জানান, তারা আমাকে মুসলিম নির্যাতনের বিভিন্ন ভিডিয়ো দেখিয়ে বলে যে, আমি যদি অপরাধ স্বীকার না করি তবে নির্যাতন আরও বাড়বে। আমাকে ও আমার পরিবারের সদস্যদের হত্যার হুমকিও দেওয়া হয়।

মুসলিম নির্যাতনের ভিডিয়ো ভাইরাল হওয়ার পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নানা রকম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। বার বার এমন নির্যাতনের পরও উল্লেখযোগ্য কোন বিচার না পাওয়ায় হতাশা প্রকাশ করেন অনেকে। এনডিটিভির সাবেক প্রধান সংবাদদাতা আরফা খানম তার ফেসবুক পোস্টে লেখেন, একজন মুসলিম বৃদ্ধ যে তোমার দাদার বয়সী তাকে চড় থাপ্পড় ও লাথি দেয়া হয়েছে। কেটে দেয়া হয়েছে তার দাড়ি এবং আঘাত করা হয়েছে 'জয় শ্রীরাম' উচ্চারন করানোর জন্য। দাড়ি কেটে দেয়ার মাধ্যমে তার ধর্মবিশ্বাসের অবমাননা করা হয়েছে। এই নির্যাতনের সাথে তোমার নাম ও তোমার হিন্দু ধর্মের নাম জড়িত। তোমার নীরবতা প্রমাণ করে তুমিও তা সমর্থন করো।

পাসপোর্টে জেরুজালেমকে 'ফিলিস্তিনি অঞ্চল' লেখলো যুক্তরাজ্য

যুক্তরাজ্য-ইসরায়েল দ্বিনাগরিকত্ব সম্পন্ন এক নারীর নতুন পাসপোর্টে জন্মস্থান হিসেবে জেরুজালেমের জায়গায় 'দখলকৃত ফিলিস্তিনি অঞ্চল' লেখেছে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ। ইসরায়েলি দৈনিক হারেজের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। ইসরায়েলের রাষ্ট্রীয় সম্প্রচার মাধ্যম কানকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে আয়েলেত বালাবান নামে এক ইয়াহুদী নারী জানান, তার নতুন পাসপোর্টে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ জেরুজালেমকে 'দখলকৃত ফিলিস্তিনি অঞ্চল' উল্লেখ করেছে। যা দেখে তিনি রীতিমতো হতবাক হয়ে যান।

আয়েলেতের এই পাসপোর্ট থেকে এটা ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, ব্রিটিশ সরকার সম্ভবত তাদের নীতিতে পরিবর্তন এনেছে। কারণ দুবছর আগে আয়েলেতের ভাই পাসপোর্ট করেছেন। সেই পাসপোর্টে তার জন্মস্থান জেরুজালেম লেখা আছে। এই বিষয়টি জানতে লন্ডনে ইসরায়েলের রাষ্ট্রদূতের সাথে যোগাযোগ করা হলে তারা কিছুই জানায়নি। জেরুজালেম সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের বর্তমান অবস্থান হলো, পশ্চিম জেরুজালেম কার্যত ইসরায়েলের অংশ। তবে পূর্ব জেরুজালেম ইসরায়েলের দখলকৃত এলাকা।

সুনামগঞ্জের পাগলা বড় মসজিদ

সুনামগঞ্জ জেলার প্রাচীন স্থাপত্যনিদর্শন পাগলা বড় মসজিদ। এটি সম্পর্কে না জানলে যে কেউ তা দেখে সম্রাট আকবরের রাজপ্রাসাদ কিংবা সম্রাট শাহজাহানের তাজমহল ভাবতে পারেন। কারণ তাজমহল নির্মাণে যেসব পাথর ব্যবহার করা হয়েছিল এই নিদর্শনটিতেও একই রকম পাথর ব্যবহার করা হয়েছে। শত বছরের পুরনো এ স্থাপত্য সুনামগঞ্জ জেলার দক্ষিণ সুনামগঞ্জ উপজেলার পশ্চিম পাগলা ইউনিয়নের রায়পুর গ্রামে অবস্থিত। এটি স্থানীয়ভাবে বড় মসজিদ নামেই পরিচিত। জানা যায়, ঐ গ্রামের বেশ বিত্তবান, জমিদার এবং ধর্মপরায়ণ ইয়াসিন মির্জা ও তাঁর ভাই ইউসুফ মির্জা ১৩৩১ বঙ্গাব্দে মসজিদটি নির্মাণ করেন। মসজিদটির নির্মাণকাজে মূল মিস্ত্রিসহ সবধরণের মিস্ত্রিরা ছিলেন ভারতীয়। মূল স্থপতির নাম 'মুমিন আস্তাগার'। যার পূর্বপুরুষরা ভারতের সম্রাট শাহজাহানের তাজমহলের মিস্ত্রি ছিলেন।

মহাশিং নদীর কূল ঘেঁষে রাজকীয় নিদর্শন বেশে, দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্যশিল্পে দাঁড়িয়ে থাকা মসজিদটির ভিতরের ফ্লোর ও তার আশপাশের কারুকার্য দেখতে প্রায় তাজমহলের মতো। নামাজের জন্য নির্ধারিত স্থান দু'তলায় মিহরাব অংশে জমকালো পাথর কেঁটে তুলা

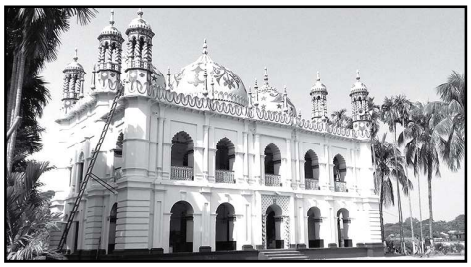

হয়েছে আকর্ষণীয় ডিজাইন। পুরো মসজিদের চারপাশে তিনফুট উচ্চতা পর্যন্ত যে কারুকার্য খচিত টাইলস লাগানো হয়েছে সেটাও উঁচুমানের স্থাপত্যশৈলীর ইঙ্গিত বহন করে। জানা যায়, মসজিদে ব্যবহৃত টাইলসগুলো আনা হয়েছিল ইতালি, জার্মানি ও ইংল্যান্ড থেকে। প্রত্যেকটা প্রবেশদ্বারে পাথরখচিত খিলান মসজিদটিকে বেশ দৃষ্টিনন্দন করে তুলেছে। মসজিদের নিচতলার ছাদ ঢালাইয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে রেলের স্লিপার। ছাদ ও গম্বুজের চারপাশে পাথর খোদাই করা পাতার ডিজাইন গ্রামীণ ঐতিহ্যের জানান দিচ্ছে। মসজিদের দু'তলার মেঝেতে রয়েছে দুর্লভ শ্বেতপাথর, যেগুলো আনা হয়েছিল ভারতের জয়পুর থেকে। মসজিদে ব্যবহৃত এই জাতের পাথর একমাত্র তাজমহলে ব্যবহার করা হয়েছে বলে জানা যায়। তাছাড়া আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, দ্বি-তল বিশিষ্ট এই স্থাপনাটিতে কোনো ধরনের রডের ব্যবহার ছাড়াই সম্পূর্ণ ইটের উপর নির্মাণ করা হয়েছে। মসজিদটি ১৫০ ফুট দৈর্ঘ্য ও ৫০ ফুট প্রস্থ। গম্বুজসহ মোট উচ্চতা ৪০ ফুট। ছয়টি স্তম্ভের উপর ছয়টি মিনার, তিনটি বিশাল গম্বুজ এবং ছোট সাইজের আরও রয়েছে বারোটি মিনার। মসজিদটি নির্মাণে সময় লেগেছিল প্রায় দশ বছর। ভূমিকম্প নিরোধক ব্যবস্থা হিসেবে ভূমি খনন করে বেশ মজবুত পাতের উপর স্থাপনাটির ভিত নির্মিত। ফলে অনেকগুলো বড় মাপের ভূমিকম্পও এখন পর্যন্ত শতবছরের পুরনো এ মসজিদটিতে ফাটল ধরাতে পারেনি।

রহস্যময় ও ব্যয়বহুল এ মসজিদ নির্মাণের পিছনে মূল কারণ কী ছিলো? এ সম্পর্কে নানান জনশ্রুতি রয়েছে। কেউ কেউ বলছেন, মহাশিং নদী থেকে একসময় অলৌকিকভাবে ৭টি গুপ্তধন পানিতে ভেসে উঠেছিলো। আর এগুলো ইয়াসিন মির্জা ও তাঁর ভাই ইউসুফ মির্জা পেয়েছিলেন। পরে স্বপ্নে দেখতে পেলেন যে, এগুলো দিয়ে যেন তারা নদীর পাড়ে মসজিদ নির্মাণ করেন। তাই অনেকে মনে করছেন এখান থেকেই এই মসজিদের সূচনা হতে পারে।

*সংকলনে: **শহিদুল ইসলাম রেদুয়ান**, দামোধরতপী, দক্ষিণ সুনামগঞ্জ ।*

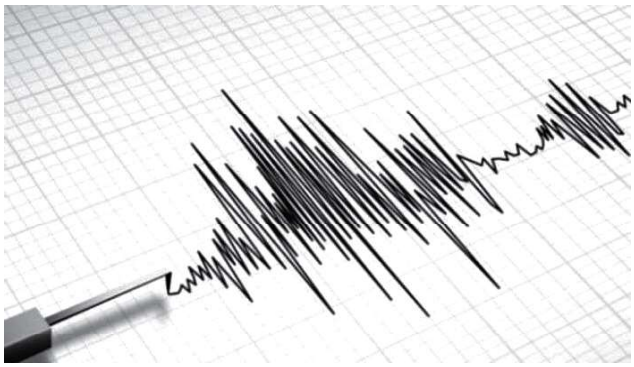

ভূমিকম্পের দশ কাহন

ভূমিকম্প এমন একটি আকস্মিক ঘটে যাওয়া দুর্যোগ, যা পূর্ব থেকে অনুমান করা যায় না। সম্প্রতি পুণ্যভূমি সিলেটে কয়েকদফা মৃদু ভূকম্পন হয়েছে। ভূমিকম্প সম্পর্কে আমরা কতটা জানি? যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা জিওলজিক্যাল সার্ভিস ভূমিকম্প সম্পর্কে কয়েকটি প্রামাণিক তথ্য প্রকাশ করেছে। আসুন, দেখে নেয়া যাক-

- সারা বিশ্বে প্রতিবছর সাধারণত রিখটার স্কেলে ৭ মাত্রার ১৭টি বড় ধরনের ভূমিকম্প হয়। রিখটার স্কেলে ৮ মাত্রার ভূমিকম্প হয় ১ টি।
- সার্ভে মতে, লাখলাখ ভূমিকম্প হয় রিখটার স্কেলে ২ মাত্রার নিচে, যা আমরা বুঝতে পারি না। ছোটছোট ভূমিকম্প বড় ভূকম্পনের ঝুকি অনেকটা কমিয়ে দেয়।
- ২০০৯ সালের ১১ মার্চ জাপানে ৮.৯ মাত্রার ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়েছিল, যার কারণে দিনের দৈর্ঘ্য ১.৮ মাইক্রো সেকেন্ড কমে গিয়েছিল। বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, বিশ্বে টানা ভূকম্পন হলে রাত-দিনের দৈর্ঘ্য স্থায়ীভাবে কিছুটা কমে যেতে পারে।
- যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকো শহর ভূমিকম্পের কারণে প্রতিবছর ২ ইঞ্চি করে লস এঞ্জেলসের দিকে সরে যাচ্ছে। এরকম অবস্থা চললে দু'লাখ বছর পর দুটি শহর একত্র হয়ে যাবে।
- ২০০৯ সালে ইতালিতে এক ধরনের ব্যাঙ পানি থেকে উধাও হয়ে যায়। গবেষণায় জানা যায়, ভূমিকম্পের পূর্বে মাটি থেকে পানিতে যে দুর্গন্ধ বেরিয়েছিল, ব্যাঙ তা শনাক্ত করতে পেরেছিল।
- পৃথিবীতে হওয়া ৯০ শতাংশ ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয় প্রশান্ত মহাসাগর এলাকায়। এজন্য ক্যারিবীয় দ্বীপসমূহ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা সবচেয়ে বেশি এ দুর্যোগের কবলে পড়ে।
- ২০১০ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি চিলির কনসেপসিওন শহরে যে ভূমিকম্প হয়েছিল, তার কারণে শহরটি ১০ ফুট পশ্চিমে সরে গিয়েছিল।
- ২০১৫ সালে নেপালে হওয়া ভূমিকম্পে মাউন্ট এভারেস্টের উচ্চতা এক ইঞ্চি কমে গিয়েছিল।
- ভূমিকম্পের পূর্বাভাস মানুষ বুঝতে না পারলেও পশুপাখি অনেকটা বুঝতে পারে। ২০০৪ সালে ইন্দোনেশিয়ায় হওয়া ভূমিকম্প ও সুনামির পূর্বে হাজার হাজার পশু-পাখিকে পাহাড়ের দিকে ছুটতে দেখা যায় । ভূগর্ভের আলোড়ন মাটিতে থাকা পিপীলিকা বুঝতে পারে এবং ভূকম্পনের পূর্বে মাটির উপরে উঠে যায়।
- ভূমিকম্প সবচেয়ে বেশি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে পানিতে। ভূমিকম্পের কারণেই সমুদ্রে সুনামি সৃষ্টি হয়।

*সংকলনে: **মোহাম্মদ সিদ্দীক হায়দার**।*

বিজ্ঞান

পরওয়ানা ডেস্ক

বন নাকি সমুদ্র, অক্সিজেনের বড় উৎস কোনটি!

প্রশ্নটি একটু অদ্ভুত মনে হতে পারে আমাদের নিকট। আমরা ছোটকাল থেকে শুনে আসছি, গাছ আমাদেরকে অক্সিজেন দেয়, পৃথিবীর অক্সিজেনের প্রধান উৎস স্থলভাগের বনাঞ্চল, ফলে এর বাইরে কোন কিছু শুনতে আমরা খুব একটা অভ্যস্থ নই। কিন্তু বিজ্ঞানীদের মতে, পৃথিবীর বেশির ভাগ অক্সিজেনের উৎস কিন্তু স্থলভাগের বনাঞ্চল নয়, বরং বেশির ভাগ অক্সিজেন আসে সমুদ্র থেকে। পৃথিবীর স্থলভাগের পরিমাণ জলভাগের চেয়ে অনেক কম, তার উপর স্থলভাগের বড় একটি অংশ মানুষ অক্সিজেন উৎপাদনের চেয়ে বরং বসবাস ও অন্যান্য কাজে ব্যবহার করছে। অন্যদিকে ভূপৃষ্ঠের বিশাল জলরাশিতে শৈবালসহ যে সকল সামুদ্রিক উদ্ভিদ রয়েছে, এগুলো কিন্তু আমাদের অচেনা বন্ধু হিসেবে ঠিকই অক্সিজেন উৎপাদন করে যাচ্ছে। সমুদ্রের অতি ক্ষুদ্র যে সকল উদ্ভিদ খালি চোখে এমনকি দেখাও যায় না, সেগুলোও কিন্তু অক্সিজেন উৎপাদনে ভূমিকা রাখছে প্রতিনিয়ত। ছোট ছোট ব্যাক্টরিয়াও অক্সিজেন উৎপাদনে ভূমিকা রাখছে। বিজ্ঞানীদের মতে শুধু ব্যাক্টরিয়াই আনুমানিক ২০ শতাংশ অক্সিজেন উৎপাদন করে, আর সমুদ্র থেকে উৎপাদিত অক্সিজেনের পরিমাণ মোট অক্সিজেনের ৮০ শতাংশের কাছাকাছি বলেও অনেক বিজ্ঞানী দাবি করেন।

পাথরখেকো প্রাণী

প্রাণিজগতের বিচিত্র খাদ্যাভ্যাসের কথা একটু চিন্তা করলেই উপলব্ধি করা সম্ভব। কিন্তু এরপরও মাঝেমধ্যে কিছু প্রাণির এতো অদ্ভুত খাদ্যাভ্যাসের কথা আমরা জানতে পারি, যা আমাদেরকে আসলেই বিস্মিত করে। এমন এক প্রাণি হলো শিপওয়ার্ম প্রজাতির এক ধরনের ঝিনুক। ফিলিপাইনের আবাতান নদীর পাড়ে এ প্রজাতির ঝিনুকের দেখা মিলে।

প্রায় এক ফুট থেকে পাঁচ ফুট দীর্ঘ এসকল ঝিনুকের প্রধান খাদ্যই হচ্ছে। পাথর খেয়েই তারা জীবন ধারণ করে। সাধারণের চেয়ে বড় আকারের এসব ঝিনুকের খোলসের বাইরেই সাদা জেলির মতো দেহাংশ থাকে। এদের কয়েক ডজন ধারারো দাঁত রয়েছে। এই দাঁতের সাহায্যে তারা পাথর খেয়ে থাকে। সেই পাথর তাদের পেটে হজম হয়ে বালিতে পরিণত হয়। মল হিসেবে তারা বালি বের করে।

সাধারণত শিপওয়ার্ম প্রজাতির ঝিনুকগুলো জাহাজের পাটাতনে থাকে এবং জাহাজের কাঠ খেয়ে জীবন যাপন করে। কিন্তু বিশেষ এই ঝিনুকটি শিপওয়ার্ম প্রজাতির অন্যান্য ঝিনুকের চেয়ে একেবারেই আলাদা এবং এটির ফুলকার ভিতরে যে ব্যাক্টরিয়া রয়েছে, অন্যান্য শিপওয়ার্ম ঝিনুকের চেয়ে ভিন্ন। মূলত ফুলকার ভিতরের এই ব্যাক্টরিয়ার সাহায্যে এই ধরনের ঝিনুক পাথর খেয়ে হজম করে এবং পাথর থেকে পুষ্টি গ্রহণ করতে সক্ষম হয়।

হাই তোলার সময় যে কারণে কানে শোনা যায় না

কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন কিংবা খুব বেশি ঘুম আসার পরও জেগে আছেন, এমন পরিস্থিতিতে নিশ্চয়ই বহুবার হাই তুলেছেন। কিন্তু লক্ষ্য করেছেন কী, ঠিক হাই তোলার মুহূর্তে আমরা কিন্তু কোন আওয়জ শুনতে পাই না।

আসলে আমাদের কানের যে অংশ দিয়ে শব্দ বা ধ্বনি প্রবেশ করে, সেটিকে বলে ইয়ার ক্যানাল। এটি কানের ভিতরের ইয়ার ড্রামের সাথে মিলিত হয়েছে। ইয়ার ড্রাম বিশেষ ধরনের টিস্যু দিয়ে তৈরি, আর সেই টিস্যুতেই কম্পনের সৃষ্টি হওয়ার ফলে আমার কানে শুনি। এই কম্পন এক ধরনের নরম হাড়ের মাধ্যমে মস্তিষ্কে শব্দ তরঙ্গ প্রেরণ করে, যার ফলে আমরা ঐ কম্পন থেকে সৃষ্ট ধ্বনিটি উপলব্ধি করতে সক্ষম হই।

এখন সেই নরম হাড়টি আবার এক ধরনের বিশেষ টিউবের সাহায্যে গলার পেছনের অংশের সাথে সংযুক্ত। এই টিউবের কাজ হলো কানের বাইরের বায়ু চাপ আর ভিতরের বায়ু চাপের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা। হাই তোলার সময় মুখের ভিতরে প্রচণ্ড চাপ তৈরি হয়, যে চাপ এই টিস্যু ও নরম হাড়ের পথ পেরিয়ে গিয়ে আঘাত করে আমাদের ইয়ার ড্রামে, যেখানে অনুভূহত কম্পন থেকেই আমরা শব্দ শুনি। এবার হাই তোলার সময় যেহেতু মুখের ভিতরের প্রচণ্ড চাপ ইয়ার ড্রামকে আঘাত করে, তাই ইয়ার ড্রাম ঠিক সেই মুহূর্তে বাইরের শব্দের কম্পনকে ঠিক মতো গ্রহণ করতে পারে না। ফলে সেই মুহূর্তে আমরা কানে শুনি না।

প্রাকৃতিক সানস্ক্রিন ওজোন স্তর!

প্রখর রোদ থেকে বাঁচতে অনেকে সানস্ক্রিন ব্যবহার করেন। সানস্ক্রিন ব্যবহার না করলে আমাদের চামড়া কিছুটা নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু জানেন কি, সূর্যের আলোর ক্ষতিকর প্রভাব থেকে আমাদের অস্তিত্বকে রক্ষা করার জন্য রয়েছে পৃথিবীর নিজস্ব প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা?

প্রখর রোদে সূর্যের আলোতে আমাদের যে অসুবিধা হয়, সেটা মূলত সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির মৃদু প্রভাবের কারণে অনুভূত হয়ে থাকে। কিন্তু সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির প্রায় পুরোটাই ওজোনস্তরে প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়। ওজোন স্তর মূলত আমাদের থেকে ১০ কিলোমিটার উপরে পৃথিবীর স্ট্রাটোস্ফিয়ারে অবস্থিত ওজোন গ্যাসের একটি স্তর বা লেয়ার। ওজোন গ্যাসের অন্যতম উপাদান অক্সিজেন, যা আল্ট্রা ভায়োলেট বা অতিবেগুনি আলো শোষণ করে এবং সেই আলোকে আমাদের নিকট পৌছতে বাধা দেয়। অক্সিজেন গ্যাস এবং অক্সিজেনের আরেকটি রূপ ওজোনস্তরে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান রয়েছে।

ওজোন স্তরে অতিবেগুনি রশ্মি যদি বাধাগ্রস্ত না হতো, তাহলে শুধু মানুষই নয়, বরং বেশির ভাগ প্রাণির অস্তিত্বই সংকটের মুখে পড়তো। অতিবেগুনি রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য দৃশ্যমান আলোর চেয়ে অনেক কম হওয়ায় মানুষ এটি দেখতে পায় না। তবে মৌমাছিসহ আরো কিছু প্রাণি অতিবেগুনি রশ্মি দেখতে পায়। মানুষের চোখে অদৃশ্য এই রশ্মি মানুষের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এর প্রভাবে ত্বকের ক্যান্সার, চোখে ছানি পড়া এবং এ ধরনের আরো অনেক জটিল রোগ হতে পারে।

বাংলাদেশ সংবিধান

চাকরি প্রার্থীদের জন্য উপযোগী করে ক্যারিয়ার পাতাটি সাজানো হয়েছে। যেকোন চাকরি পরীক্ষায় সংবিধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। চাকরিপ্রার্থীদের পুরো সংবিধানের উপর দখল থাকা উচিত। বিশেষত সংবিধানের প্রস্তাবনা, প্রথম তিন ভাগ, তফসিল এবং সংশোধনীসমূহ সম্পর্কে ভালোমত জানা থাকা আবশ্যক। এ সংখ্যায় থাকছে সংবিধানের কিছু খুটিনাটি, প্রস্তাবনা এবং প্রথম ভাগ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা-

সংবিধানের শুরুর কথা

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে ২২ মার্চ ১৯৭২ রাষ্ট্রপতি 'বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ' নামে একটি আদেশ জারি করেন যা পরদিন ২৩ মার্চ গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। এই আদেশের ভিত্তিতে ১৯৭০ সালের জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচনে নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে ১০ই এপ্রিল ১৯৭২ সালে গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে। গণপরিষদের মোট সদস্য ছিলেন ৪০৩ জন। গণপরিষদের সিদ্ধান্তক্রমে ১১ এপ্রিল ১৯৭২ সালে ৩৪ সদস্য বিশিষ্ট সংবিধান রচনা কমিটি গঠন করা হয়। একই বছরের ১২ অক্টোবর সংবিধান রচনা কমিটি গণপরিষদে খসড়া সংবিধান উত্থাপন করে। গণপরিষদে দীর্ঘ আলোচনার পর ৪ নভেম্বর ১৯৭১, ১৮ কার্তিক ১৩৭৯ বঙ্গাব্দে খসড়া সংবিধান গৃহীত হয়। এজন্য ৪ই নভেম্বর সংবিধান দিবস। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ সাল থেকে সংবিধান কার্যকর হয় এবং একই দিনে গণপরিষদ বিলুপ্ত হয়।

সংবিধানের মৌলিক কিছু তথ্য

★ বাংলাদেশের সংবিধানের পূর্ণ নাম- 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান' (অনুচ্ছেদ: ১৫৩ (১)। বাংলাদেশের সাংবিধানিক নাম- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

★ সংবিধানের প্রস্তাবনার উপরে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম' লেখা আছে।

★ বাংলাদেশের সংবিধান লিখিত ও দুষ্পরিবর্তনীয় প্রকৃতির। কারণ, এই সংবিধান সংশোধনের জন্য সংসদ সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের প্রয়োজন হয়।

★ বাংলাদেশের সংবিধান ১৫৩টি অনুচ্ছেদ সংবলিত। যা ১১টি অধ্যায় বা ভাগ এবং ১৩টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এছাড়াও সংবিধানের শুরুতে রয়েছে একটি প্রস্তাবনা এবং শেষে রয়েছে ৭টি তফসিল। এ পর্যন্ত বাংলাদেশের সংবিধান ১৭বার সংশোধন করা হয়েছে।

★ বাংলাদেশের সংবিধানের ভাষা দুটি- বাংলা ও ইংরেজি। ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বাংলা ও ইংরেজির মধ্যে বিরোধ হলে বাংলা ভাষা প্রাধান্য পাবে।

★ ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ সালে জারি হওয়া স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রটি বাংলাদেশের প্রথম অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান। ১১ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান 'বাংলাদেশের অস্থায়ী সংবিধান আদেশ' জারি করেন। যা বাংলাদেশের দ্বিতীয় অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান।

প্রস্তাবনা

প্রস্তাবনা একটি ঘোষণা। এতে সংবিধানের মৌল নীতিমালা, জনগণের অঙ্গিকার, রাষ্ট্রের লক্ষ্য ইত্যাদি উল্লেখ থাকে। বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনায় পাঁচটি অংশ রয়েছে। প্রস্তাবনায় রাষ্ট্র পরিচালনার চারটি মূলনীতি গ্রহণ এবং শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করা হয়েছে। সর্বাবস্থায় সংবিধানের প্রাধান্য অক্ষুন্ন রাখার ঘোষণাও দেওয়া হয়েছে প্রস্তাবনায়।

প্রথম ভাগ: প্রজাতন্ত্র

সংবিধানের প্রথম ভাগে প্রজাতন্ত্রের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। ১ থেকে ৭খ নং অনুচ্ছেদ পর্যন্ত এই ভাগের অন্তর্ভুক্ত। প্রথমভাগের অনুচ্ছেদগুলো হলো-

প্রজাতন্ত্র: ১নং অনুচ্ছেদে বাংলাদেশকে একটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যার নাম 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।'

রাষ্ট্রীয় সীমানা: ২নং অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রীয় সীমানা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চে স্বাধীনতা ঘোষণার অব্যবহিত পূর্বে যেসব এলাকা নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান গঠিত ছিল। এছাড়াও পরবর্তীকালে যেসব এলাকা বাংলাদেশের সীমানাভুক্ত হতে পারে তাও রাষ্ট্রীয় সীমানার অন্তর্ভুক্ত। পূর্ব পাকিস্তানের সকল ভূমি রাষ্ট্রীয় সীমানার অন্তর্ভুক্ত হলেও ১৯৭৪ সালের তৃতীয় সংবিধান সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশ ভারতের কাছে বেরুবাড়ি হস্তান্তর করে।

রাষ্ট্রধর্ম: ২ক নং অনুচ্ছেদে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। একই অনুচ্ছেদে অন্যান্য ধর্মের সমানাধিকারের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

রাষ্ট্রভাষা: সংবিধানের ৩নং অনুচ্ছেদের প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে এককভাবে বাংলাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

জাতীয় সঙ্গীত, পতাকা ও প্রতীক

৪(১) নং অনুচ্ছেদে 'আমার সোনার বাংলা'র প্রথম দশ চরণকে প্রজাতন্ত্রের জাতীয় সঙ্গীত হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, যার রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৪(২) নং অনুচ্ছেদে সবুজক্ষেত্রের উপর স্থাপিত লালবৃত্তকে রাষ্ট্রের জাতীয় পতাকা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। লালবৃত্তের ব্যাসার্ধ হবে মোট দৈর্ঘ্যের এক-পঞ্চমাংশ। ১৯৭২ সালের পতাকা বিধি অনুসারে আয়তকার জাতীয় পতাকার অনুপাত হবে ১০:৬। প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় ১৯৭১ সালের ২রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাবেশে। এজন্য ২রা মার্চ জাতীয় পতাকা দিবস। জাতীয় পতাকার ডিজাইনার কামরুল হাসান। সংবিধানের ৪(৩) অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রজাতন্ত্রের জাতীয় প্রতীক হল উভয় পাশে ধানের শীষবেষ্টিত, পানিতে ভাসমান শাপলা ফুল, তার শীর্ষদেশে পাটগাছের ৩টি পরস্পর সংযুক্ত পাতা এবং তার উভয় পাশে ২টি করে ৪টি তারকা।

জাতির পিতার প্রতিকৃতি: ৪(ক) অনুচ্ছেদের দ্বারা সকল সরকারি ও আধা-সরকারি অফিস, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস ও মিশনসমূহ ইত্যাদিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতি সংরক্ষণ ও প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ২০১১ সালে এ ধারা অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

রাজধানী: ৫(১) নং অনুচ্ছেদের মাধ্যমে ঢাকাকে বাংলাদেশের রাজধানীর স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ১৯৭২ এর সংবিধানে ঢাকা শব্দের ইংরেজি বানান ছিল Dacca. ১৯৮২ সালে Dacca থেকে Dhaka চালু হয়। কিন্তু ১৯৮৮ সালের অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে তা সাংবিধানিক স্বীকৃতি পায়।

নাগরিকত্ব: ৬(২) অনুচ্ছেদ অনুসারে বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালী এবং নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলে পরিচিত হবেন।

সংবিধানের প্রাধান্য: ৭(১) অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। ৭ (২) ধারায় সংবিধানকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন হিসেবে উল্লেখ করা হয় এবং সংবিধানের সাথে অসংগতিপূর্ণ সকল আইন যতটুক অসংগতিপূর্ণ ততটুক বাতিল বলে ঘোষণা করা হয়।

সংবিধান বাতিল, স্থগিতকরণ, ইত্যাদি অপরাধ: ৭ক ধারা অনুযায়ী কোন ব্যক্তি অসাংবিধানিক পন্থায় সংবিধান বা এর কোন অনুচ্ছেদ রদ, রহিত বা বাতিল বা স্থগিত করার অপচেষ্টা করলে তা রাষ্ট্রদ্রোহিতা বলে বিবেচিত হবে। এই ধারা পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়।

মৌলিক বিধানাবলী সংশোধন অযোগ্য: ৭(খ) ধারার মাধ্যমে সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলী সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, রহিতকরণ কিংবা সংশোধনের অযোগ্য করা হয়েছে। সংবিধানের সংশোধন অযোগ্য অংশগুলো হল- প্রস্তাবনা, প্রথম ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, দ্বিতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, নবম-ক ভাগের বিধানাবলী সাপেক্ষে তৃতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ এবং একাদশ ভাগের ১৫০ অনুচ্ছেদসহ অন্যান্য মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহ।

*সংকলনে: **মারুফ হোসাইন***

কবিতা

কুরবানী

কাজী নজরুল ইসলাম

ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যাগ্রহ' শক্তির উদবোধন!
দুর্বল! ভীরু ! চুপ রহো, ওহো খামখা ক্ষুব্ধ মন!
ধ্বনি উঠে রণি দূর বাণীর,-
আজিকার এ খুন কোরবানীর!
দুম্বা-শির রুম্-বাসীর
শহীদের শির সেরা আজি!- রহমান কি রুদ্র নন?
ব্যাস! চুপ খামোশ রোদন!
আজ শোর ওঠে জোর 'খুন দে, জান দে, শির দে বৎস' শোন!
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যাগ্রহ' শক্তির উদবোধন!
...
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যাগ্রহ' শক্তির উদবোধন!
এই দিনই 'মিনা'-ময়দানে
পুত্র-স্নেহের গর্দানে
ছুড়ি হেনে 'খুন ক্ষরিয়ে নে'
রেখেছে আব্বা ইবরাহীম সে আপনা রুদ্র পণ!
ছি ছি! কেঁপোনা ক্ষুদ্র মন!
আজ জল্লাদ নয়, প্রহ্লাদ-সম মোল্লা খুন-বদন!
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যাগ্রহ' শক্তির উদবোধন!
...
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যাগ্রহ' শক্তির উদবোধন!
দ্যাখ্ কেঁপেছে 'আরশ' আসমানে
মন-খুনী কি রে রাশ মানে?
ত্রাস প্রাণে? তবে রাস্তা নে!
প্রলয় বিষাণ 'কিয়ামতে' তবে বাজবে কোন্ বোধন?
সে কি সৃষ্টি-সংশোধন?
ওরে তাথিয়া তাথিয়া নাচে ভৈরব বাজে ডম্বরু শোন্!-
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যাগ্রহ' শক্তির উদবোধন!
...
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যাগ্রহ' শক্তির উদবোধন!
জোর চাই, আর যাচনা নয়,
কোরবানী-দিন আজ না ওই?
কাজ না আজিকে জান্ মাল দিয়ে মুক্তির উদ্রধরণ?
বল্ - "যুঝবো জান ভি পণ!"
ঐ খুনের খুঁটিতে কল্যাণ-কেতু, লক্ষ্য ঐ তোরণ,
আজ আল্লার নামে জান্ কোরবানে ঈদের পূত বোধন।
ওরে হত্যা নয় আজ 'সত্যাগ্রহ' শক্তির উদবোধন!

লাব্বাইক! আল্লাহুম্মা লাব্বাইক!

আবদুল মুকীত চৌধুরী

বিশ্বে প্রাচীনতম মক্কা শহর,
সেখানেই 'বায়তুল্লাহ' 'আল্লাহ্র ঘর',
মর্যাদার শীর্ষে এই 'উম্মুল কুরা'
'জননী' স্বরূপা বিশ্বে বসতিগুলোর।

প্রত্যয়ন বিশ্বস্রষ্টা খোদ আল্লাহ্রঃ
বিশ্ব-ইতিহাসে এ শীর্ষ প্রাচীনতা।
এ তথ্যে 'মাতৃ'রূপ ও 'চারপাশে' তার
বিশ্বজন প্রদক্ষিণে বায়তুল্লাহ্র কথা
এক কেন্দ্রিকতা।

অবতীর্ণ 'সত্য' ও'শান্তি'র কুরআনঃ
পূর্বেকার কিতাবের সত্য প্রত্যয়ন,
যদ্বারা মহানবী মক্কা ও তার
'চারপাশে'র লোক করেন সতর্কীকরণ।

সূরা শূরা সপ্তম আয়াতে কুরআনঃ
অবতীর্ণ তাঁর প্রতি আরবী ভাষায়,
মক্কা ও 'চারপাশে'র সতর্কতায়
যে কুরআন মানুষের জীবন-বিধান।

সকল 'নগর-মাতা' স্বমর্যাদায়,
সকল স্থানের উর্ধ্বে সর্বোচ্চতায়,
আবির্ভাব এখানেই শ্রেষ্ঠতম নবী,
বায়তুল মামুরের কা'বা প্রতিচ্ছবি।

মক্কা বিশ্ব-কেন্দ্র, 'চারপাশ' তার
বিশ্বের দূরতম প্রান্ত 'পাশ' 'চার'।
পুব-পশ্চিম আর উত্তর-দক্ষিণ
গোটাবিশ্ব এ অঙ্গন-'প্রদক্ষিণা'ধীন।

'বায়তুল হারাম' ও 'বায়তুল আতিক'
উম্মাহ্র সংহতি ও ঐক্যের প্রতীক,
আত্মঘাতী হানাহানি-মুক্ত উম্মাহ্র
'ইত্তেবায়' বিজয় প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্র।

লাব্বাইক! আল্লাহুম্মা লাব্বাইক! স্বনন,
নিপীড়িত মুক্তির ফরিয়াদ ক্রন্দন,
ইবরাহীমী ঐতিহ্যের এই কা'বাঘর;
বিশ্বজন এই কেন্দ্রে চির সমস্বর।

লোভের পরিণতি

জান্নাতুল ফেরদৌস মরিয়ম

বাদশাহ হারুনুর রশিদ একদিন নগর ভ্রমণে বেরিয়েছেন। এক অন্ধ ফকীর তার কাছে ভিক্ষা চাইলে তিনি ভিক্ষা দিলেন। ফকীর ভিক্ষা পাওয়ার পর তার কপালে বাদশাহকে সজোরে আঘাত করতে বলল। বাদশাহ আঘাত করতে ইতস্ততঃ করলে ফকীর বলল, কপালে আঘাত না করলে আপনার দান ফিরিয়ে নিন। বাদশাহ অগত্যা ফকীরের কপালে মৃদু আঘাত করলেন। বাদশাহ ভাবলেন, নিশ্চয় এর কোনো বিশেষ রহস্য আছে। তাই তিনি দরবারে এসে ফকীরকে ডেকে পাঠালেন এবং কপালে আঘাত করার কারণ জানতে চাইলেন।

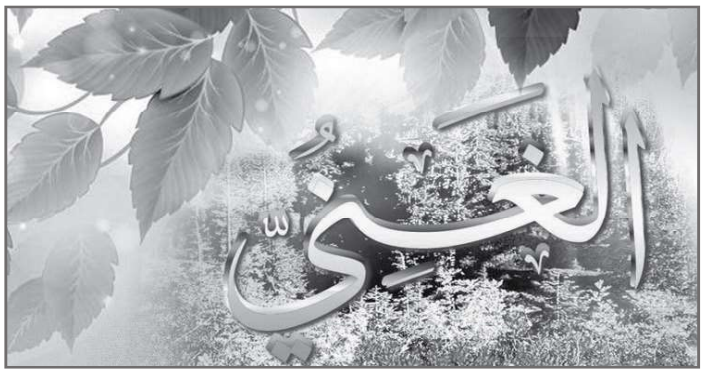

ফকীর তখন তার জীবনের ঘটনা বলতে শুরু করল। বলল, আমি এই বাগদাদ শহরের একজন বড় ব্যবসায়ী ছিলাম। ব্যবসা পরিচালনার জন্য আমার চল্লিশটি উট ছিল। একদিন আমি চল্লিশটি উটে মাল বোঝাই করে দূরের এক শহরে মাল বিক্রি করে ফিরছিলাম। দেখলাম, পথে গাছের ছায়ায় একজন ফকীর বসে আছে। আমিও ঐ গাছের নিচে বসলাম। আমরা দুজনে মিলে খাওয়া-দাওয়া করলাম। ফকীরের সাথে আমার কিছুটা হৃদ্যতা সৃষ্টি হলো। ফকীর বলল, সামনের ঐ পাহাড়ের অভ্যন্তরে প্রচুর গুপ্তধন রয়েছে। আমি ছাড়া আর কোনো ব্যক্তি এর সন্ধান জানে না। ফকীরের সাথে চুক্তি হলো যে, সে বিশটি উটে মাল বোঝাই করবে আর আমি বিশটি উটে মাল বোঝাই করব। অতঃপর আমরা উটগুলো নিয়ে পাহাড়ের কাছে পৌঁছলাম এবং সুড়ঙ্গ পথে উটগুলো প্রবেশ করিয়ে কিছুদূর অগ্রসর হলাম। সেখানে এত সম্পদ স্তূপীকৃত অবস্থায় দেখতে পেলাম যে, বিশটি কেন একশটি উটও তা বহন করে নিয়ে যেতে পারবে না। অতঃপর আমি বিশটি উটে মাল বোঝাই করলাম। ফকীরও বিশটি উটে মাল বোঝাই করল। ফকীর সুড়ঙ্গ থেকে কৌটার মতো কি যেন একটা কুড়িয়ে নিল। পথ চলতে চলতে আমার মনে হতে লাগল, এ ভাগ ঠিক হয়নি। আমি ফকীরকে বললাম, তুমি ফকীর মানুষ, এত সম্পদ দিয়ে কী করবে? আমাকে দশটি উট দিয়ে দাও। ফকীর তৎক্ষণাৎ দশটি উট দিয়ে দিল। একটু পরে আবার আমার মনে হতে লাগল, ফকীরের অর্থের কী প্রয়োজন? পুনরায় তাকে বললাম, তুমি সংসারত্যাগী ফকীর, তোমার অর্থের কী দরকার? অবশিষ্ট দশটি উটও আমাকে দিয়ে দাও। ফকীর মোটেও আপত্তি করল না। আমি চল্লিশটি উট নিয়ে পথ চলতে লাগলাম। কিছুদূর অগ্রসর হয়ে আমার মনে সন্দেহ দেখা দিল। ফকীর এত সহজেই আমাকে সবগুলো উট ফিরিয়ে দিল কেন? আমার মনে হলো, ফকীর যে কৌটাটা কুড়িয়ে পেয়েছে নিশ্চয়ই এর কিছু তাৎপর্য আছে। আমি ঐ কৌটার বিষয় জানতে ফকীরের নিকট ফিরে আসলাম এবং এ বিষয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম। ফকীর বলল, এই কৌটায় এক প্রকার মলম রয়েছে। যা ডান চোখে লাগালে মাটির অভ্যন্তরে কোথায় কি সম্পদ লুকায়িত আছে তা স্পষ্ট দেখা যাবে। আবার বাম চোখে লাগালে সাথে সাথে দুই চোখ অন্ধ হয়ে যাবে। পরীক্ষাস্বরূপ আমি ফকীরকে আমার ডান চোখে মলম লাগিয়ে দিতে বললাম। মলম লাগানোর পর মাটির অভ্যন্তরে লুকায়িত সম্পদ আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম। আমার মনে হলো, বাম চোখে মলম লাগালে ফল হয়তো আরো ভালো হবে। তাই আমি আমার বাম চোখেও মলম লাগাতে বললাম। ফকীর রাযী হচ্ছিল না। কিন্তু কেন যেন আমার জিদ চেপে বসল। আমার পীড়াপীড়িতে ফকীর বাম চোখে মলম লাগিয়ে দিল। সাথে সাথে আমি দুই চোখের দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেললাম। আমি অন্ধ হয়ে পথে বসে রইলাম। এদিকে ফকীর আমার সব উট নিয়ে চলে গেল। এই বাগদাদেরই কতিপয় বণিক ঐ পথে ফিরছিল। আমার এই অবস্থার কারণ জানতে পেরে তারা আমাকে শহরে পৌঁছে দিল। এ ঘটনার পর আমার জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা চলে এলো। এই পরিণতির জন্য নিজকে ধিক্কার দিতে লাগলাম। কৃতকর্মের শাস্তি হিসেবে কপালে আঘাত গ্রহণ সাব্যস্ত করলাম। আঘাত না করলে কারো দান আমি গ্রহণ না করতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হলাম।

‘মা’ আমার

আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী

কখনো কাঁদো, আবার কখনো হাসো। মাঝেমধ্যে যে দু’চারটি কথা বলো তার অর্থ আমরা বুঝি না। জানি না কোন সে নিদারুণ আগুন তোমার হৃদয় কন্দরে দিবানিশি জ্বলছে। তোমাকে এমন করে রাখার পিছনে রহস্যটা কী তা তিনিই ভালো জানেন যিনি বনী আদমকে দু’দিনের এ কান্না-হাসির হাটে পাঠিয়েছেন।

মা! যখন আমি বালক ছিলাম; সন্ধ্যাবেলা ভাই-বোনদের নিয়ে তোমাকে ঘিরে গোল হয়ে বসতাম। তুমি মধুর কণ্ঠে গুলিস্তা, বুস্তা, দেওয়ানে হাফিয, পন্দনামার কবিতাগুলো আবৃত্তি করে শুনাতে। পয়গম্বরগণের কাহিনি, পীর-আউলিয়ার কাহিনি শুনার জন্য আমরা তোমার কাছে ঘেঁষে বসতে প্রতিযোগিতা করতাম। এখন তুমি মাটির বিছানাকে পছন্দ করো। যে সুন্দর হাত দুখানা তুলে তুমি আমাদের নিয়ে আল্লাহর কাছে মুনাজাত করতে; আজ দু’খানা হাত শুকিয়ে পল্লবহীন শুষ্কবৃক্ষ শাখার মতো হয়ে গেছে। তোমার চেহারাখানা দেখলে মনে হয় তুমি সব হারিয়ে কোনো অমূল্য রত্ন পেয়েছ।

মা! আমি যেখানে যত অসহায় মানুষ দেখি তাদের ব্যথা মলিন চেহারায় তোমারই প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই। তাদের অশ্রুভেজা কাতর নয়নের দিকে যখনই তাকাই তখনই মনে হয় তুমি আমার দিকে চেয়ে আছ। জীর্ণশীর্ণ রিক্ত হস্ত মানুষগুলোর শুকিয়ে যাওয়া হাতগুলোকে তোমার হাত মনে করে তাদের দুআ লওয়ার চেষ্টা করি।

কয়েক যুগের নীরব সাক্ষী বিরাট কুলগাছটির তলে টিনের চালা বিশিষ্ট হুজরায় (ছোট কামরায়) তিনি প্রায় ৪০ বছর নির্জনবাসে ছিলেন।

মরণ শয্যায় শায়িত অবস্থায় তিনি আমাদের কাছে ডাকলেন। নিষ্পলক দৃষ্টিতে কতক্ষণ তাকিয়ে রইলেন আমাদের পানে। মনে হলো অনেক কিছু বলার ছিল কিন্তু বলা হলো না। নয়নভরা জল, অধর নির্বাক, শ্বাস-প্রশ্বাস আল্লাহ তাআলার যিকরে মশগুল।

জীবদ্দশায় তিনি মাঝেমধ্যে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসলে আমাকে কাছে ডেকে নিয়ে আমার লিখিত গল্প শুনতেন। আদর করে বলতেন বাবা, তুমি শুধু দুঃখী মানুষ সম্পর্কে গল্প না লিখে আল্লাহর ওয়াস্তে তাদের খিদমত করো। আল্লাহ তাআলার বন্দেগী যদি লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে হয় তবে কোনো সাওয়াব পাওয়া যায় না। ফুল যেমন বিনিময়ের আশা না করে তার সুগন্ধ বিলিয়ে দেয় তুমিও অসহায় বনী আদমের জন্য তেমন হও।

দিন যায় ক্ষণ যায়, এমন একদিন আসল যেদিন আমার পিতা আমার মুরশিদের লাশ মুবারক বালাই হাওরে জানাযার জন্য রাখা হলো। সেদিন বিজন পর্বত হতে অনেক দরবেশও এসেছিল তাদের মুরশিদকে এক নজর দেখার জন্য। ওরা চলে গেল, কোনো দিন তাঁরা আর আমাদের আসরে আসবে না।

জানাযায় উপস্থিত কয়েক লক্ষ লোক সেদিন কেঁদেছিল, কেঁদেছিল বালাই হাওর। সত্যিই সেদিন কান পেতে বালাই হাওরের কান্না শ্রবণ করেছিলাম।

আমার মায়ের জানাযায় বালাই হাওরে সমবেত হয়েছিল লক্ষাধিক লোক। আকুল কাঁদন কেঁদেছিল সেদিন আমার প্রাণ প্রিয় শত শত ইয়াতীম শিশু ও বালক। এমন সম্মিলিত আকুল কাঁদন জীবনে কখনও শুনিনি। তারা হৃদয়ের ভাষায় বলছে দাদী আমাদের ভালোবাসতেন, আমাদের জন্য দুআ করতেন।

সত্যিই সেদিন কান পেতে শুনছিলাম মানুষের কান্না আর বালাই হাওরের কান্না।

অতীত দিনের অশ্রুভেজা স্মৃতি যেন অক্ষয় অমর হয়ে থাকে আমি অধমের হৃদয়ে। আমার মা-বাবার অন্তিম ইচ্ছা পূর্ণ হোক। তাদের ইচ্ছা ছিল আমি যেন জন্মভূমির দূর্গম পথ অতিক্রম করে অসহায় মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরি।

মাওলানা রূমী (র.) এর মসনবী থেকে দু’ছত্র কবিতা উদ্ধৃত করলাম।

شرح گل بگذار ازبهر ے خدا - شرح بلبل گو کہ شد از گل خدا

-আল্লাহর ওয়াস্তে ফুলের কাহিনি বর্ণনা বন্ধ করো। যে বুলবুল ফুল হতে বিচ্ছিন্ন তার অবস্থা বর্ণনা করো।

[আল্লামা ইমাদ উদ্দিন চৌধুরী ফুলতলী রচিত কালজয়ী ‘বালাই হাওরের কান্না’ গ্রন্থের ভূমিকা থেকে নেয়া।]

মায়ের স্মৃতি

আব্দুল হামিদ

২০১১ সালের কথা। জুলাই মাস। মাঠ, ঘাট রোদ্রে চৌচির। জমিনে কৃষকের ঢল, ধান রোপণ হচ্ছে। গ্রামের লোকেরা ব্যস্ত সময় পার করছেন। প্রথমবারের মতো আমি বাড়ি ছেড়ে দূরে কোথাও যাচ্ছি। পরিবারের সবার মন ভীষণ খারাপ। কেউ কেউ আড়ালে চোখের পানি ফেলছেন। মা আমার গায়ে কাপড় পরিয়ে দিচ্ছিলেন। মায়ের চোখ বেয়ে টপ টপ করে পানি ঝরছিল।

আমার স্পষ্ট মনে আছে, মা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলছিলেন; বাবারে, আমরা গরিব মানুষ। অভাবের সংসার। বাড়িতে থাকলে তোমার কখনো পড়াশোনা হবে না। তোমাদের বাবার মতো করে পরের জমিনে হাল চাষ করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না। আমি আমার ছেলেদের এমন কষ্ট দেখতে চাই না। তুমি আমার উপর রাগ করো না বাবা। তোমাকে ইচ্ছে করে দূরে ঠেলে দিচ্ছি না। তোমার ভবিষ্যৎ চিন্তা করেই তোমাকে দূরে পাঠানো হচ্ছে। তোমার জন্য মায়ের দুআ আছে। জগতের সব বিজয় তোমার হাতের মুঠোয় চলে আসুক। সে দুআ সর্বদা আল্লাহর দরবারে।

পৃথিবীতে সন্তানের জন্য মায়ের চোখের পানি সহ্য করা অসম্ভব।

মায়ের চোখের পানির কাছে পৃথিবীর সব কিছুই তুচ্ছ। সেদিনের মায়ের চোখের পানি আর আমাকে দেওয়া দুআই ছিল পরম শক্তি। যে শক্তি আমাকে এখনও প্রেরণা ও শক্তি দিয়ে থাকে। সন্তানের জীবন পরিপূর্ণ কিংবা সুন্দর হওয়ার পিছনে মা-বাবার দুআ অন্যতম।

মা যখন আমাকে বিদায় দিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। তিন রাস্তার মোড় থেকেই না-কি শব্দ করে কান্না শুরু করেছিলেন। মায়ের সেই বিদায়ের স্মৃতি আজও চোখে ভাসে। যে সন্তান ছাড়া একবেলা একা খাবার খাওয়া হয়নি! সেই সন্তানের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে নিজের বুকের কষ্ট চাপা দিয়ে দিব্বি হাসি মুখে চলতে পারা ব্যক্তিটাই মা।

এক জীবনে সন্তানের জন্য মায়েরা কতবার যে নিজেকে বিসর্জন দিতে পারে, ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে এসব অনুমান করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। নিজের ইচ্ছে, আকাঙ্ক্ষা চাপা দিয়ে সন্তানের জন্য নিজের সুখকে বিসর্জন দেওয়া। পৃথিবীর সকল মায়ের প্রতি সশ্রদ্ধ সালাম।

মায়ের সেই প্রতিধ্বনি আজও কাঁদায়

ইয়াহইয়া আহমদ চৌধুরী

পৃথিবীর সব মায়েরাই নিষ্কলুষ ভালোবাসায় ভরপুর থাকেন। আমার হারানো মা জননীও এর ব্যতিক্রম নয়। মা-বাবার কনিষ্ঠ সন্তান আমি। দেশের যে প্রান্তেই থাকিনা কেন রাতে এসে মাকে এসে 'মাই আমি আইছি' বলে বিছানায় যেতে হত। শেষ বয়সে মা জননী বার্ধক্যজনিত রোগে আক্রান্ত। কিন্তু প্রতিদিনের 'মা আইছি' এই রুটিনের ব্যতিক্রম হত না। বিভিন্ন কাজকর্মে ব্যস্ততার কারণে প্রায়ই ফিরতে অনেক রাত হয়ে যেত। যত রাতই হোক জানান না দিয়ে ঘুমালে সকালে মায়ের বকুনি খেতেই হত। মায়ের কারণে রাতে কোথাও থাকতাম না। সমস্যা বাঁধলো তখন, যখন মা শেষ বয়সে অসুস্থ হয়ে যান। রাতে এসে মাকে ডাকলে ঘুম ভেঙ্গে যাবে, হয়তো সারা রাত আর ঘুম হবে না মা জননীর, এরকমটা ভেবে একদিন রাতে ফিরে এসে 'মাই আমি আইছি' না বলেই চুপি চুপি দরজা খোলে শুয়ে পড়ি। মা কিন্তু আমার আসার নিশ্চয়তা না পেয়ে সারা রাত জেগে আছেন। ঘুম নেই মায়ের চোখে। আমার বাছাধন এখনো আসেনি কেন? রাত প্রায় চারটা। হঠাৎ দরজার পাশে নড়চড় শব্দ শোনতে পাই।

কে?

মা বললেন, নারে আমি।

দরজা খোলে দেখি মা দাঁড়িয়ে। বললাল মা তুমি এতো রাত এখনও জেগে?

-নারে বাবা, তুমি এসে আমাকে ডাকো নাই তাই সারারাত ঘুম হয়নি। এখন এসে তোমার জুতা চেক করছি যদি তুমি আসো তাহলে তো জুতা বাহিরে থাকবে। আর ডাক দিলে যদি ঘুম ভেঙ্গে যায়, হয়তো অনেক রাত করে ফিরেছ।

আমার দুচোখ বেয়ে অশ্রু বইতে লাগলো। বললাম, মা! আমি ডাকি নাই আপনার ঘুম ভেঙ্গে যাবে বলে। আমাকে ক্ষমা করো মা। আর কোনদিন আপনাকে ডাক না দিয়ে ঘুমাব না। সেই রাতের অনুভূতি আমি কখনো ভুলতে পারব না। আলহামদুলিল্লাহ, সেই থেকে আর কোনদিন 'মাই আমি আইছি' না বলে ঘুমাইনি।

মা আমার প্রথম শিক্ষক

মুহাম্মদ নুর হোসেন

পরিবারের ছোট হওয়ায় আমার শৈশবকাল দীর্ঘ হয়েছিল। মায়ের কোলজুড়ে তাই উল্লেখযোগ্য সময় আমার কেটেছে। স্নেহ-মমতায় আমাকে আগলে রেখেছেন সর্বক্ষণ। আমার মুখে বুলি ফোটাতে তিনি প্রথম শিক্ষক। আমার আধো আধো কথা বলা যাকে দুনিয়ার সবচেয়ে সুখীজনের অনুভূতি যুগিয়েছে। পরম যতনে আমাকে প্রাথমিক শিক্ষা দিয়েছেন, স্নেহের পরশে। কচিহাতে স্লেট-চক-বই হাতে মাদরাসা পানে ছুটে চলা এই আমাকে দেখে মা গর্বে হেসেছেন আনমনে। পরীক্ষায় পাশ করলে মায়ের আনন্দের জুড়ি ছিল না। খুশিতে সবাইকে বলে বেড়াতেন সন্তানের সফলতার খবর। আর্থিক টানাপোড়েনের সংসার ছিল আমাদের। আর্থিক অসচ্ছলতা আমাকে ছুঁতে পারেনি মায়ের স্নেহের কারণে। পড়ালেখা শুরুর প্রথম দিকটায়ও বই-খাতা কিংবা মাদরাসার ইউনিফর্ম কোনোটাতেই কমতি ছিল না। বাবার মাধ্যমে তা আদায় করায় মা ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তিলে তিলে জমানো নিজের ছোট অঙ্কের অথচ মূল্যবান টাকার এ অংশটি প্রায় পুরোটাই আমার পিছনে ব্যয় করেছেন কোনো লাভের আশা ছাড়াই। আমার মুখে হাসি ফোটানো যার সর্বাধিক আনন্দের উপলক্ষ্য। রোগ-শোকের ছোঁয়া লাগতেই ডাক্তার দেখানোর জন্য ছটফটানি সেতো এখনো দেখি।

এই যে এখন এক-আধটু জীবনের তাগিদে বাড়ির বাইরে থাকি, ফোন করতে ২/১ দিন দেরি হলেই মায়ের টেনশন বেড়ে যায়।

আমার অনুভূতির পুরোটাজুড়ে তাই মায়েরই বিচরণ, যেভাবে আমার জন্মের পর থেকে তাঁর চিন্তা-চেতনায়, ধ্যান-জ্ঞানে জীবনাচারে প্রতিনিয়ত খুঁজে ফিরেছেন আমাকে সুখী করার, খুশি রাখার নিমিত্তে। আল্লাহ মায়ের ছায়াকে আমার মাথার উপর দীর্ঘায়িত করুন। মাকে আমার জন্যে নিআমত হিসেবে বহুদিন বাঁচিয়ে রাখুন। (আমীন)

ঘোষণা

বন্ধুরা!
অনুভূতি বিভাগে আগস্ট সংখ্যার জন্য **'মক্তবের স্মৃতি'** নিয়ে তোমরা অনুর্ধ্ব ২০০ শব্দে স্মৃতিচারণ লিখে পাঠিয়ে দাও ঝটপট। বাছাইকৃত লেখাগুলো আগামী সংখ্যায় ছাপা হবে।

গড়মিল
পিয়ার মাহমুদ

যে আমাকে একদিন
কাছে ডেকে বলেছিলো
আমি তোমায় ভালোবাসি
সে-ই আজ ঘৃণা করে
দূরে ঠেলে
বলে যায়
তুই আমার আস্তসর্বনাশী।

যে আমাকে ঘৃণা করে
বলেছিলো তুই আমার
কাছে আসবে না আর
সে-ই আজ কাছে এসে
বলে যায়
তোকে আজ খুব দরকার।

ভালোলাগা ঘৃণা করা
স্থায়ী কিছু নয়
চলাফেরা, কথা বলা
ভেবে যেন হয়।

নূরুন আলা নূর
লিমান হোসাইন

কে আসলেন ধরার বুকে
শান্তির বার্তা নিয়ে
কে করলেন বিশ্ব বিজয়
প্রীতির ছোঁয়া দিয়ে।

কে করলেন ধরা হতে
সকল বাতিল দূর
কে জ্বালালেন আলোর মশাল
কেটে আঁধার ঘোর।

কার তাশরীফে শুষ্ক-যমীন
ফসল বিহীন মরু
এক নিমেষে জাগলো তাতে
সতেজ সবুজ তরু।

কে ছাড়লেন হকের তরে
নিজের মাতৃ সদন
কে করলেন দ্বীনের স্বার্থে
রক্তে রাঙ্গা বদন।

যার মুখে বাঁজতো শুধু
সাম্য-প্রীতির সুর
তিনি যে মোর প্রিয়নবী
নূরুন আলা নূর।

আমাদের বড় ছাহেব
মু. ছাদিকুর রহমান শিবলী

আমাদের বড় ছাহেব
আল্লাহর ওলি
যার মুখে সদা শুনি
কুরআনের বুলি।

এতিমের প্রিয়জন
গরিবের বন্ধু
আমাদের বড় ছাহেব
মায়ার সিন্ধু।

ফুলতলী বাগানে
আছে যত ফুল
আমাদের বড় ছাহেব
সকলের মূল।

গরিবের জন্য
কাঁদে যার মন
আমাদের বড় ছাহেব
অমূল্য ধন।

হাদীসের ভান্ডার
তাসাউফের খনি
আমাদের বড় ছাহেব
সবচেয়ে মানি।

বৃদ্ধাশ্রম
অমিত আল হাসান

হাজার ব্যথা সহ্য করে
সংসার চালান যিনি
কোটি মমতায় আমাদেরে
আগলে রাখেন তিনি।

নিঃস্বার্থ ভালোবাসার
দাবি রাখেন যিনি
সবচেয়ে বেশি অবহেলিত
বৃদ্ধাশ্রমে তিনি।

সংসার সুখী হয়
যে মানুষটার গুণে
শেষ জীবনে সে মানুষটির
ঠিকানা বৃদ্ধাশ্রমে!

সুশীল সমাজের কাছে
প্রশ্ন রেখে যাই
সবচেয়ে সেরা মানুষ কেন
বৃদ্ধাশ্রমে ভাই?

সবুজের ছবি
সাইদুল সানি

সবুজের ছবি দেখবে মনমাঝি
অপেক্ষায় অধীর
ভাঙ্গবে আলোয় আধাঁর ঘেরা
জং ধরা প্রাচীর।

কোন সে তরী দিবে পাড়ি
মুমিনকূলের নীড়
ধন্য হতে তরীর ঘাটে
বুলবুলিদের ভিড়।

এমন জমিন,বাতাসে যার
জান্নাতি ঘ্রাণ
উদাসী মন খুঁজছে যে তার
মদীনাওয়ালার সোপান।

ভাঙ্গা তরী গড়ছে মাঝি
টানছে পাল ছেড়া রশি
নিশানা তার মদীনার মাটি
তুলতে আবার শশী।

সব কষ্ট ঘোচাতে মাঝি
পথ ধরলো মদীনার
আশা তার মিলবে দেখা
সায়্যিদুল আবরার।

উজালা হবে দু'জাহান
দীদারে রাসূলুল্লাহর
জান্নাত বলবে হেসে আহলান সাহলান
হে গোলাম মোস্তফার।

বলতো দেখি?

এ সংখ্যার প্রশ্ন

১. ইবনে বতুতার মাধ্যমে শাহজালাল (র.) এর আলখাল্লাটি সর্বশেষ কোন বুযুর্গের কাছে পৌঁছেছিল?

২. মসনবী শরীফের রচয়িতা কে?

৩. কোথায় দেশের ২৮তম গ্যাসক্ষেত্রের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে?

৪. ইসরায়েল রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন হয় কবে?

৫. আন্দালিব অর্থ কী?

গত সংখ্যার উত্তর

১. ২৩ জুন, ১৭৫৭

২. হাফিয ইবনে হাজার আসকালানী

৩. ইয়াকুব (আ.)

৪. তুর্কি/উসমানী

৫. ১২১৫ হি. ১৮ মহররম, ১৮০০ খ্রি. ১২ জুন

যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে [প্রথম তিনজন পুরস্কৃত]

রাহীন আহমদ সালেহ, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # তাহিয়াত মাহবুবা, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # মো. মেহদি হাসান শাফি, মল্লিকপুর ডাক্তার গোলাম মস্তফা হাফিযিয়া মাদরাসা, ছাতক, সুনামগঞ্জ # রোমান আহমদ, বরমচাল উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, বরমচাল, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # তায়্যিবা আক্তার চাঁদনী, ক্লাসিক স্কুল এন্ড কলেজ, উপশহর, সিলেট # মুহাম্মদ খয়রুল ইসলাম, বাদে ভুকশিমইল মোহাম্মদিয়া দাখিল মাদরাসা, ভুকশিমইল, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # জান্নাতুল ফেরদৌস মরিয়ম, শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ, সোবহানীঘাট, সিলেট # ইছমা আক্তার, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ লতিফিয়া দাখিল মাদরাসা, লতিফনগর আবাসিক প্রকল্প, মিরের চক, শাহপরাণ, সিলেট # মো. আব্দুস সামাদ, বাদে ভুকশিমইল, ভুকশিমইল, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # বদরুল ইসলাম, নোয়াগাঁও, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট # মো. কামরুল হাসান, বারহাল হাটুবিল গাউছিয়া দাখিল মাদরাসা, বারহাল, জকিগঞ্জ, সিলেট # লায়েক আহমদ, কামারগাঁও, সেওতরপাড়া, ছাতক, সুনামগঞ্জ # মুহাম্মদ আল আমিন, সৎপুর দারুল হাদীস কামিল মাদরাসা, বিশ্বনাথ, সিলেট # মো. আজিজুর রহমান, মৌলভীবাজার টাউন কামিল মাদরাসা, মৌলভীবাজার # মোছা. মাছুমা বেগম, ইলামের গাঁও, করিমগঞ্জ, সদর, সিলেট # হাবিবুর রহমান বাবলু, মল্লিকপুর, ছাতক, সুনামগঞ্জ # মো. জাবেদুর রহমান জাবেদ, মল্লিকপুর, ছাতক, সুনামগঞ্জ # মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল গুফরান, মল্লিকপুর, ছাতক, সুনামগঞ্জ # মো. আবিদুর রহমান দিলু, মল্লিকপুর, ছাতক, সুনামগঞ্জ # মোছা. নাজমিন বেগম, মল্লিকপুর, ছাতক, সুনামগঞ্জ # মোছা. লাইলী বেগম, মল্লিকপুর, ছাতক, সুনামগঞ্জ # খাদিজা আক্তার লিজা, মল্লিকপুর ডাক্তার গোলাম মস্তফা হাফিযিয়া মাদরাসা, ছাতক, সুনামগঞ্জ # মোছা. শামিমা বেগম সুমা, ইলামের গাঁও, করিমগঞ্জ, সদর, সিলেট # জুনায়েদ আহমদ জিসান, আমবাড়ি (ছটিবহর), ছাতক, কোম্পানীগঞ্জ, সিলেট # মো. ফখরুল ইসলাম, ইলামের গাঁও, করিমগঞ্জ, সদর, সিলেট।

আন্দালিব ভাই সমীপে...

প্রিয় আন্দালিব ভাই! আমি একটি দাবি নিয়ে আজ তোমাকে লিখতে বসলাম। আমার দাবিটি হলো, আমাদের যদি প্রতি সংখ্যায় তার পরবর্তী সংখ্যার লেখার জন্য একটি নির্দিষ্ট বিষয় নির্ধারণ করে দেওয়া হতো তাহলে ভালো হত। আর প্রতি মাসে যদি একটি নির্দিষ্ট বিষয় এর উপর প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হত তাহলে কেমন হত?

মোস্তাফিজুর রহমান
জায়ফরনগর, জুড়ী, মৌলভীবাজার

-আন্দালিব ভাই: তোমার পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ। তুমি হয়তো লক্ষ্য করেছ আমরা কিন্তু অলরেডি অনুভূতি নামে একটি বিভাগ চালু করেছি। যেখানে একটি নির্দিষ্ট বিষয় উল্লেখ থাকবে। আশা করি তোমার দাবিটি আমরা পূরণ করতে পেরেছি। তোমার দ্বিতীয় বিষয়টিও আমাদের মাথায় থাকবে ইনশাআল্লাহ।

প্রিয় আন্দালিব ভাই! গত সংখ্যাটি খুবই মজার ছিল। গল্পগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমাদের রাহবার বড় ছাহেব কিবলাহর লেখা পড়ে খুব খুশি হয়েছি। বড় ছাহেবের লেখা যেন সবসময় পাই সেই দাবি রইলো। মায়ের মমতা ও ইনসাফ পড়েও ভীষণ ভালো লেগেছে। পরওয়ানা সম্পাদককে ধন্যবাদ বড় ছাহেবের লেখা উপহার দেওয়ার জন্য। সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য শুভকামনা।

সামিয়া আক্তার
জালালাবাদ কলেজ, সিলেট

-আন্দালিব ভাই: আমাদের রাহবার বড় ছাহেব কিবলাহর লিখা পড়লে যে কারো মনে দাগ কেটে যায়। তুমি খুশি হয়েছো জেনে আমরাও খুশি হলাম। আমরা তোমার দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বড় ছাহেবের ভিন্ন ভিন্ন লেখা উপহার দেওয়ার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। তোমার জন্যও রইল অনেক অনেক শুভকামনা।

প্রিয় আন্দালিব ভাই! আশা করি ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমিও ভালো আছি। গতমাসে আমাদের এলাকায় দেখলাম এক বড় ভাই একটি ম্যাগাজিন বিতরণ করছেন। পত্রিকাটি দেখার কথা বললে তিনি আমার হাতে এককপি দিলেন। কভার পেইজে চোখ পড়তেই দেখি ছোট বেলার সেই স্বপ্নের মাসিক পরওয়ানা। আমার কাছে ঈদের খুশির মতো অনুভূত হলো। আবারও পরওয়ানা পড়ার সুযোগ করে দেওয়ায় সম্মানিত সম্পাদক ও পরওয়ানা পরিবারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বুরহান উদ্দিন
শিমুলকান্দি, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ

-আন্দালিব ভাই: স্বপ্নের ম্যাগাজিন পেয়ে তোমার আনন্দ শুনে আমাদেরকেও আনন্দিত করলে। তোমার প্রিয় বড় ভাইয়াকে ধন্যবাদ, তোমার হাতে পরওয়ানা পৌঁছে দেওয়ার জন্য। তোমার এলাকার সকল বন্ধুদের পরওয়ানার গ্রাহক করে নিবে। আবাবীল ফৌজের সদস্য হতে উদ্বুদ্ধ করবে। তোমার জন্য রইল শুভকামনা।

প্রিয় আন্দালিব ভাই! আশা করি ভালো আছেন। আমি কিন্তু একটুও ভালো নেই। ঘরে বসে থাকতে ভীষণ খারাপ লাগে। সময় যেন কাটেই না। আমাদের স্কুল কী খুলবে না? বলতো কী করি এখন আমরা?

সাব্বির আহমদ
ক্লাসিক স্কুল এন্ড কলেজ, শাহজালাল উপশহর, সিলেট

-আন্দালিব ভাই: আমি ভালো আছি। তুমি খুব অস্বস্তিতে আছো তা বুঝতে পারছি। কিন্তু কী আর করা বলতো? বৈশ্বিক এ সংকট মেনে নিতেই তো হবে তাই না? আমরা আল্লাহর কাছে দুআ করতে পারি, আল্লাহ যেন আমাদেরকে এ কঠিন সংকট নিরসন করে দেন। আর তোমার এ অবসর সময় তুমি পাঠ্যসূচির পাশাপাশি বিভিন্ন জ্ঞানমূলক বই পড়তে পারো। পরওয়ানাকেও তোমার অবসর সময়ের বন্ধু বানিয়ে নিতে পারো। পড়াশোনা ও জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে তোমার এই সময়টাকে একটি কার্যকরী সময় হিসেবে তৈরি করে নাও।

আসসালামু আলাইকুম, প্রিয় আন্দালিব ভাই! আশা করি ভালো আছেন। আমি যখন পরওয়ানার আবাবীল ফৌজের আন্দালিব ভাই শব্দটা পড়ি তখন আমার মনে প্রশ্ন জাগে 'আন্দালিব' মানে কী? আপনার উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম।

মো. নাছির উদ্দিন তালহা
হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা
সোবহানীঘাট, সিলেট

-আন্দালিব ভাই: তোমার কৌতুহলী প্রশ্নের জন্য ধন্যবাদ। আন্দালিব শব্দের উৎসমূল আরবী। আন্দালিব এর ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো, ঘরময়ঃরহমধষব বাংলায় যার অর্থ বুলবুলি পাখি। মূলত আন্দালিব বলতে মিষ্টি কণ্ঠের অধিকারী ছোট্ট পাখিকে বুঝানো হয়।

সদস্য কুপন

প্রিয় আন্দালিব ভাই, আমি 'আবাবীল ফৌজ' এর সদস্য হতে চাই। আমার বয়স ১৬ বছরের বেশি নয়। আমি ফৌজের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে নিজেকে সচেষ্ট রাখবো।

নাম: ----------

পিতা/অভিভাবক: ----------

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: ---------- শ্রেণি: ----------

গ্রাম: ---------- ডাক: ----------

থানা: ---------- জেলা: ----------

কুপনটি পূরণ করে ডাকযোগে নিচের ঠিকানায় অথবা ছবি তুলে ই-মেইলে পাঠিয়ে দাও।

আন্দালিব ভাই
পরিচালক, আবাবীল ফৌজ
মাসিক পরওয়ানা
বি.এন টাওয়ার, ২৮/১ বি, দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
সিলেট অফিস: পরওয়ানা ভবন ৭৪, শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ, সোবহানীঘাট সিলেট-৩১০০
Mobile: 01799 629090, E-mail: parwanaafbd@gmail.com

আন্দালিব ভাইয়ের চিঠি

ওরে হত্যা নয় আজ সত্যাগ্রহ
শক্তির উদ্বোধন
দুর্বল! ভীরু! চুপ রহো, ওহে
খামখা ক্ষুব্ধ মন।
-কাজী নজরুল ইসলাম

মহান ত্যাগের বার্তা নিয়ে সমাগত পবিত্র ঈদুল আদহা। কিশোর ইসমাঈল (আ.) আল্লাহর ভালোবাসায় যে নযরানা পেশ করেছিলেন তা মুসলিম জাতিকে এখনো প্রেরণা দিয়ে যায়। তার এ মহান ত্যাগের স্মৃতিকে অম্লান রাখতে প্রতি বছর পশু কুরবানীর মধ্য দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে বিশ্ব মুসলিম উদযাপন করেন পবিত্র ঈদুল আদহা। পাশাপাশি মুসলিম উম্মাহর মহাসম্মিলন অনুষ্ঠিত হয় পবিত্র হজ্জ আদায়ের মাধ্যমে। লাব্বাইক, আল্লাহুম্মা লাব্বাইক আওয়াজে প্রকম্পিত হয় পবিত্র কাবা চত্বর। মুমিন, হৃদয়ের আঁকুতি প্রকাশ করতে হাযির হন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর রাওদা মুবারকে। সালাত ও সালাম প্রদানের মাধ্যমে সিক্ত হয় আশিকে রাসূলের অন্তর। ঈদ ও পবিত্র হজ্জের সমন্বিত বরকতময় এ উৎসবটি। একদিকে ত্যাগের মহিমা অন্যদিকে আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়ার আনন্দ।

প্রিয় বন্ধুরা! এই আনন্দে কুরবানীর গোশত থেকে যেন বঞ্চিত না হয় তোমাদের কোনো গরিব প্রতিবেশী। তোমাদের কুরবানীর খুশিতে তাদেরকেও অংশিদার করার মধ্য দিয়ে পূর্ণ করবে ঈদুল আদহা।

এ মাসের শেষের দিকে সিলেটের সুলতান হযরত শাহজালাল ইয়ামানী (র.) এর ওফাত দিবস। শাহজালাল (র.) গোড়া হিন্দু রাজা গৌড় গোবিন্দকে পরাজিত করে ইসলামের আলোয় আলোকিত করেছিলেন এ পুণ্যভূমি। তার সঙ্গী-সাথিরাও দ্বীন প্রচারে রেখে গেছেন অসামান্য নযীর। আউলিয়ায়ে কিরামের আদর্শে গড়ে উঠুক তোমাদের জীবন।

প্রিয় বন্ধুরা! আবাবীল ফৌজে তোমাদের সানুগ্রহ অংশগ্রহণ সত্যিই খুশি হওয়ার মতো। তোমাদের লিখা অনেক ছড়া, কবিতা আমাদের কাছে পৌঁছেছে। পাশাপাশি বলতো দেখি, শব্দকল্প ও বর্ণকল্পেও তোমাদের অংশগ্রহণ প্রশংসার দাবিদার।

এ সংখ্যার বিশেষ আয়োজন 'মা' নিয়ে অভিব্যক্তি। এ বিভাগে তোমরা অনেকেই লিখেছো। স্থান সংকুলান বিবেচনায় সবার লেখা ছাপতে পারিনি। তাই মন খারাপ করা যাবে না কিন্তু। লিখে যাও নিয়মিত। হঠাৎ দেখবে তোমার লিখাও ছাপা হয়ে গেছে। আগামী সংখ্যার অভিব্যক্তি থাকবে 'আমার স্মৃতিতে মক্তব' নিয়ে। তোমার সুন্দর স্মৃতিময় লেখাটি পাঠিয়ে দাও সময়ের মধ্যেই। তোমাদের জন্য রইলো শুভকামনা। সকলের সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনায় এখানেই ইতি টানছি।

ইতি
তোমাদেরই আন্দালিব ভাই

শব্দকল্প

১		■	■	২	
	■	৩	■		■
৪	৫		■	৬	
■	৭		৮		■
৯		■		■	১০
১১		■		■	১২

সূত্র : পাশাপাশি

১। বিত্তবান মুসলিমের উপর পালনীয় ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের একটি ২। একটি গ্রীষ্মকালীন দেশীয় ফল ৪। অবশ্য পালনীয় বিধান ৬। ক্রেতাকে অতিরিক্ত যা দেওয়া হয়, উপরি ৭। আরবী ভাষার স্বরচিহ্ন ৯। ইতালির রাজধানী ১১। অতীত, বিগত ১২। জনপ্রিয় পানীয়

সূত্র : উপর-নীচ

১। বর্ণ, অক্ষর ২। হজ্জব্রত পালনে মক্কার অদূরে অবস্থিত জমায়েতের স্থান ৩। দৃষ্টি ৫। অনুগ্রহ, দয়া ৮। অন্তর এর আরবী ৯। ব্যাধি, অসুখ ১০। পিঞ্জর

গত সংখ্যার সমাধান

দা	দা	■	ত	র	ল
■	ন	ক	ল	■	লা
ব	■	দ	■	ই	ট
ন	র	ম	■	জ	■
সা	■	বু	■	মা	স
ই	■	সি	■	লি	রা

গত সংখ্যার শব্দকল্পের পরিকল্পনাকারী

আনিকা তাসনিম নিশাত

কুলাউড়া বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার

শব্দকল্পে যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে (প্রথম তিনজন পুরস্কৃত)

মোস্তাফিজুর রহমান, জায়ফরনগর, জুড়ী, মৌলভীবাজার # জাবেল আহমদ, দক্ষিণ ভবানীপুর, জুড়ী, মৌলভীবাজার # রফিক আহমদ সালমান, বাঁশখলা, পেপার মিলস, ছাতক, সুনামগঞ্জ # তায়্যিবা আক্তার চাঁদনী, ক্লাসিক স্কুল ও কলেজ, উপশহর, সিলেট # তাহিয়াত মাহবুবা, সম্রাট টাওয়ার-১, শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ, সোবহানীঘাট, সিলেট # জান্নাতুল ফেরদৌস মরিয়ম, শাহজালাল লতিফিয়া আ/এ, সোবহানীঘাট, সিলেট # রেদওয়ান আহমদ মুস্তাকিম, শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ লতিফিয়া দাখিল মাদরাসা, লতিফনগর, মিরেরচক, শাহপরাণ, সিলেট # জালালিয়া আক্তার সুফা, তাহিরপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ # খাদিজাতুল কুবরা, বড়দল প্রাথমিক বিদ্যালয়, তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ # হাবিবুল্লাহ মুহাম্মদ ফুয়াদ, বড়দল নতুন হাটি, তাহিপরপুর, সুনামগঞ্জ # ফাতিহা জান্নাত সামিয়া, বড়দল নতুন হাটি, তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ # মুহাম্মদ কাওছার মাহমুদ, শাহজালাল জামেয়া ইসলামিয়া কামিল মাদরাসা, পাঠানটুলা, সিলেট # মো. কামরুল হাসান, বারহাল হাটুবিল গাউছিয়া দাখিল মাদরাসা, বারহাল, জকিগঞ্জ, সিলেট # সাজ্জাদুর রহমান, টেককামালপুর, বিশ্বনাথ, সিলেট # আনিকা তাসনিম নিশাত, কামারকান্দি, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার।

সংখ্যাকল্প

৭	৩	৬	২
২	৮	৫	৪
১	১	২	৪
৪	২	১	?

প্রতিটি কলামে একটি সমতা রয়েছে। বের করতে হবে প্রশ্নবোধক ঘরে কোন সংখ্যাটি বসবে?

গত সংখ্যার বর্ণকল্পের সমাধান

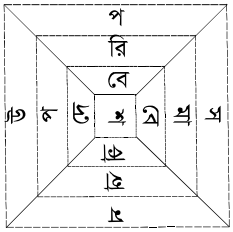

গত সংখ্যার পরিকল্পনাকারী

মো. কামরুল ইসলাম

বারহাল হাটুবিল গাউছিয়া দাখিল মাদরাসা

জকিগঞ্জ, সিলেট

বর্ণকল্পে যাদের উত্তর সঠিক হয়েছে

তায়্যিবা আক্তার চাঁদনী, ক্লাসিক স্কুল এন্ড কলেজ, উপশহর, সিলেট # জান্নাতুল ফেরদৌস মরিয়ম, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # সাজ্জাদুর রহমান সাগর, টেককামাল পুর, বিশ্বনাথ, সিলেট # জাহান মাহমুদ, মিরগাঁও, কামালবাজার, বিশ্বনাথ, সিলেট # এস এ রুম্মান, মনছবিয়া ইহসানিয়া হাফিজিয়া মাদরাসা, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # তারেক বিন আলাউদ্দিন, গহরপুর, ছাতক, সুনামগঞ্জ # মো. আবু রায়হান, পতনউষার, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার # তাহিয়াত মাহবুবা, হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ ইয়াকুবিয়া কামিল মাদরাসা, সোবহানীঘাট, সিলেট # রোমান আহমদ, বরমচাল উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, বরমচাল, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # বদরুল ইসলাম, নোয়াগাও, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট # সাইদুল ইসলাম মামুন, সৎপুর দারুল হাদীস কামিল মাদরাসা # খাদিজাতুল কুবরা, বড়দল নতুন হাটি, তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ # জালালিয়া আক্তার সুফা, তাহিরপুর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ # ফয়েজ আহমেদ সাজীদ, জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ # রফিক আহমদ সালমান, বাঁশখলা পেপার মিলস, ছাতক, সুনামগঞ্জ # আনিকা তাসনিম নিশাত, কামারকান্দি, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # রাহিমা চৌধুরী উর্মি, বরমচাল উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, বরমচাল, কুলাউড়া, মৌলভীবাজার # মোস্তাফিজুর রহমান, জায়ফরনগর, জুড়ী, মৌলভীবাজার # জাবেল আহমদ, দক্ষিণ ভবানীপুর, জুড়ী, মৌলভীবাজার # সাহেরা আক্তার মুক্তা, এস পি. পি. এম আদর্শ দাখিল মাদরাসা, ছাতক, সুনামগঞ্জ # সবুজ আহমেদ, আধকানী, আদমপুর, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার # হাবিবুল্লাহ মুহাম্মদ ফুয়াদ, বড়দল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, তাহিপরপুর, সুনামগঞ্জ # ফাতিহা আক্তার সামিয়া, বড়দল নতুন হাটি, তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ # জাছলিমা আক্তার, হযরত শাহজালাল লতিফিয়া দাখিল মাদরাসা, লতিফনগর, মিরেরচক, শাহপরাণ, সিলেট # মো. কামরুল হাসান, বারহাল হাটুবিল গাউছিয়া দাখিল মাদরাসা, বারহাল, জকিগঞ্জ, সিলেট # জাকারিয়া আহমেদ, সিকন্দরপুর, মোগলাবাজার, সিলেট # সাদিয়া আক্তার ঝুমা, মাইজপাড়া দাখিল মাদরাসা, মৌলভীবাজার # আব্দুল্লাহ আল হোসাইন, জালালপুর, মোগলাবাজার, সিলেট # সজিব মিয়া, হাজী আজিজুর রহমান আইডিয়াল স্কুল, টুকেরবাজার, সিলেট।

হাসতে জানি

এক ভদ্রলোক একবার স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর জন্য এক ডাক্তারের কাছ থেকে ওষুধ নিয়েছিলেন।

কয়েকমাস পর ভদ্রলোক তার ডাক্তারের কাছে আবার গেলেন ওই ওষুধ আনার জন্য।

ডাক্তার: আচ্ছা, গতবার তোমাকে কোন ওষুধটি জানি দিয়েছিলাম? একেবারেই মনে করতে পারছি না।

রোগী: তাহলে ওই ওষুধ এখন থেকে আপনি নিজেই খাবেন, ভদ্রলোক বিনীত গলায় বললেন।

...

ছেলে: বাবা, প্রতিদিন একটা আপেল খেলে নাকি ডাক্তার থেকে দূরে থাকা যায়?

বাবা: হুমম, যায় তো।

ছেলে: তাহলে একটা আপেল দাও তো।

বাবা: তুই না আপেল খেতে চাস না! আজ কী হলো হঠাৎ?

ছেলে: ডাক্তার সাহেবের গাড়ির জানালা ভেঙে ফেলেছি তো!

...

রাফিন চিড়িয়াখানায় চাকরি করেন। একদিন তার প্রধান জানতে চাইলেন-

চিড়িয়াখানার প্রধান: রাফিন, তুমি বাঘের খাঁচার দরজায় তালা দাওনি?

রাফিন: কী যে বলেন স্যার, কোন গর্দভ একটা বাঘ চুরি করতে আসবে!

সংগ্রহে-

ইসমাইল হোসেন সিরাজী

কালীকৃষ্ণপুর, গোলাপগঞ্জ, সিলেট

অদ্ভুত পৃথিবী

ফেয়ারি সার্কেল

নামিবিয়ার মরুভূমিতে খানিকটা হাঁটলেই আপনি থমকে দাঁড়াবেন। কিছু জায়গা জুড়ে দেখা যাবে গোল গোল চাকা। ২ থেকে ২০ মিটার অবধি বাড়তে পারে এই গোলাকৃতির চাকাগুলো। এগুলোর নাম দেওয়া হয়েছে ফেয়ারি সার্কেল। মাইলের পর মাইল বিস্তৃত এই সার্কেলগুলো দেখে মনে হবে যেন কেউ একটু পরপর মাটি খুঁড়ে এই সার্কেল তৈরি করে রেখেছে। অথচ সম্পূর্ণ প্রাকৃতিকভাবেই তৈরি হয়েছে এই সার্কেলগুলো। সার্কেলের প্রান্তে এক ধরনের ঘাস জন্মাতে দেখা গেলেও এর মধ্যখানে কোন ধরনের গাছ, ঘাস বা কোনকিছুই জন্মায় না। বিজ্ঞানীরা আজ অবধি প্রাকৃতিক এই সার্কেলগুলোর কোন রহস্য ভেদ করতে পারেননি। এদের বয়স সর্বোচ্চ ৭৫ বছর হয়ে থাকে। ৭৫ বছর পর অদৃশ্য হয়ে যায় সার্কেলগুলো। এখনও সবার কাছে রহস্যই রয়ে গেছে সেই অদ্ভুদ সার্কেলের।

শয়তানের সমুদ্র

প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে রয়েছে একখণ্ড রহস্যময় জায়গা। যাকে উবারম্বং ঝবধ বা শয়তানের সমুদ্র বলা হয়। মনে করা হয়, এ সমুদ্রের গভীরে লুকিয়ে আছে এক বিশাল ড্রাগন। তার অসম্ভব ক্ষুধা নিবারণের জন্য বিভিন্ন জাহাজ বা বিমান গিলে ফেলে। ১৯৫২-১৯৫৪ সালে মোট ৫টি সামরিক জাহাজ ৭০০ লোকসহ নিখোঁজ হয় সেখানে। সে সময় আবহাওয়া পুরোপুরি স্বাভাবিক ছিল। জাপানের কাছে প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝে অবস্থিত এই আজীব জায়গায় হাজার হাজার ঘটনা রেকর্ড করা হয় যার কোন ব্যাখ্যা নেই। জাপানিজ ফিশিং অথরিটি এই জায়গাকে বিপজ্জনক ঘোষণা করেছিল অনেক আগেই। ১৯৫২ সালে জাপান সরকার ৩১ জন গবেষকসহ একটি জাহাজ পাঠিয়েছিল এই জায়গায়। বলাবাহুল্য, সেই জাহাজ আর মানুষগুলোকে আর কখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি।

আবাবিল ফৌজের সদস্য হলো যারা

৩০৭৩. ইছমা আক্তার
পিতা: তারেক আহমদ তারু
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: হযরত শাহজালাল দারুচ্ছুন্নাহ লতিফিয়া দাখিল মাদরাসা
গ্রাম: মুক্তিরচক
ডাক: মুক্তিরচক
থানা: শাহপরাণ
জেলা: সিলেট

৩০৭৪. মো. আজরফ হোসেন জামি
পিতা: মাও. মহিউদ্দিন এমরান
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: হযরত শাহজালাল দারুল কুরআন মাদরাসা, নজিপুর
গ্রাম: নজিপুর
ডাক: এ.বি কাপন
থানা: জগন্নাথপুর
জেলা: সুনামগঞ্জ

৩০৭৫. কাজী ফারহান আক্তার সুমা
পিতা: কাজী মাহমুদুল বাছিত ইসকন্দর
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: ইমাম আবু হানীফা (র.) দারুচ্ছুন্নাহ একাডেমি
গ্রাম: সদরঘাট
ডাক: সদরঘাট
থানা: নবীগঞ্জ
জেলা: হবিগঞ্জ

৩০৭৬. শাহ তামজিদ আহমদ
পিতা: শাহ শেকুল আলী
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: ইমাম আবু হানীফা (র.) দারুচ্ছুন্নাহ একাডেমি
গ্রাম: সদরঘাট
ডাক: সদরঘাট
থানা: নবীগঞ্জ
জেলা: হবিগঞ্জ

৩০৭৭. মোছা. রাবেয়া আক্তার রিমা
পিতা: লাহিন আহমদ
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: জগন্নাথপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
গ্রাম: জগন্নাথপুর
ডাক: জগন্নাথপুর
থানা: জগন্নাথপুর
জেলা: সুনামগঞ্জ

৩০৭৮. আইমান হোসাইন জিসান
পিতা: ফখরুল ইসলাম
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: শাহজালাল জামেয়া ইসলামিয়া স্কুল এন্ড কলেজ
গ্রাম: নয়াগ্রাম
ডাক: বালিঙ্গাবাজার
থানা: বিয়ানীবাজার
জেলা: সিলেট

৩০৭৯. তুফাজ্জল হোসেন
পিতা: আইজুল হোসেন
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: ক্লাসিক স্কুল এন্ড কলেজ
গ্রাম: কালীকৃষ্ণপুর
ডাক: নূরজাহানপুর
থানা: গোলাপগঞ্জ
জেলা: সিলেট

৩০৮০. আবু নাসির অলিদ
পিতা: ফয়জুল ইসলাম
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: দি সিলেট খাজাঞ্চিবাড়ি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজ
গ্রাম: আজিমগঞ্জ
ডাক: দক্ষিণভাগ
থানা: বড়লেখা
জেলা: মৌলভীবাজার

৩০৮১. কাজী আহমদ আল জামি
পিতা: কাজী মাহমুদুল বাসিত ইসকন্দর
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: ইমাম আবু হানীফা (র.) দারুচ্ছুন্নাহ একাডেমি
গ্রাম: সদরঘাট
ডাক: সদরঘাট
থানা: নবীগঞ্জ
জেলা: হবিগঞ্জ

৩০৮২. জাহিদ হাসান
পিতা: আলী হোসেন
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: বাংলাদেশ ব্যাংক স্কুল
গ্রাম: কালীকৃষ্ণপুর
ডাক: নূরজাহানপুর
থানা: গোলাপগঞ্জ
জেলা: সিলেট

৩০৮৩. মারুফ আল নাঈম
পিতা: মুহাম্মদ শাহনূর আলী
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: গাবুরগাঁও দারুল কুরআন দাখিল মাদরাসা
গ্রাম: লক্ষিপাশা
ডাক: চরমহল্লা
থানা: ছাতক

[আবাবীল ফৌজের বন্ধুরা! তোমরা যে কেউ পরিকল্পনা করে 'শব্দকল্প', 'বর্ণকল্প', সংখ্যাকল্প অথবা শিক্ষামূলক 'ছোটগল্প' ও 'ছড়া/কবিতা' লিখে পাঠাতে পারো। অবশ্যই লেখা পাঠানোর ক্ষেত্রে নিচের নিয়মগুলো মেনে চলবে। আর মনে রাখবে, প্রত্যেক লেখার কপি রেখে পাঠাতে হবে, কারণ অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হয় না।]

নিয়মাবলি

- আবাবীল ফৌজের সদস্য হতে হলে নির্ধারিত সদস্য কুপনটি পূরণ করে ডাকযোগে অথবা ছবি তুলে ই-মেইলে পাঠাতে হবে।
- ইসলামী ভাবধারার যেকোনো উন্নত মানের শিশুতোষ রচনা এ বিভাগে ছাপা হয়। সর্বোপরি শিশু-কিশোরদের প্রতিভা বিকাশ, তাদেরকে ইসলামী মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করে সাংস্কৃতিক বিপ্লব সাধনের জন্যই 'আবাবীল ফৌজ'।
- লেখা সংক্ষিপ্ত হতে হবে। লেখার সাথে লেখকের পূর্ণ ঠিকানা থাকা চাই।
- বলতো দেখি, শব্দকল্প ও বর্ণকল্পের জবাব ও সমাধান চলতি মাসের ১৬ তারিখের মধ্যেই পত্রিকা অফিসে পৌঁছাতে হবে।
- 'বলতো দেখি'র সঠিক জবাবদাতাদের মধ্য থেকে নম্বরের ভিত্তিতে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান নির্ধারণ করে তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে।
- আবাবীল ফৌজের যেকোনো সদস্যের তৈরি করে পাঠানো শব্দকল্প, বর্ণকল্প মনোনীত ও প্রকাশিত হলে তাকে আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হবে।
- বর্ণকল্পে অংশগ্রহণকারী সঠিক জবাবদাতাদের নাম- ঠিকানা পরবর্তী সংখ্যায় যত্ন সহকারে ছাপানো হবে।
- A4 কাগজে স্পষ্ট করে হাতে লিখে অথবা কম্পোজ করে আবাবীল ফৌজের ঠিকানায় পাঠাতে হবে।
- ই-মেইলে লেখা পাঠানোর ক্ষেত্রে অবশ্যই আবাবীল ফৌজ ও লেখার শিরোনাম উল্লেখ করতে হবে।
- ই-মেইলের ক্ষেত্রে প্রতিটি লেখা স্বতন্ত্র ফাইল করে মেইলের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।
- প্রতিটি লেখার সাথে নিজের নাম, পূর্ণ ঠিকানা, যোগাযোগ নম্বর, শ্রেণি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম লিখে পাঠাতে হবে।

চিঠিপত্র

পাহাড়ি মুসলিমদের নিরাপত্তা চাই

সম্প্রতি চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চলে ইসলামের একনিষ্ঠ প্রচারক ওমর ফারুক ত্রিপুরা (র.)কে সন্ত্রাসীরা নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। ওমর ফারুক ত্রিপুরা একজন নওমুসলিম, যিনি ইসলাম গ্রহণের পর নিজ জনপদে পবিত্র ইসলাম ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তার হাত ধরে ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর অনেকে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। ওমর ফারুক ত্রিপুরার শাহাদতের পর সেসকল নওমুসলিম এখন প্রাণভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র। এরকম একটি রাষ্ট্রে ইসলাম ধর্ম প্রচার ও গ্রহণের কারণে কাউকে মৃত্যুর ঝুঁকিতে পড়তে হচ্ছে, তা একেবারেই অপ্রত্যাশিত। পাহাড়ের এসকল সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে যারা জড়িত, তারা কীসের জোরে মুসলিমদের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে, পাহাড়ের মুসলিমরা কেন আজ ভীত-সন্ত্রস্ত, এসব বিষয়ে প্রশাসনের নজর দেওয়া জরুরি। পাহাড়ের মুসলিম জনগোষ্ঠীসহ সকল নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। অবশ্যই ওমর ফারুক ত্রিপুরার খুনীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে এবং পাহাড়ে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত সকল অপরাধী চক্রকে কঠোর হাতে দমন করতে হবে।

জাহান মাহমুদ
আনোয়ারা, চট্টগ্রাম

দেশি গরু কুরবানী দিন দেশের টাকা দেশে রাখুন

বছর ঘুরে বিশ্বমুসলিমের দ্বারে কড়া নাড়ছে পবিত্র ঈদুল আদহা।বিবিসি ও উইকিপিডিয়ার তথ্যানুযায়ীএ ঈদ উপলক্ষে প্রতি বছর এক কোটিরও বেশি পশু কুরবানী দেওয়া হয়। এত বিপুলসংখ্যক পশুর যোগান দেয়ার জন্য দেশি পশুর পাশাপাশি ভারত থেকেও পশু আমদানী করা হয়। এই সুযোগে প্রতিবছরই অধিক মুনাফা লাভের জন্য কিছু অসাধু ব্যবসায়ী ভারত থেকে অবৈধ উপায়ে চোরাই পথে কুরবানীর পশু আনছে। চোরাই পথে পাচার হয়ে আসা গরু দিয়ে কুরবানী দিলে আমাদের দেশের অর্থনীতি ক্ষতির সম্মুখিন হয়। বৈধ পথে গরু আমদানী করলে সরকার ট্যাক্স পায়, এমনকি দেশি গরুর হাট থেকেও মোটা অংকের টাকা সরকারের রাজস্বে যোগ হয়। দেশি গরু দিয়ে কুরবানী দিলে একদিকে যেমন দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ হবে, অন্যদিকে খামার ব্যবসায় ভালো মুনাফা আসলে দেশে নতুন নতুন উদ্যোক্তা তৈরী হবে। সেসব খামারগুলোতে কর্মসংস্থান তৈরি হবে অসংখ্য লোকের। এতে আমাদের দেশের বেকারত্বের ন্যায় বড় সমস্যাও লাঘব হবে। সুতরাং দেশীয় খামারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও খামার ব্যবসা টিকিয়ে রাখা এবং খামার ব্যবসায় নতুন উদ্যোক্তা তৈরির জন্য দেশী গরু কুরবানীর বিকল্প নেই।

সাইফুল্লাহ বিন নামর
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

পাঠকের প্রতি,
আপনার চারপাশের প্রয়োজনীয়তা ও সমস্যা নিয়ে অনধিক ২০০ শব্দে চিঠি লিখে chitipatra.parwana@gmail.com-এ পাঠিয়ে দিন। —বিভাগীয় সম্পাদক